actionaid

শিক্ষায় অধিকার

রেফারেন্স হ্যান্ডবুক

একশনএইড বাংলাদেশ

actionaid

শিক্ষায় অধিকার

রেফারেন্স হ্যান্ডবুক

একশনএইড বাংলাদেশ

শিক্ষায় অধিকার - রেফারেন্স হ্যান্ডবুক

একশনএইড বাংলাদেশ

গ্রন্থনা
সিরাজুদ দাহার খান
সাহানাজ পারভীন দৃষ্টি

সম্পাদনা
খোন্দকার লুৎফুল খালেদ

সম্পাদনা সহযোগী ও ভাষা বিন্যাস
ফারিয়া তিলাত লোবা
মোহাম্মদ নূরুল আলম রাজু

প্রকাশকাল
নভেম্বর, ২০১২

যোগাযোগ
এডুকেশন টিম
একশনএইড বাংলাদেশ
বাড়ি- ৮, সড়ক- ১৩৬
গুলশান- ১, ঢাকা- ১২১২
ফোন: +৮৮ (০২) ৮৮৩৭৭৯৬, ৯৮৯৪৩৩১
ই-মেইল: aab.mail@actionaid.org

মুদ্রণে
অর্ক, ঢাকা

এই রেফারেন্স হ্যান্ডবুকটির স্বত্ব একশনএইড বাংলাদেশের। গ্রন্থনার প্রয়োজনে এতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্যের সন্নিবেশ ঘটেছে; যা সকলের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত। তবে কোথাও রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহারকালে প্রকাশকের নাম উল্লেখ বাঞ্ছনীয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শিক্ষা অধিকার আদায় এবং অধিকারভিত্তিক শিক্ষা আন্দোলনকে জোরদার করবার প্রয়াসে একশনএইড বাংলাদেশ'র শিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধানে এই রেফারেন্স হ্যান্ডবুকটি প্রণীত। যার মূল লক্ষ্য হলো প্রতিটি শিক্ষাকর্মীর হাতে শিক্ষার অধিকার, অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতা, শিক্ষায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহসহ প্রাসঙ্গিক নানা বিষয় নিয়ে একটি চটজলদি উৎস বই তুলে দেয়া।

শিক্ষায় অধিকার - রেফারেন্স হ্যান্ডবুকটি গ্রন্থনা করেছেন সিরাজুদ দাহার খান। একশনএইড বাংলাদেশ'র পক্ষ থেকে জনাব সিরাজুদ দাহার খান এবং তার টিমকে অসংখ্য ধন্যবাদ। একশনএইড বাংলাদেশ'র কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব ফারাহ কবির গ্রন্থনাটির প্রণয়ন, উন্নয়ন এবং বিকাশ পর্বে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। শিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে জনাব ফারাহ কবিরকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

হ্যান্ডবুকটি গ্রন্থনার প্রস্তুতি পর্বে, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কাজে নিয়োজিত সহকর্মীবৃন্দ বিষয়বস্তু নির্বাচনে প্রয়োজনীয় ধারণা দিয়েছেন। এছাড়াও একশনএইড বাংলাদেশ'র উন্নয়ন সহযোগী সংগঠনসমূহের কর্মীবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে তাদের ভাবনা ও মূল্যবান মতামত রেখেছেন - তাদের সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। একশনএইড বাংলাদেশের সহকর্মীদের মধ্যে আরও যারা মূল্যবান মতামত (ফিডব্যাক) দিয়ে গ্রন্থনাটির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তারা হলেন মোঃ আবদুল আজিজ মুন্সী, মোঃ সোহেল রানা এবং রায়হান সুলতানা তমা।

সবশেষে, যাদের জন্য এই হ্যান্ডবুকটি প্রণীত - দেশের সর্বস্তরের শিক্ষাকর্মী, শিক্ষা অধিকার লড়াইয়ের সম্মুখ যোদ্ধা - এই হ্যান্ডবুকটিকে শিক্ষা অধিকার বিষয়ক রেফারেন্স বই হিসেবে ব্যবহার করলে আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে।

শিক্ষা বিভাগ
একশনএইড বাংলাদেশ

বিষয়সূচি

পরিচ্ছেদ	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
সূচনা ও প্রাসঙ্গিক কথা		**০৭**
পরিচ্ছেদ ১.১	হ্যান্ডবুক প্রকাশনার যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য ও বিষয়সমূহ	০৭
পরিচ্ছেদ ১.২	প্রণয়ন-প্রক্রিয়া	০৮
পরিচ্ছেদ ১.৩	ব্যবহারকারীদের জন্য নির্দেশিকা	০৮
পরিচ্ছেদ ১.৪	মৌলিক ও প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে একশনএইড বাংলাদেশের অবস্থান	০৯
শিক্ষার ধারণা, অধিকার ও শিক্ষা অধিকার		**১০**
পরিচ্ছেদ ২.১	শিক্ষাবিষয়ক ধারণা	১০
পরিচ্ছেদ ২.২	অধিকারবিষয়ক ধারণা	১১
পরিচ্ছেদ ২.৩:	শিক্ষা অধিকার বিষয়ক ধারণা	১৩
প্রাথমিক শিক্ষা: ধারণা, পরিধি ও প্রয়োজনীয়তা		**১৫**
পরিচ্ছেদ ৩.১	মৌলিক/প্রাথমিক শিক্ষার ধারণা	১৫
পরিচ্ছেদ ৩.২	গুণগত মানসম্মত মৌলিক/প্রাথমিক শিক্ষা	১৭
পরিচ্ছেদ ৩.৩	বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক ধারা	১৮
পরিচ্ছেদ ৩.৪	প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধরন এবং সেগুলোর পরিচালনা কর্তৃপক্ষ	১৮
বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় অধিকারসমূহ		**২২**
পরিচ্ছেদ ৪.১	শিক্ষা বিষয়ক রাষ্ট্রের অঙ্গীকার এবং নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার	২২
পরিচ্ছেদ ৪.২	সবার জন্য শিক্ষা অধিকার: সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা	২৪
পরিচ্ছেদ ৪.৩	অধিকার লঙ্ঘন: শাসনপ্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা	২৫
পরিচ্ছেদ ৪.৪	অধিকার লঙ্ঘন ও তার প্রতিকার	২৬
পরিচ্ছেদ ৪.৫	বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা আইন	৩০
পরিচ্ছেদ ৪.৬	জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ (সংক্ষেপিত)	৩১
পরিচ্ছেদ ৪.৭	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি ২০০৬ (সংক্ষেপিত)	৪২
পরিচ্ছেদ ৪.৮	তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি৩) মূলকথা	৪৬
পরিচ্ছেদ ৪.৯	জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১	৫১
পরিচ্ছেদ ৪.১০	শিশু নীতি, ২০১০ (চূড়ান্ত খসড়া)	৫১
পরিচ্ছেদ ৪.১১	যৌন হয়রানি/মেয়েদের উত্ত্যক্তকরণ	৫৩
পরিচ্ছেদ ৪.১২	প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা ১৯৯৫	৫৫
পরিচ্ছেদ ৪.১৩	জাতীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১	৫৬
আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রাথমিক শিক্ষায় অধিকারসমূহ		**৫৭**
পরিচ্ছেদ ৫.১	আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণা	৫৮
পরিচ্ছেদ ৫.২	সিডও ঘোষণা	৫৮
পরিচ্ছেদ ৫.৩	জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (১৯৮৯)	৫৯
পরিচ্ছেদ ৫.৪	জমতিয়েন ঘোষণা ১৯৯০	৬০
পরিচ্ছেদ ৫.৫	ডাকার ঘোষণা ২০০০	৬১

পরিচ্ছেদ ৫.৬	দিল্লি ঘোষণা	৬১
পরিচ্ছেদ ৫.৭	শিক্ষায় বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব	৬২
পরিচ্ছেদ ৫.৮	সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যাবলী (এমডিজি)	৬৩
প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নির্দেশনাসমূহের মূলকথা		**৬৫**
বিষয় ১	বেসরকারি উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, পরিচালনা ও নিবন্ধন শর্ত ও নীতিমালা, ২০১০	৬৫
বিষয় ২	শিক্ষক নিয়োগ	৬৬
বিষয় ৩	স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি	৬৭
বিষয় ৪	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি গঠন ১০/০৮/২০০৯	৬৮
বিষয় ৫	মহানগর প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি	৬৮
বিষয় ৬	আঞ্চলিক পরিবেশ ও জলবায়ু, স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, জনগণের জীবন-জীবিকা ও কৃষ্টির সাথে সঙ্গতি রেখে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণী পাঠদানের বিদ্যমান সময়সূচি এবং বার্ষিক অবকাশকাল পুনর্নির্ধারণ প্রসঙ্গে।	৬৯
বিষয় ৭	শিশু শিক্ষার্থীদের প্রতি যথাযথ আচরণ নিশ্চিতকরণ	৬৯
বিষয় ৮	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র–ছাত্রীদের শারীরিক শাস্তি প্রদান	৭০
বিষয় ৯	‘প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি (২য় পর্যায়)’ প্রকল্পের উপবৃত্তি বিতরণ-সংক্রান্ত সংশোধিত নির্দেশাবলী-২০১০ এর সংশোধনী প্রসঙ্গে।	৭০
বিষয় ১০	প্রাথমিক বিদ্যালয় স্টুডেন্ট কাউন্সিল এর পরিচিতি	৭১
অধিকারভিত্তিক বিদ্যালয় এবং মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা : সম্ভাব্য করণীয়		**৭৩**
পরিচ্ছেদ ৭.১	স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা-অধিকারের বুনিয়াদ তৈরি করা এবং এর বিশ্লেষণ-কাঠামো	৭৩
পরিচ্ছেদ ৭.২	অধিকারভিত্তিক বিদ্যালয় এবং তা প্রতিষ্ঠায় করণীয় (পিআরএস)	৭৮
সংযোজনী		**৮৬**
সংযোজনী ১	সংবিধান এর প্রাসঙ্গিক অংশসমূহ জাতীয় জীবনে নারীদের অংশগ্রহণ	৮৬
সংযোজনী ২	মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র	৮৯
সংযোজনী ৩	মানসম্মত মৌলিক/প্রাথমিক শিক্ষার মাপকাঠি	৯৩
সংযোজনী ৪	বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক ধারা (টাইম লাইন)	৯৪
সংযোজনী ৫	প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক) আইন ১৯৯০	৯৮
সংযোজনী ৬	বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও কাঠামো	১০১
সংযোজনী ৭	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো (BNFE)	১০৯
সংযোজনী ৮	শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১১০
সংযোজনী ৯	অভিজ্ঞতার আলোকে সাজানো– রস্ক	১১১
সংযোজনী ১০	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প	১১৩
সংযোজনী ১১	উপজেলা রিসোর্স সেন্টার	১১৫
সংযোজনী ১২	ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ	১১৭
সংযোজনী ১৩	ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি (স্ট্যান্ডিং কমিটি)	১১৮
সংযোজনী ১৪	উপজেলা পরিষদ স্থায়ী কমিটি (২০১১তে প্রণীত সংশোধিত আইন অনুসারে)	১১৯
সংযোজনী ১৫	প্রাথমিক স্তরের প্রান্তিক যোগ্যতা	১২০
সংযোজনী ১৬	সিটিজেন’স চার্টারস	১২৩

শব্দপুঞ্জি ও পরিভাষা

এইচআরবিএ	হিউম্যান রাইটস বেজ্‌ড অ্যাপ্রোচ
এনএফই	নন ফরমাল এডুকেশন
একনেক	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ
সি-ইন-এড	সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন
নেপ	ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্রাইমারি এডুকেশন
ডিপিইও	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
ডিপিই	ডিরেক্টরেট অব প্রাইমারি এডুকেশন
পিইডিপি-২	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-২
পিইডিপি-৩	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩
আইসিটি	তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি
ইউপেপ	উপজেলাভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা
MoPME	Ministry of Primary and Mass Education
MoE	Ministry of Education
ASC	Annual School Census
RBM	Rights Based Management

পরিচ্ছেদ ১

সূচনা ও প্রাসঙ্গিক কথা

পরিচ্ছেদ ১.১: হ্যান্ডবুক প্রকাশনার যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য ও বিষয়সমূহ

যৌক্তিকতা ও উদ্দেশ্য

শিক্ষা মৌলিক মানবাধিকার। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এই মৌলিক মানবাধিকারকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে সংবিধানসম্মতভাবে রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। শিক্ষা নিয়ে দীর্ঘ মেয়াদে কোন রূপকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে সময়ের সাথে সাথে শিক্ষা হয়ে উঠেছে একটি বড় ধরনের বাণিজ্যিক পণ্য; যেখানে অধিকার ও সমতার ভিত্তিতে নয় বরং সুযোগের ভিত্তিতে এটি অর্জনের প্রবণতা তৈরি হয়েছে। শিক্ষা অধিকারের ধারণা ব্যাপকভিত্তিতে জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া যায়নি এবং এ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিও সম্ভব হয়নি। শিক্ষা অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে দেশের জনগোষ্ঠীর প্রধান অংশই বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিক্ষা অধিকার নিয়ে একশনএইড বাংলাদেশ'র কাজের অভিজ্ঞতাও অনুরূপ ধারণাই দেয়। আবার অনেকে নিজ এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সন্তানকে পাঠিয়েই দায়িত্ব সম্পন্ন হয়েছে বলে মনে করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের উপস্থিতি, বিদ্যালয় ঠিকমতো চলছে কিনা, ইত্যাদি জানা-বোঝার প্রয়োজন মনে করেন না। অথচ 'মানসম্মত শিক্ষা' বিশ্বজুড়ে একটি বড় আন্দোলন; যেখানে বাংলাদেশকে এর বাইরে বিবেচনার সুযোগ নেই।

হ্যান্ডবুক-এ যা আছে

একশনএইড বাংলাদেশ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের (হিউম্যান রাইটস বেজ্ড অ্যাপ্রোচ) অংশ হিসেবে এই সহায়িকা পুস্তিকা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে; যেখানে শিক্ষা অধিকার বিষয়ক বাংলাদেশ সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা, আইন-কানুন ও জাতীয় সনদ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। বস্তুত শিক্ষা অধিকার বিষয়ক এই হ্যান্ডবুকটি নাগরিককে শিক্ষা অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলো জানতে ও বুঝতে সহায়তা করবে। একটি সহজ ও ব্যবহারিক হ্যান্ডবুক হিসেবে কোনো জটিল তাত্ত্বিক আলোচনা ও বিশ্লেষণে যাওয়া হয়নি; বরং শিক্ষা নিয়ে ভাবনা, কথা বলা ও কাজ করার ক্ষেত্রে অধিকারের দিকটি যেন সবার কাছে স্পষ্ট করা যায়, সে প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

শিক্ষা অধিকার নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচুর আইন-কানুন, নীতিমালা, সনদ ও ঘোষণা রয়েছে। যেগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সংবিধান হলো

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন। সে কারণে বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষা অধিকার ও তা বাস্তবায়নের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার দিকটি এই হ্যান্ডবুক এ তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষা বিষয়ক প্রাসঙ্গিক নীতি, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক আইন, প্রভৃতিও পর্যালোচনায় এসেছে। সংবিধান ও এসব আইনের প্রাসঙ্গিক ধারাগুলো সমন্বিত করে দেখানো হয়েছে, যা প্রাথমিক শিক্ষাকে নাগরিকের অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি এবং অধিকার হিসেবে ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা এই হ্যান্ডবুক এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একইভাবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ ও ঘোষণাপত্রের ওপরও আলোকপাত করা হয়েছে।

শিক্ষা বিষয়ে যেকোনো ধরনের অনিয়মের প্রতিবাদ জানানো ও তা প্রতিরোধে সমাজের মানুষের এগিয়ে আসার যে বৈধ অধিকার রয়েছে, সেটি আমরা অনেকেই জানি না। ফলে শিক্ষায় অধিকার লঙ্ঘন নৈমত্তিক নিয়মে দাঁড়িয়েছে। ফলতঃ শিক্ষার্থীরা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কীভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের তথা সরকারের সাথে শিক্ষা অধিকার নিশ্চিত করার জন্য এবং সংবিধানসম্মত ও আইনগতভাবে লবি করা যায়, সে সংক্রান্ত আলোচনা এই হ্যান্ডবুক এ এসেছে। শিক্ষাবিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনসাধারণের সম্পৃক্ত হওয়ার দিক এবং মতামত প্রকাশের যে বৈধ অধিকার রয়েছে - তাও এখানে উঠে এসেছে।

পরিচ্ছেদ ১.২: প্রণয়ন-প্রক্রিয়া

একশনএইড বাংলাদেশ শিক্ষা বিষয়ে এ হ্যান্ডবুকটি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় প্রণয়ন ও প্রকাশ করেছে; যেখানে শিক্ষা-অধিকারসহ শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে দেশজুড়ে কর্মরত একশনএইড বাংলাদেশের বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় ও আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষা নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও সমস্যাগুলো জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কাছ থেকে পরামর্শ আহবান করা হয়েছে ও তা পরবর্তীতে সংযোজিত হয়েছে। এমনকি বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা নিয়ে কাজ করাকালীন অধিকারদাবিদারদের যেসব অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে একশনএইড বাংলাদেশের কাছে পৌঁছেছে সেগুলোও পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পরিচ্ছেদ ১.৩: ব্যবহারকারীদের জন্য নির্দেশিকা

ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে প্রণীত হওয়ায় এ হ্যান্ডবুকটি শুধু একশনএইড বাংলাদেশ ও তার সহযোগীদের জন্যই নয়; বরং দেশের প্রতিটি শিক্ষাকর্মীর জন্য একটি চটজলদি উৎস (কুইক রেফারেন্স) হিসেবে কাজে দেবে। তবে এটি কোনো জটিল ব্যবহারিক গ্রন্থ নয়; বরং অত্যন্ত সহজ ভাষায় প্রণীত পুস্তিকাটি থেকে যে কেউ শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা, রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতা ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার সম্পর্কে সংক্ষেপে অথচ স্পষ্টভাবে জানতে পারবেন এবং সেসবের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত ও সামাজিভাবে কী করণীয় তা নির্ধারণ করতে পারবেন। বাংলাদেশে যারা বেসরকারি পর্যায়ে শিক্ষা নিয়ে কাজ করছেন, তাঁরা যে সম্পূর্ণ যৌক্তিক ও আইনানুগ অধিকারের ভিত্তিতে এ কাজ করছেন তা সবার কাছে স্পষ্ট করে তোলার ক্ষেত্রে এটি সহায়ক হবে।

মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, শিক্ষা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দরিদ্র ও সাধারণ জনগণকে অনেক সময়ই তাদের অধিকারের আইনগত ভিত্তির দিকটি বোঝানো বা জানানো কঠিন হয়ে পড়ে। এ হ্যান্ডবুকটি সে সমস্যা খানিকটা হলেও লাঘব করতে সক্ষম হবে। একইভাবে যারা শিক্ষা অধিকার লঙ্ঘন করে চলেছেন, তাদের ব্যাপারে অবস্থান নেওয়ার জন্য এটি সহায়তা করতে পারে। শিক্ষা অধিকার নিয়ে আলোচনাসভা, জনসভা, সেমিনার কিংবা মাঠ পর্যায়ে মত বিনিময়কালে এটি বিশেষভাবে ব্যবহারযোগ্য।

সবচেয়ে বড় কথা, এটি একটি রেফারেন্স হ্যান্ডবুক; নির্দেশিকা নয়। শিক্ষা অধিকার নিয়ে কর্মরত সংশ্লিষ্টরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পন্ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে নিজেদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে এর সাহায্য নিতে পারবেন।

পরিচ্ছেদ ১.৪: মৌলিক ও প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে একশনএইড এর অবস্থান

একশনএইড বাংলাদেশ এমন একটি বিশ্বের স্বপ্ন দেখে; যেখানে প্রতিটি শিশু, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য একটি উন্নত গুণগত মানসম্পন্ন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষার অধিকার পাবে। উন্নত, প্রাসঙ্গিক ও গুণগত মানসম্পন্ন প্রাথমিক/মৌলিক শিক্ষা জনসাধারণকে ক্রমাগত শিখে যাওয়া, জ্ঞানের পরিধি বিস্তার এবং মানুষকে চিন্তাশীল সত্ত্বা হিসেবে গড়ে তোলার ও বেঁচে থাকার কার্যক্ষমতা সৃষ্টি করে। শিক্ষা গ্রহণ ও জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর মাধ্যমে মানুষ আরো বেশি সক্রিয় হয়, সুষ্ঠুভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, অধিকার নিয়ে দাবি দাওয়া উপস্থাপন ও তা আদায় করতে পারে এবং অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

একশনএইড বাংলাদেশ বিশ্বাস করে, অধিকার বঞ্চিত জনসাধারণ বিশ্বব্যাপী শিক্ষা বিতর্কে মৌলিক অংশীদার এবং চূড়ান্ত বিচারে দরিদ্র জনগণকে অবশ্যই পরিবর্তনের অংশীদার করতে হবে।

- গুণগতমানসম্পন্ন ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষা অধিকার বঞ্চিত শিশু থেকে বয়স্ক সব ধরনের দরিদ্র জনসাধারণের পাশে একশনএইড বাংলাদেশ সুস্পষ্ট ও ধারাবাহিকভাবে অবস্থান নেবে। জীবনের যেকোনো সময়ে শিক্ষা গ্রহণ ও জ্ঞানার্জনের সুযোগ অবাধ করার অধিকার প্রতিষ্ঠায় একশনএইড ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- যারা এই মৌলিক অধিকারের পূর্ণ বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে, একশনএইড বাংলাদেশ তাদের বিরুদ্ধে সতর্ক ও জোরালো অবস্থান নেবে।
- সবার জন্য গুণগত ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে একশনএইড বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারের ভূমিকা ও দায়িত্ব পর্যবেক্ষণ করে।
- একশনএইড বাংলাদেশ ব্যক্তি মালিকানাধীন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারকে সমর্থন করেনা; কেননা এই ব্যবস্থা দরিদ্র জনসাধারণের বৈষম্য আরো বাড়িয়ে তোলে এবং প্রান্তিক ও বঞ্চিতদেরকে আরো দূরে ঠেলে দেয়।
- বিদ্যালয়ভিত্তিক অধিকারকে জোরদার করার লক্ষ্যে একশনএইড বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে, যেখানে একশনএইড বাংলাদেশ মনে করে প্রতিটি শিশুর অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে, কোন শিশু বিদ্যালয়ে এবং শিক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হবেনা, যথাযথ অবকাঠামোগত সুযোগ পাবে, প্রশিক্ষিত শিক্ষক থাকবে প্রতিটি বিদ্যালয়ে, নিরাপদ এবং অহিংস পরিবেশে পাঠদান কার্যক্রম চলবে, প্রাসঙ্গিক শিক্ষার সুযোগ থাকবে, প্রতিটি শিশু তার নিজের অধিকার সম্পর্কে জানবে, তার জানার অধিকার থাকবে এবং প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করবে, বিদ্যালয়ভিত্তিক জবাবদিহীমূলক এবং স্বচ্ছ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন থাকবে এবং মানসম্মত শিখন পরিবেশ থাকবে।
- কন্যা শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা এবং নিরাপদ পরিবেশে শিক্ষা প্রাপ্তির অধিকারকে একশনএইড বাংলাদেশ অন্যতম গুরুত্বপূর্ন এজেন্ডা মনে করে। শিক্ষায় জেন্ডার-বৈষম্য থাকবেনা, মেয়ে শিশুদের বিদ্যালয় গমন হবে নিরাপদ।
- প্রতিটি শিশুর দুর্যোগ পরিস্থিতিতে শিক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। দুর্যোগকালীন শিশু নিরাপদ পরিবেশে নিরাপত্তা পাবে এবং অস্থায়ী শিখন স্থান পাবে যেখানে ন্যূনতম শিখন উপকরণ প্রাপ্তি হবে শিশুর অধিকার।

একশনএইড বাংলাদেশ বিশ্বাস করে অধিকার প্রতিষ্ঠার এই প্রয়াসের (Rights Based Approach) মাধ্যমে সবার জন্য গুণগত মৌলিক শিক্ষার বিষয়টি প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে এবং তাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। একশনএইড বাংলাদেশ ও সারা দেশব্যাপি সহযোগি প্রতিষ্ঠানগুলো এই কাজে সক্রিয় ও সচেতন ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং আন্তর্জাতিক ঘোষণা এবং বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে এ নিয়ে কাজ করার সম্পূর্ণ অধিকার একশনএইড বাংলাদেশের রয়েছে।

পরিচ্ছেদ ২

শিক্ষার ধারণা, অধিকার ও শিক্ষা অধিকার

পরিচ্ছেদ ২.১: শিক্ষাবিষয়ক ধারণা

শিক্ষা কী ?

সাধারণ অর্থে, স্কুল কলেজের নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি বা সিলেবাস অনুযায়ী লেখাপড়া করে বিদ্যার্জন করাকে শিক্ষা বলা হয়। শিক্ষা মানে জানা বা জ্ঞান অর্জন করা, নতুন কিছু শেখা, অজানাকে জানা। 'শিক্ষা' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Education গ্রীকশব্দ educare থেকে এসেছে, যার অর্থ পরিচর্যা করা। অর্থাৎ শিক্ষা হলো, একজনকে পরিপূর্ণ জীবন-যাপনের জন্য যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে গড়ে তোলা, প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা। আবার শিক্ষা হলো পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে টিকে থাকার কৌশল অর্জন; মানবিক গুণাবলী অর্জন।

অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুযায়ী, শিক্ষা হল কোন পদ্ধতিগত দিক নির্দেশনা দেয়ার বা গ্রহণ করার কৌশল; বিশেষ করে বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে। আবার সাধারণ জ্ঞান অর্জন, বিচার বিবেচনা বোধ তৈরি এবং ব্যক্তি বা সমষ্টি বিশেষের উন্নত জীবন-মান তৈরির কিছু পদ্ধতিগত কার্যক্রম হল শিক্ষা। শিক্ষা অর্জনের পদ্ধতি হতে পারে বিভিন্ন ধরনের দিক-নির্দেশা প্রদান, প্রশিক্ষণ অথবা অধ্যয়ন। শিক্ষার মাধ্যমে মনের বিকাশ সাধন সম্ভব এবং একইসাথে নানা ধরনের সংস্কৃতি, বৈচিত্র্যের সাথেও শিক্ষা পরিচয় করিয়ে দেয়। বাণিজ্য, কলা, নৃত্য, অর্থনীতি, পৌরনীতি, কূটনীতি, ইত্যাদি নানা বিষয়ে অধ্যয়নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব।

শিক্ষার লক্ষ্য

একটি ভালো সমাজ গড়াই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। কারণ, শিক্ষা মানুষের মন-মানসিকতা, আচার-আচরণ, অভ্যাস ও চরিত্র সুন্দর করে। শিক্ষা মানুষকে দক্ষ করে গড়ে তোলে, যাতে করে সে নিজের, পরিবারের ও সমাজের মঙ্গল সাধন করতে পারে। শিক্ষা মানুষের বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করাসহ সার্বিক মানবিক গুণাবলী বিকাশে সাহায্য করে। এক কথায় বলা যায়, শিক্ষার লক্ষ্য হলো: মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা; মানুষকে শোষণ, বঞ্চণা, নিপীড়ন ও প্রতারণার হাত থেকে মুক্ত করা। শিক্ষা মানুষের মৌলিক মানবাধিকার। একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রধান মাপকাঠি হচ্ছে শিক্ষা। অর্থাৎ, শিক্ষার প্রসার শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই নয়; বরং সামাজিক ন্যায্যতা, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং নারী-পুরুষ সমতার ওপরও প্রভাব ফেলে।

শিক্ষার ধারা

বাংলাদেশে বিদ্যমান মোট দশ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনটি ধারায় বিভক্ত করা যায়:

১. অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা
২. আনুষ্ঠানিক/প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা
৩. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয় মূলতঃ মানুষের জন্মের পর থেকেই। শিশু তার মায়ের কাছ থেকে মায়ের ভাষা শেখে। পরিবার ও পরিবেশ থেকে নানা কিছু দেখে শুনে ও অনুকরণের মাধ্যমে শিখতে থাকে। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট গন্ডি বা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন হয় না। পরিবার, প্রকৃতি, পরিবেশ ও তার আশপাশের জগত থেকেই মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে। নিজে নিজে পড়া, কমিউনিটি সেন্টারের পাঠাগারে পড়া, সমাজ সভায় অংশগ্রহণ, মাছ ধরা, কৃষি কাজ শেখা, রান্না করা থেকে জ্ঞান লাভ–সবই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার উদাহরণ। মানুষ যা কিছু দেখে, শুনে ও অভিজ্ঞতা থেকে বা নিজের অজান্তে শেখে তাই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা।

আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে বুঝায়, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষা। এই ধারায় স্কুল বা কলেজে নির্দিষ্ট উপকরণের সাহায্যে আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়া হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি সুনির্দিষ্ট বিষয় কাঠামো থাকে। আমাদের দেশে এ শিক্ষা সরকারি নিয়ন্ত্রণে সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে (যেমন: স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, ইত্যাদির মাধ্যমে) সম্পন্ন হয় এবং পূর্বনির্ধারিত সিলেবাস অনুসারে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে স্তরে স্তরে সম্পন্ন হয়। এতে বয়স অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে পড়ানো হয়। বছর শেষে চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়। এতে পাশ করলে ওপরের শ্রেণীতে উন্নীত করা হয় এবং বিভিন্ন পর্যায়ের শেষে সনদপত্র প্রদান করা হয়।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

নমনীয় বা অল্প আনুষ্ঠানিকতা বা কোনো আয়োজন ছাড়া যে শিক্ষার আয়োজন করা হয়, তাই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। এ শিক্ষা কাঠামো ও আনুষ্ঠানিক বিধিবদ্ধতার বাইরে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অল্প সময়ে ও তুলনামূলকভাবে অল্প খরচে পরিচালিত শিক্ষা। যেমন: ব্র্যাকের স্কুল, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের পরিচালিত শিশুদের স্কুল, একশনএইড বাংলাদেশ'র উদ্ভাবিত রিফ্লেক্ট, ইত্যাদি। মূলতঃ নির্দিষ্ট বয়সে যারা নানা কারণে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনি, অথবা যুক্ত হয়েও বিভিন্ন সমস্যার কারণে যারা বিদ্যালয় ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে, তাদের জন্যই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার আয়োজন। এ ধারার শিক্ষায় নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি কম; আনুষ্ঠানিকতা কম। শিক্ষাক্রম অপেক্ষাকৃত আকর্ষণীয় ও জীবন ঘনিষ্ঠ। সাধারণতঃ অংশগ্রহণকারীর বাস্তব চাহিদা অনুসারে এর বিষয়, পদ্ধতি ও বইপত্রসহ অন্যান্য উপকরণ বাছাই করা হয়। (পড়ুন পরিচ্ছেদ ৪.৭: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি ২০০৬)

পরিচ্ছেদ-২.২: অধিকারবিষয়ক ধারণা

অধিকারের ধারণা

অধিকার – অধিকার হচ্ছে, কোনো কিছুর ওপর কারও 'স্বত্ত্ব' (Entitlement) বা 'মালিকানা'; কারও কাছ থেকে কারও ন্যায্য পাওনা। সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা, সংস্কার এবং সংবিধান ও আইন-কানুন থেকে 'অধিকার' এর সৃষ্টি হয়। অধিকার দুই প্রকার: নৈতিক অধিকার ও আইনগত অধিকার।

১. নৈতিক অধিকার– সামাজিক নিয়ম-কানুন, প্রথা-মূল্যবোধ, রীতি-নীতি থেকে যেসব অধিকার সৃষ্ট – সেগুলোই হলো নৈতিক অধিকার। যেমন: সমাজে একসাথে বসবাস করার অধিকার; বাবা-মায়ের কাছ থেকে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ও স্নেহ পাবার অধিকার; তৃষ্ণার্ত মানুষের পানি পাবার অধিকার, ইত্যাদি।

২. আইনগত অধিকার–যেসব অধিকার দেশের আইন-কানুন, বিধিবিধান দ্বারা স্বীকৃত, তাই আইনগত অধিকার। যেমন: বিদ্যালয়ে পড়তে পারার অধিকার। আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে আইনগত প্রক্রিয়ায় তা আদায় করা যায়।

মৌলিক অধিকার–সংবিধানকর্তৃক স্বীকৃত অধিকার। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩য় ভাগে ২৬-৪৭ অনুচ্ছেদগুলোতে এসব অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। যেমন: আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান; ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, লিঙ্গভেদে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য করা যাবে না, ইত্যাদি। এসব অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মামলা করে তা আদায় করা যায়। প্রসঙ্গত, আমাদের সংবিধানে শিক্ষা মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত নয়।

মৌলিক নীতিমালা–সংবিধানের ২য় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসহ বেশ কিছু নীতিমালা দেয়া হয়েছে। যেমন: খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, বিনোদন–এগুলো এখনও পর্যন্ত মৌলিক নীতিমালা; মৌলিক অধিকার নয়। এগুলো সরকারকে রাষ্ট্র পরিচালনার দিক-নির্দেশনা দেয়। তবে, মৌলিক নীতিমালা লঙ্ঘনের দায়ে রাষ্ট্র বা সরকারকে আইনত বাধ্য করা যায় না বা তার বিরুদ্ধে মামলা করা যায় না।

নিচে মৌলিক অধিকার ও মৌলিক নীতিমালা সম্পর্কে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো

রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতিমালা

সংবিধানের ২য় ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি হিসেবে পরিগণিত। এসব নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূল সূত্র হিসেবে বিবেচিত; এবং এগুলো রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কাজের ভিত্তি। তবে এ সকল নীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য নয়। অন্যদিকে সংবিধানের ৩য় ভাগে ২৭ থেকে ৪৪ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত যেসব মৌলিক অধিকারের কথা বলা আছে, সে সব দিতে ব্যর্থ হলে যে কেউ সরকারের বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মামলা করতে ও তা আদায় করে নিতে পারবে। যেমন: আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান, রাষ্ট্র কর্তৃক জনসাধারণের জন্য প্রতিষ্ঠিত কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশ ও বিশ্রাম গ্রহণ; গ্রেফতারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করা, জনসভা ও সমাবেশ করা, সমিতি বা সংঘ গঠন করা, ইত্যাদি।

মৌলিক অধিকার

মানুষের চাহিদা অনেক। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব চাহিদাই পূরণ হয় না। বেশির ভাগ চাহিদাই মানুষ নিজের ও সমাজের চেষ্টায় পূরণ করে থাকে। এসব চাহিদা পূরণের জন্য তাকে ছোটবেলা থেকেই নানাভাবে তৈরি হতে হয়। তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন বা সমাজ ছাড়াও রাষ্ট্র বা সরকার দায়িত্ব পালন করে থাকে। কিছু কিছু চাহিদা আছে, যা পূরণে রাষ্ট্র বা সরকার আইনগতভাবে বাধ্য। পূরণ না করলে রাষ্ট্রকে আইনে আটকানো যায়; সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করা যায়। সেসবই মৌলিক অধিকার। এসব অধিকার লঙ্ঘন করা মানে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করা। যেমনঃ সংবিধানের ২৮(৩) অনুচ্ছেদ মোতাবেক, দরিদ্র ও প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যাপারে বাধা দান, নারী হিসেবে কোনো সরকারি চাকুরিতে না নেয়া, কোনো ধর্মপালনে বাধা দেয়া, ইত্যাদি মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন। সহজভাবে বলা যায়, নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সংবিধান স্বীকৃত ও রাষ্ট্র প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলোই মৌলিক অধিকার। সংবিধানের ৩য় ভাগে ২৭ থেকে ৪৪ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মোট ১৮টি মৌলিক অধিকার উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষাকে এখনও মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি।

সংবিধানে প্রদত্ত প্রধান প্রধান মৌলিক অধিকার

১. আইনের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের সকল নাগরিক সমান এবং প্রত্যেকেই আইনের আশ্রয় লাভের সমান অধিকারী;
২. ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, লিঙ্গভেদে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য করা যাবে না;
৩. জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না;
৪. গ্রেফতারকৃত ও প্রহরায় আটক ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির করতে হবে;
৫. এক অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারিতে সোপর্দ ও দণ্ডিত করা যাবে না;
৬. শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সভা সমাবেশ ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান এবং তাতে যোগদান করা যাবে;
৭. প্রত্যেক নাগরিকের সমিতি, সংঘ বা সংগঠন প্রতিষ্ঠার স্বাধীনতা থাকবে;
৮. চিন্তাভাবনা, বিবেক-বিবেচনা ও বাক-স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে;
৯. যেকোনো ধর্মগ্রহণ, ধর্ম পালন এবং ধর্ম প্রচারের সমান অধিকার ও স্বাধীনতা থাকবে।

(পড়ুন সংযোজনী–১: সংবিধানের প্রাসঙ্গিক অংশসমূহ)

তাই, নাগরিক হিসেবে সুশীল সমাজ বা সিভিল সোসাইটির দায়িত্ব হচ্ছে–শিক্ষাসহ অন্য সব মৌলিক চাহিদাগুলোকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ে দাবি উত্থাপন, প্রচারাভিযান এবং লবি করা।

সংবিধান কী ?

সংবিধান হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ আইন। দেশে প্রণীত সকল আইনের মূলভিত্তি হল সংবিধান। সংসদ সংবিধান পরিপন্থি কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারে না। এতে দেশ পরিচালনার মৌলিক নির্দেশনা দেয়া আছে। এসবের উপর ভিত্তি করেই সরকারকে দেশ পরিচালনা করতে হয়। সংসদ, সরকার ও বিচার বিভাগ এতে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে তার নির্দিষ্ট এখতিয়ারের মধ্যে থেকে নিজেকে পরিচালনা করে। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধান অংশগুলো হচ্ছেঃ প্রস্তাবনা, মৌলিক নীতিমালা, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার, নির্বাহী বিভাগ, প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগ, আইন সভা, বিচার বিভাগ, নির্বাচন, সংবিধান সংশোধন, বিবিধ।

মানবাধিকার–১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে 'মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র' প্রণীত ও পাস হয়। এতে মোট ৩০টি দফা আছে, যা প্রতিটি রাষ্ট্র তার নাগরিককে দিতে বাধ্য নয়; তবে যেগুলো তারা তাদের সংবিধানে স্বীকৃতি দেয় বা আইনে রূপদান করে থাকে সেগুলো মানতে বাধ্য। এ ঘোষণাপত্র মানুষের চিন্তার, চলাফেরার, ধর্ম পালনের, জীবন রক্ষার, দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকার, প্রভৃতির স্বীকৃতি দিয়েছে। (পড়ুন সংযোজনী ২: মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র)

পরিচ্ছেদ ২.৩: শিক্ষা অধিকার বিষয়ক ধারণা

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার পর থেকে শিক্ষা অধিকারের বিষয়টি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়ে আসছে এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশনে তা প্রতিফলিত ও গৃহীত হয়েছে। যদিও বেশির ভাগ দেশ এসব দলিলে স্বাক্ষর করেছে এবং আন্তর্জাতিক কনভেনশনসমূহ (যেমন: আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চুক্তি এবং শিশু অধিকার রক্ষায় জাতিসংঘ কনভেনশন) অনুসমর্থন করেছে, তবে খুব কম দেশই এগুলো জাতীয় সংবিধানে সমন্বিত করেছে; অথবা এ অধিকারগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে আইনগত কিংবা প্রশাসনিক কাঠামো প্রদান করেছে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে মনে করা হয় যে, নির্দিষ্ট অধিকার ভোগ করতে হলে অধিকার-দাবিদারকে তার জন্য অর্থ ব্যয় করতে হবে, যা অধিকারের মূল ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অধিকারের কথাগুলো তত্ত্বে ও কাগজে-কলমে থাকলেও বাস্তবায়নের বন্দোবস্ত নেই। তাছাড়া শিক্ষা অধিকার নিশ্চিত করতে সরকারি উদ্যোগ এবং পর্যাপ্ত সমর্থন না থাকায় হতদরিদ্ররা সর্বদাই বঞ্চিত হয়। এখনও বিশ্বের অসংখ্য মানুষকে শিক্ষা অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

শিক্ষা অধিকার নিজে যেমন একটি অধিকার, অন্যদিকে এটি অন্যান্য অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রেও মানুষকে সক্ষম করে তোলে। শিক্ষা অধিকারের দাবি উত্থাপন ও আদায়ের ক্ষেত্রে মানুষকে সোচ্চার করে তোলে। শিক্ষা ছাড়া মানুষ ওই সব মূল্যবান বৃত্তি অর্জন করতে পারেনা, যা তার বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয়। যদি মানুষের শিক্ষায় সহজগম্যতা থাকে, তাহলে সে সামর্থ্য, দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস তৈরি করতে পারে, যার মাধ্যমে অন্যান্য অধিকার আদায় ও নিশ্চিত করা যায়। শিক্ষা মানুষকে সেগুলো জানার ও বিশ্লেষণ করার সুযোগ করে দেয় এবং শিক্ষার ফলে একজন মানুষ যেসকল অধিকারের দাবিদার, সে অধিকার নিশ্চিত করতে বা প্রাপ্তিতে সরকারের বাধ্যবাধকতা ও দায়-দায়িত্ব কী তাও জানতে পারে। এটি জনগণকে তাদের ন্যায্য অধিকার দাবি করার যোগাযোগ দক্ষতা এবং বিভিন্ন ফোরামে কথা বলার মনোবল ও আত্মবিশ্বাস প্রদান করে। সর্বোপরি, শিক্ষা মানুষকে সরকারি কর্মকর্তা ও ক্ষমতাবানদের সাথে দরকষাকষির সক্ষমতা প্রদান করে।

শিক্ষা কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে, জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও গণতন্ত্রের বিকাশ সাধন করে, মানবাধিকার ও সমতার ধারণার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বাড়ায়। এটি যেহেতু মানুষের সক্ষমতা তৈরি করে, সেহেতু অনেক অধিকারের সাথে এর সংযোগ রয়েছে; যেমন: বাধ্যতামূলক শ্রম থেকে মুক্তির অধিকার, কাজের অধিকার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার।

শিক্ষা অধিকারের সর্বজনীন গ্রহণযোগ্য কোনো চূড়ান্ত সংজ্ঞা নেই। তবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তিতে (Covenants) শিক্ষা-অধিকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা হলো:

- ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন, ব্যক্তি প্রতিভার প্রতি মর্যাদা, চেতনা প্রতিষ্ঠা এবং শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতার বিকাশ সাধন;
- মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক পরিচয়, ভাষা ও মূল্যবোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন;
- একটি মুক্ত সমাজে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের জন্য জনগণকে সক্ষম করে তোলা;
- সকল জাতিগোষ্ঠী এবং দলের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া, বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ এবং একে অন্যকে সহ্য করার ক্ষমতা বাড়ানো এবং শান্তি বজায় রাখা;
- নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠা এবং পরিবেশের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন।

ক্যাটারিনা টমাসভস্কি এর মতে, প্রাথমিক শিক্ষা হবে available, accessible, acceptable and adaptable (সহজলভ্য, সহজগম্য, গ্রহণযোগ্য ও প্রয়োগযোগ্য) (পড়ুন পরিচ্ছেদ ৭.১ঃ স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা অধিকারের বুনিয়াদ তৈরি করা এবং এর বিশ্লেষণ কাঠামো (4A's)। ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) এর আর্টিকেল ১৩(২) এ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রাথমিক শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক এবং সকলের জন্য অবৈতনিক।

এই 4A's মাধ্যমিক শিক্ষার জন্যও প্রযোজ্য। ICESCR এ বলা হয়েছে, মাধ্যমিক শিক্ষায় অনেক ভিন্ন কাঠামো থাকতে পারে; তবে এটি সকলের জন্য সহজলভ্য করতে হবে; যা সরকারের প্রগতিশীল ভূমিকার পরিচায়ক। রাষ্ট্র অগ্রাধিকারভিত্তিতে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করবে ঠিকই; কিন্তু মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অবৈতনিক করার লক্ষ্যেও তাকে সুনির্দিষ্ট রূপরেখা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষা অধিকার ও জেন্ডার সমতা

বর্তমানে শিক্ষায় জেন্ডার অসাম্য চরম পর্যায়ে বিরাজ করছে। মেয়েদের শিক্ষায় সহজগম্যতা এবং স্কুলে টিকে থাকার হার অনেক কম। ৭৮১ মিলিয়ন বয়স্ক অসাক্ষর মানুষের মধ্যে নারীদের সংখ্যা দুই তৃতীয়াংশ। এ ধরনের অধিকার হরণ প্রতিরোধ করার জন্য প্রত্যক্ষ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে; এ বিষয়টি আন্তর্জাতিক আইনেও উৎসাহিত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ICESCR-এর সাধারণ মন্তব্য ১৩ এর ৩২ প্যারাগ্রাফে বলা হয়েছে, নারী-পুরুষ ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সমতা বিধানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। যতদিন পর্যন্ত না কাঙ্খিত সমতা অর্জন হচ্ছে, বা কোনো গোষ্ঠীর জন্য পৃথক ব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত এ ব্যবস্থা বলবৎ রাখতে হবে। তবে শুধুমাত্র শিক্ষায় সহজগম্যতাই শিক্ষা অধিকার অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। শিক্ষার মধ্যে যে বৈষম্য রয়েছে তা দূর করতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে শিক্ষা উপকরণ ও প্রক্রিয়ায় কোনোভাবেই নারী পুরুষের সম্পর্ক ও ভূমিকা যেন প্রচলিত ধারায় উপস্থাপিত না হয়; বরং তা যেন প্রচলিত বৈষম্যমূলক ধারণা ও মনোভাবকে চ্যালেঞ্জ করে; জেন্ডার স্টেরিওটাইপ বা প্রথাগত ধারণাকে পুনরুজ্জীবিত না করে; বরং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলায় উৎসাহিত করে।

আবার অধিকারগুলোর বাধ্যবাধকতার কথাও বলা হয়েছে। ১৯৯৩ সালের মানবাধিকারবিষয়ক বিশ্ব কনফারেন্সে (World Conference on Human Rights) পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে, 'মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা শক্তিশালী করাই যেন শিক্ষার লক্ষ্য হয়, রাষ্ট্র তা নিশ্চিত করবে'। ICESCR এর ধারায় নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে যে, শিক্ষা অধিকার কোনো ধরনের বৈষম্য ব্যতিরেকেই চর্চা করা হবে। শিক্ষা-অধিকার বাস্তবায়নে সহায়তা দেয়ার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়েরও স্পষ্ট বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যা ICESCR এর কমিটি ব্যখ্যা করে দেখিয়েছে।

পরিচ্ছেদ ৩

প্রাথমিক শিক্ষা: ধারণা, পরিধি ও প্রয়োজনীয়তা

পরিচ্ছেদ ৩.১: মৌলিক/প্রাথমিক শিক্ষার ধারণা

মৌলিক বা প্রাথমিক শিক্ষা, যেকোনো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি গঠন পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, কেননা প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিটি শিশুর জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বুনিয়াদি শিক্ষা নিশ্চিত করে এবং পরবর্তীতে জীবনভর শিক্ষার ভিত্তিভূমি রচনা করে। এটি মানুষের সেই শিক্ষা, যা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। তবে মৌলিক শিক্ষার ধারণাকে এখন আরও বিস্তৃত ও বহুমুখীভাবে দেখা হয়। আর তাই 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিতকরণের কথা যখন আসে, তখন দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়টিই বোঝানো হয়।

মৌলিক শিক্ষা বলতে এ হ্যান্ডবুকে আমরা মূলত প্রাথমিক শিক্ষাকেই বুঝব, যা আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক দু'ধারাতেই সম্পন্ন হতে পারে। আগেই বলা হয়েছে, সাধারণভাবে যেসব শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পায়না বা প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে, তাদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে যে পদ্ধতিতে মৌলিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় সেটাই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। অর্থাৎ, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ উদ্দেশ্যে সংগঠিত শিক্ষামূলক কার্যক্রমই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা (Non-Formal Education)। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করেই বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশুদের সংখ্যা প্রচুর, যা সময়ের সাথে সাথে নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়িয়ে তোলে। বিশাল নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যাগ্রস্ত এবং সুবিধাবঞ্চিত ছেলে-মেয়ে, কিশোর-কিশোরী ও দরিদ্র বয়স্ক লোকেরা রয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে তাদেরকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার তথা মৌলিক শিক্ষা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

পরিধি–আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম স্তর হচ্ছে–প্রাথমিক শিক্ষা। এ শিক্ষায় সফল হলে একজন শিক্ষার্থী পরবর্তী ধাপে উঠতে পারবে এবং অর্জিত দক্ষতা পরবর্তীতে আরও শাণিত করবে বলে আশা করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিটি শিশুর জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বুনিয়াদি শিক্ষা নিশ্চিত করে এবং পরবর্তীকালে শিক্ষার ভিত্তিভূমি রচনা করে। আমাদের দেশে অনেকে প্রাথমিক স্কুল শেষে মাধ্যমিকে ভর্তি হয়; আবার অনেকে কর্মজীবনে প্রবেশ করে। নিচে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার পরিধি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

১. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

সাধারণত, ৫ বছর বয়সী শিশুদেরকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এটাকে শিশুশ্রেণী বলা হয়। এখানে শিশুদের বর্ণ, সংখ্যা ও লেখার ধারণা দেওয়া হয় এবং প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করার জন্য তৈরি করা হয়। এতে করে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি ও লেখাপড়ার ভয় কেটে যায়।

২. প্রাথমিক শিক্ষা পরিচিতি

প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় ৬ বছর বয়স থেকে। সাধারণতঃ ৬-১০ বছর বয়সী শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষায় যুক্ত থাকে। এতে শিক্ষা বছর শুরু হয় জানুয়ারি মাসে এবং শেষ হয় ডিসেম্বর মাসে। বেশিরভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয় দুই শিফটে চলে। ১ম শিফট সকাল ০৯:৩০টা থেকে ১২টা এবং ২য় শিফ্ট দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টা ১৫মিনিট পর্যন্ত চলে। ১ম শিফটে পড়ানো হয় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের এবং ২য় শিফটে পড়ানো হয় তৃতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। উভয় শিফটে একই শিক্ষকগণ শিক্ষা দান করে থাকেন। উল্লেখ্য জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী, প্রথমিক শিক্ষার পরিধি ১ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত; যা এখনও কার্যকর হয়নি।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রায় সবটাই অবৈতনিক অর্থাৎ বিনাবেতনে। সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করে তোলার জন্যে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করেছে। ১৯৭৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করে ৩৬,০১৫টি স্কুল সরকারি করা হয়। ১৯৭৪ সাল থেকে ৬-১০ বছর বয়সী সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এই মর্মে আইন পাশ করা হয়।

১৯৯০ সালে 'প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামুলক) আইনে'র মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। এ আইন বাস্তবায়নের জন্যে ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে ৬ সদস্য বিশিষ্ট 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি' গঠন করা হয়েছে।

এবতেদায়ী মাদ্রাসা–প্রচলিত ধারার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষার বয়সী শিশুদের জন্য এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাও চালু রয়েছে। এই মাদ্রাসা শিক্ষায় ৫ বছরের কোর্স চালু রয়েছে। এ সকল মাদ্রাসাগুলোতে বাংলা, অংক, ইংরেজী, বিজ্ঞান ইত্যাদির পাশাপাশি বিশেষ করে কুরআন হাদিস ইত্যাদি শেখানো হয়।

মৌলিক শিক্ষা/প্রাথমিক শিক্ষা: স্থায়ীত্বশীল সাক্ষরতা ও জীবন দক্ষতা

দু'টি স্বতন্ত্র উপাদানের মাধ্যমে মৌলিক শিক্ষার ধারণাকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ পড়তে, লিখতে ও হিসাব করতে শেখা, যার মাধ্যমে একজন মানুষ অক্ষরজ্ঞান বা সাক্ষরতা পায় এবং দ্বিতীয়তঃ এই অর্জিত সাক্ষরতা ধরে রেখে তা ব্যবহারের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করতে পারা। সাক্ষরতা ধরে রাখাকে বলা হয়, স্থায়ীত্বশীল সাক্ষরতা (Sustainable literacy), যা উচ্চ শিক্ষা তথা জ্ঞান অর্জন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হলো, শিশুদের ব্যবহারিক সাক্ষরতা সুদৃঢ় করা ও মৌলিক শিক্ষা চাহিদা পূরণ করা। তার

প্রাথমিক বা মৌলিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা– প্রাথমিক বা মৌলিক শিক্ষার মাধ্যমে জীবন-দক্ষতা ও মানবিক সক্ষমতা অর্জনের পথ প্রশস্ত হয়। এর মাধ্যমে–

- ব্যক্তির আত্মসম্মান বাড়ে;
- স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা বাড়ে এবং স্বাস্থ্যবিধি পালন ও পুষ্টিমান রক্ষা করতে ব্যক্তি উদ্বুদ্ধ হয়;
- নারীর অবস্থান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়;
- অধিকারসম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বাড়ে;
- অধিকার আদায়ের উপায় জানা যায়;
- সব ধরনের শোষণ ও বৈষম্য থেকে বেরিয়ে আসার পথ ও সাহস তৈরি হয়;
- ব্যক্তির জীবিকা বা আয় বাড়ানোর উপায় সৃষ্টি হয়;
- ব্যক্তির জীবনে আত্মনিয়ন্ত্রণের সুযোগ সৃষ্টি হয়;
- পরিবেশ ও প্রতিবেশ সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বাড়ে;
- গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও চর্চায় অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়ে;
- পেশাগত দক্ষতা বাড়ে;
- যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি পায়;
- ভালোমন্দ বিচার করে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা ও অধিকার সৃষ্টি হয়;
- আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়;
- সাংগঠনিক কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করার যোগ্যতা বাড়ে।

মানে সাক্ষরতা হচ্ছে মৌলিক শিক্ষার প্রথম ধাপ। প্রাথমিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম স্তর, যা মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে এবং এর ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জনের পথ প্রশস্ত করে।

বস্তুত মৌলিক শিক্ষার জন্য দরকার চারটি মৌলিক দক্ষতা অর্জন। এগুলো হলো: **ভাষা শুদ্ধভাবে পড়তে পারা**-এক অনুচ্ছেদ চিঠি জোরে জোরে শুদ্ধভাবে পড়তে পারার ক্ষমতা। **লিখতে পারা**–এক অনুচ্ছেদ পড়ে সেখান থেকে চারটি প্রশ্ন করা হলে তার তিনটির সঠিক উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারার ক্ষমতা; **গাণিতিক দক্ষতা**–গণিতের চারটি নিয়মের (যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ) যেকোনো তিনটি ঠিকমতো করতে পারা। **জীবন দক্ষতা অর্জন করা**–জীবন দক্ষতা মানে হলো প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি অর্জন, যা মানুষের নিত্য জীবনযাপনে এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও বৈষয়িক ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর এই সম্পৃক্ততার কারণেই এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংকট সমাধানে মানুষ এই শিক্ষাকে কাজে লাগাতে পারে। সুতরাং, মৌলিক শিখনের উপাদানগুলোর ওপর দক্ষতা অর্জন করার মাধ্যমে একজন মানুষ জীবনব্যাপি শিক্ষা অব্যাহত রাখতে পারে। আসলে মৌলিক শিক্ষার সুনির্দিষ্ট ও সর্বজনস্বীকৃত কোনো সংজ্ঞা না থাকলেও এখানে বর্ণিত ধারণাগত দিকটি নিয়ে সবাই মোটামুটি একমত।

পরিচ্ছেদ ৩.২: গুণগত মানসম্মত মৌলিক/প্রাথমিক শিক্ষা

মৌলিক শিক্ষা অর্জনের কথা আলোচনা হয়েছে। কিন্তু শুধু মৌলিক শিক্ষা হলেই চলবে না, সেটি হতে হবে গুণগত বা মানসম্মত। আর মানসম্মতভাবে এটি অর্জন করা না গেলে, মৌলিক শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যাহত হতে বাধ্য।

জমতিয়েন সম্মেলনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অংশগ্রহণকারীরা একমত হয়েছিলেন যে, মৌলিক শিক্ষার আসলে এমন কোনো বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন সংজ্ঞা নেই–যা প্রয়োগ করে সব জায়গায় এর চাহিদা একইভাবে পূরণ করা যায়। আর তাই প্রতিটি দেশের উচিত মৌলিক শিক্ষার চাহিদা অনুযায়ী সাক্ষরতা এবং অব্যাহত শিক্ষার অবস্থা ও অবস্থান চিহ্নিত করা। দেশ-কাল-পাত্রভেদে এর নির্ধারকগুলো ভিন্নতর হতে পারে। তবে মূল ধারণার সঙ্গে মোটামুটি সবাই একমত। (পড়ুন সংযোজনী ৩: গুণগত ও মানসম্মত মৌলিক শিক্ষার মাপকাঠি)।

সহজ ভাষায় বললে, মানসম্মত শিক্ষা হচ্ছে সেই শিক্ষা ব্যবস্থা, যেখানে শিক্ষার্থীকে সময়মতো তার পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণসহ শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। যে বিষয়গুলো থাকলে মানসম্মত শিক্ষা অর্জিত হচ্ছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি সেগুলো হলো: যে বয়স থেকে শিক্ষা অর্জন শুরু করার কথা ঠিক সে বয়সেই শিক্ষা অর্জন শুরু করা; ঠিকমতো স্কুলে যেতে পারা; বই-খাতা, কাগজ-কলম, পোশাক-পরিচ্ছদসহ যাবতীয় শিক্ষা উপকরণ সঠিকভাবে পাওয়া; শিক্ষকদের দ্বারা নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা নেয়া; সহ-শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিতে পারা; এবং শিশুদেরকে দিয়ে পড়ালেখা বহির্ভূত অন্য কোনো কাজ না করানো।

গুণগত বা মানসম্মত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যদি শিক্ষা অর্জন করা না যায়, তাহলে স্থায়ীত্বশীল সাক্ষরতা ও জীবন দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রেও ঘাটতি থেকে যায়। ফলে মৌলিক শিক্ষার গোড়ায় গলদ থেকে যায়। আর বাংলাদেশের শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গেলেই যে মানসম্মত শিক্ষা পাচ্ছে, বাস্তবতা মোটেও তা নয়। কেননা, বেশির ভাগ স্কুলেই পর্যাপ্ত ক্লাসরুম, চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চ, আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র এবং শিক্ষা-উপকরণ নেই। আবার বেশিরভাগ স্কুলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নেই। যেসব শিক্ষার্থী স্কুলে ভর্তি হয় তাদের মাত্র ৬০% (একশনএইড, ২০১১) প্রাথমিক শেষ করে মাধ্যমিকে প্রবেশ করতে পারে। আবার বড় একটি অংশ প্রাথমিক শেষ করার আগেই ঝরে পড়ে। এ বিষয়গুলো মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা।

উল্লেখিত প্রতিবন্ধকতাগুলো অপসারণ করার মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব। আর এ কাজে প্রয়োজন জনসাধারণের অংশগ্রহণমূলক পদক্ষেপ। শিক্ষা-অধিকার বাস্তবায়নের ভিত্তিতেই জনসাধারণ এ কাজে এগিয়ে আসতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ালেখা ও শিক্ষকদের কার্যক্রম তদারকি করা, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের ওপর চাপ তৈরি করা, শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি নিশ্চিত করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা, ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা সম্ভব।

গুণগত ও মানসম্পন্ন শিক্ষা অর্জনে বাংলাদেশে নিম্নোক্ত সমস্যাগুলো বিরাজমান:

১. দারিদ্র্য	১৩. শিক্ষাক্রমের দুর্বলতা
২. ক্ষুধা ও দারিদ্র	১৪. বিভিন্ন সরকারি/ব্যক্তিগত কাজে শিক্ষকদের সম্পৃক্ততা
৩. শিক্ষক স্বল্পতা	১৫. স্কুলে ও ক্লাসে যথার্থ শিক্ষার পরিবেশ না থাকা
৪. অকার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থা	১৬. অপর্যাপ্ত জনঅংশগ্রহণ–অর্থাৎ অভিভাবক ও স্থানীয় অধিবাসীদের সম্পৃক্ততা ও অবদান না থাকা
৫. আমলাতন্ত্র	১৭. স্কুলের অবকাঠামোগত দুর্বলতা
৬. শিক্ষায় দুর্নীতি	১৮. অকার্যকর এসএমসি
৭. বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিম্ন বেতন স্কেল	১৯. শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য কর্তৃক নিয়মিত ও মানসম্পন্ন তদারকির ঘাটতি
৮. শিক্ষকদের কার্যকর প্রশিক্ষণের অভাব	২০. প্রাথমিক শিক্ষায় অর্থায়নের ঘাটতি
৯. মানসম্পন্ন শিক্ষা উপকরণ না থাকা	২১. অর্থের অপচয় এবং অর্থ যথার্থ কাজে না লাগনো
১০. ক্লাসে শিক্ষকদের অনিয়মিত উপস্থিতি	২২. দুর্যোগের প্রভাব ও ঝুঁকি
১১. শিক্ষককেন্দ্রিক শিখন পদ্ধতির প্রয়োগ	
১২. শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে মুক্ত আলোচনার সুযোগ না থাকা	

পরিচ্ছেদ ৩.৩: বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক ধারা

১. স্বাধীনতার অব্যবহিত পর জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের সংবিধানে ১৯৭২ সালেই সর্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয় (ধারা-১৭)।

২. সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা পূরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ১৯৭৩ সালে জাতীয়করণ করা হয়। ১৯৭৩ এ জারিকৃত 'প্রাথমিক শিক্ষা অর্ডিন্যান্স' এবং '১৯৭৪ এর প্রাথমিক বিদ্যালয় অধিগ্রহণ আইন' এর আওতায় ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করা হয় এবং এসব বিদ্যালয়ের ১,৫৭,৭৪২জন শিক্ষক সরকারি কর্মচারি হিসেবে অধিভূক্ত হন। ১৯৭৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৭৮ লক্ষ। পরবর্তীকালে আরও ১,৫৪৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করা হয়।

৩. একটি যুদ্ধবিধস্ত দেশের জরুরি পুনর্গঠনে নিয়োজিত তৎকালীন সরকার কর্তৃক ১৯৭৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করার কর্মসূচি গ্রহণ ছিল একটি সাহসী পদক্ষেপ। বিশেষ করে যে সময় দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত নাজুক এবং প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের উপযুক্ত অবকাঠামো ছিল অনুপস্থিত। তবে বিদ্যালয় সরকারিকরণের ফলে শিক্ষকদের বেতন ভাতা বৃদ্ধিসহ চাকুরির নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে কতগুলি সমস্যা দেখা দেয়। যেমন- শিক্ষকদের চাকুরির নিশ্চয়তা বিধানের ফলে তাদের জবাবদিহিতা এবং দায়িত্ব পালনের গুণগত মান কমে যায়; বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের সম্পৃক্ততা অনেকখানি হ্রাস পায়; ব্যবস্থাপনার সমস্যা দেখা দেয়। (পড়ুন সংযোজনী ৪: প্রাথমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক ধারা)।

পরিচ্ছেদ ৩.৪: প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধরন এবং সেগুলোর পরিচালনা কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্তমানে ১০ ধরনের পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলো হলো:

১. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
২. নিবন্ধিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩. অনিবন্ধিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

৪. উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫. স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসা
৬. উচ্চ মাদ্রসা সংলগ্ন এবতেদায়ি মাদ্রাসা
৭. পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়
৮. কমিউনিটি বিদ্যালয়
৯. কিন্ডারগার্টেন স্কুল
১০. এনজিও পরিচালিত পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয়।

নিচে বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত ১০ ধরনের প্রাথমিক শিক্ষার সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো-

১. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর আর্থিক দায়-দ্বায়িত্ব সরকারের। শিক্ষক নিয়োগ, বিদ্যালয়গৃহের নির্মাণ ও সংস্কার, ইত্যাদি দায়িত্বও সরকারের। শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারির বেতন ভাতা সরকারই বহন করে থাকে। এসব বিদ্যালয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের। তবে কমিউনিটি পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির।

২. রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রধানত ব্যক্তি উদ্যোগে স্থানীয় জনগণের সহায়তায় এ ধরনের বিদ্যালয়গুলো গড়ে ওঠে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তি পর্যায়ের দানকৃত জমিতে কাঁচা ঘর নির্মাণ করে এবং স্থানীয় শিক্ষিত বেকার যুবকদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করা হয়। স্থানীয়ভাবে জনগণের দানের অর্থে আসবাবপত্রসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক মালামাল সংগ্রহ ও শিক্ষকদের বেতন ভাতা মেটানো হয়। আবেদনের প্রেক্ষিতে সরকারি পর্যায়ে পরিদর্শনের মাধ্যমে যাচাই করে সব ঠিকঠাক পাওয়া গেলে বিদ্যালয়টিকে প্রাথমিকভাবে ৩ বছরের জন্য রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়। বিদ্যালয়টি 'স্থাপন ও চালু' করার অনুমোদন পাওয়ার মোট ১০ বছর পরে একটি বিদ্যালয় স্থায়ীভাবে রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। বিদ্যালয়টি রেজিস্ট্রেশন লাভ করলে শিক্ষকবৃন্দ সরকারি অনুদান পাওয়ার উপযুক্ত হন। বিদ্যালয়ের জন্য পাকা ভবন অধিকাংশ সময়ই সরকার প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মাণ করে দেয়। স্থাপন ও চালুর অনুমতি প্রদানের পরপরই এ বিদ্যালয়গুলো তদারকির দায়িত্ব প্রধানত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওপর বর্তায়। এসব স্কুলে শিক্ষক বেতনসহ অন্যান্য ব্যয় মেটাতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রায় ক্ষেত্রেই সক্ষম হয় না।

৩. অনিবন্ধিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

এ বিদ্যালয়গুলো সম্পূর্ণভাবে বেসরকারিভাবে স্থাপিত ও পরিচালিত হয়। এদের কার্যাবলী তদারকির জন্য নির্দিষ্ট কোনো কর্তৃপক্ষ নেই। সাধারণত রেজিস্ট্রেশনের প্রত্যাশা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলো রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত এই ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত থাকে। স্থানীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন করে এ বিদ্যালয়গুলো পরিচালনা করা হয়। সরকারের তরফ থেকে তদারকির কেউ না থাকায় এখানে পড়ালেখার বিষয়টি সার্বিকভাবেই অবহেলিত থেকে যায়। সার্বিক দিক দিয়ে অধিকাংশ অনিবন্ধিত বেসরকারি বিদ্যালয় যথাযথভাবে প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের অনুপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত।

৪. উচ্চ বিদ্যালয়সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়

উচ্চ বিদ্যালয়সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের। প্রাথমিক শিক্ষাদানকারী এ সকল বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান ও একাডেমিক তত্ত্বাবধানের কোনো কার্যকর ব্যবস্থাও নেই। শিক্ষকদের সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। কেননা, পিটিআইগুলোতে সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক ছাড়া অন্য কোনো পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত করা যায় না। এসব কারণে এ ধরনের বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না বলে ধারণা করা যায়।

৫. স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসা

এসব বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সার্বিকভাবে মাদ্রাসাবোর্ড ও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ওপর ন্যস্ত থাকে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক জারি করা নির্দেশাবলী যথাযথভাবে এসব প্রতিষ্ঠানে পালিত হচ্ছে কি না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য আয়োজিত কোনো ধরনের প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত করারও সুযোগ নেই। এ সকল কারণে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম এসব প্রতিষ্ঠানে কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না বলে ধারণা করা যায়।

৬. উচ্চ মাদ্রাসাসংলগ্ন এবতেদায়ি মাদ্রাসা

এসব মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনার বিষয়টি স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসার মতো।

৭. পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের ল্যাবরেটরি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে এগুলো প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। এসব বিদ্যালয়ের সার্বিক দায়িত্ব প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওপরে ন্যস্ত। স্থানীয়ভাবে পিটিআই এর সুপারিন্টেন্ডেন্ট এগুলো পরিচালনা করে থাকেন। এখানে আলাদা কোনো পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা কমিটি নেই। এ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক সরকারিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তবে এদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বেতন স্কেল সাধারণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যোগ্যতা ও বেতনস্কেল থেকে আলাদা (উচ্চতর)। এ কারণে পিটিআইতে কিছু প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

৮. কমিউনিটি বিদ্যালয়

কমিউনিটি বিদ্যালয়গুলোতে বর্তমানে ৫টি শ্রেণী রয়েছে। এসব বিদ্যালয় স্থানীয় উদ্যোগে যে সকল এলাকায় বিদ্যালয় নেই, সেখানে গড়ে ওঠেছে। স্থানীয়ভাবে শিক্ষকও নিয়োগ করা হয়েছে। সরকার এই শিক্ষকদের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাতা দিয়ে থাকে।

৯. কিন্ডারগার্টেন স্কুল/ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল

এ বিদ্যালয়গুলো ব্যবসায়িকভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং সাধারণত শহরভিত্তিক। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের নিজস্ব কোনো ভবন নেই। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি বিদ্যালয় পরিচালনা ও পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। অনিবন্ধিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো এসব বিদ্যালয়ের ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এগুলো বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ন্যূনতম শর্ত অনেক ক্ষেত্রেই পূরণ করে না। এ ধরনের স্কুলের ছাত্র বেতন অতি উচ্চ। আর্থিক অবস্থা ভালো নয়, এমন পরিবারের শিশুরা এসব বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না। এসব বিদ্যালয় ক্ষমতার অতিরিক্ত পাঠ্যক্রমের বোঝা শিশুদের ওপর চাপিয়ে দেয়। তুলনামূলক হিসেবে বিত্তবান অভিভাবকবৃন্দ শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে একাধিক গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা করে এ চাপ সামাল দেন। আর্থিক অবস্থা ভালো হওয়ায় বেশি বেতনে উচ্চ ডিগ্রিধারী শিক্ষক নিয়োগে এ বিদ্যালয়গুলো সক্ষম। এ বিদ্যালয়গুলো ইংরেজির উপর খুব বেশি জোর দিয়ে থাকে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশনে মোটেই আগ্রহী নয়। ফলে সরকারের এসব বিদ্যালয়ের ওপর কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে সম্প্রতি সরকার এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিচ্ছে।

১০. এনজিও পরিচালিত পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয়

এ বিদ্যালয়গুলো দেশি-বিদেশী বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হয়ে আসছে। সরকারের নিয়ন্ত্রণ এক্ষেত্রেও খুবই শিথিল। এ বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশই রেজিস্ট্রেশনে আগ্রহী হলেও রেজিস্ট্রেশনের প্রচলিত নিয়মনীতি এ পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। নিয়মনীতি প্রয়োজনে কিছুটা শিথিল করে হলেও এসব বিদ্যালয় জাতীয় স্বার্থে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনা প্রয়োজন।

সারা দেশে যে ১০ ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেখানে তিনটি ভিন্ন শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়। সরকারি বিদ্যালয়, বেসরকারি (নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত) বিদ্যালয়, কমিউনিটি বিদ্যালয়, পরীক্ষণ বিদ্যালয়, উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় এবং উচ্চ-বিদ্যালয়সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে। এবতেদায়ি মাদ্রাসা

এবং উচ্চ মাদ্রাসাসংলগ্ন এবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলো বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে। ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলো ব্রিটিশ শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে আবার প্রশাসনিক দায়িত্বের নিরিখে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের প্রধান সরকারি প্রতিষ্ঠান 'প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর' প্রথম পাঁচ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তদারকি করে থাকে। পরীক্ষণ বিদ্যালয়গুলোতে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির কিছুটা কর্তৃত্ব রয়েছে। আর উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়গুলো বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় এবং উচ্চ বিদ্যালয়সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর তদারকিতে পরিচালিত হয়। মাদ্রাসাগুলো মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম অনুসরণ করে; কিন্তু ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোর জন্য নির্দিষ্ট কোনো কর্তৃপক্ষ নেই।

পরিচ্ছেদ ৪

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় অধিকারসমূহ

বাংলাদেশের সংবিধানসহ বিভিন্ন জাতীয় আইন, ঘোষণা, নীতি ও বিধিবিধানে শিক্ষা অধিকার সংক্রান্ত যে নির্দেশনা আছে, তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

পরিচ্ছেদ ৪.১: শিক্ষা বিষয়ক রাষ্ট্রের অঙ্গীকার এবং নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার

রাষ্ট্র বলতে এখানে বাংলাদেশ ও তার সরকারকে বোঝানো হচ্ছে। আইনের মূল উৎস হচ্ছে দেশের সংবিধান। সংবিধান হলো দেশ পরিচালনার মূল দলিল। এতে দেশ শাসনের নিয়মকানুন ও মানুষের নাগরিক অধিকারের বিষয় উল্লেখ থাকে। সুতরাং শিক্ষা নিয়ে সরকারের কাছ থেকে অধিকার আদায় করতে হলে দেশের সংবিধানে ও বিভিন্ন নীতিমালায় শিক্ষা সম্পর্কে কী বলা হয়েছে বা কী অঙ্গীকার করা হয়েছে, তা জানা দরকার। এ বিবেচনায় নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার বা ওয়াদাগুলোর মূল দিক তুলে ধরা হলো:

সংবিধানে প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব– নাগরিকদের জন্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭, ২৮ ও ১৫ অনুচ্ছেদে নাগরিকদের জন্য মৌলিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্যে রাষ্ট্রকে নিম্নরূপ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে:

অনুচ্ছেদ ১৭: একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা

ক. রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য;

খ. সমাজের প্রয়োজনের সাথে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য;

গ. আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

অনুচ্ছেদ ১৭ কে সহজভাবে বলা যায়,

- সারাদেশেই প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত একই রকম শিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে (বাংলা, ইংরেজি, মাদ্রাসা-এরকম ৩টি ধারা থাকবে না; এর মাধ্যমে ৩ ধরনের নাগরিক তৈরি হবে না);
- সকল শিশুর বিদ্যালয়ে আসা বাধ্যতামূলক;
- পড়াশোনার জন্য শিক্ষার্থীর ভর্তি ফি বা বেতন লাগবে না;
- শিক্ষা হবে গণমুখী অর্থাৎ সমাজ ও জনগণের উপকারে আসে বিদ্যালয়ে এমন বিষয় শেখানো হবে;

- শিক্ষাপ্রাপ্ত নাগরিকরা সমাজ ও দেশের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে;
- নিরক্ষরতা নির্মূল করা হবে অর্থাৎ দেশের ৫ বছরের উপরে প্রত্যেক নাগরিক সাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন হবেন।

অনুচ্ছেদ ২৮, ধারা ৩: ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য

ক. কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না;

খ. রাষ্ট্র ও জনজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন;

গ. কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবেনা।

অনুচ্ছেদ ২৮, ধারা ৩ কে সহজভাবে বলা যায়,

- বিদ্যালয়ে স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ভেদাভেদ করা যাবে না;
- বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান সবাইকে নিয়মানুযায়ী ভর্তি নিতে বাধ্য থাকবে;
- পড়াশোনার ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে ভেদাভেদ করা যাবে না;
- আদিবাসী, নমশূদ্র, হরিজন, ডোম, মুচি, মেথর, যৌনকর্মীর সন্তান, প্রতিবন্ধী, কাউকেই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না;
- উপযুক্ত ব্যক্তি বা শ্রেণীকে কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে ঢুকতে বাধা দেয়া যাবে না। খেলার মাঠ, পার্ক, হোটেল-রেঁস্তোরায় বসতে বাধা দেয়া যাবে না।

অনুচ্ছেদ ১৫: অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা

সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়: ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা।"

ধর্মীয় স্বাধীনতা–কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোনো ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম সংক্রান্ত না হলে তাকে কোনো ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করতে হবে না।

শিক্ষা হোক মৌলিক অধিকার

বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে শিক্ষা কি মৌলিক অধিকার না কি মৌলিক চাহিদা–এ নিয়ে ধারণাগত বিভ্রান্তি রয়েছে। ফলে প্রায়শঃই মৌলিক চাহিদা ও মৌলিক অধিকারকে এক করে দেখা হয়। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা–এই পাঁচটিকে মৌলিক অধিকার বলে আমরা প্রায়শঃই ভুল করি। মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লেখিত পাঁচটি অধিকারকে মানবাধিকার বলা গেলেও মৌলিক অধিকার বলার সুযোগ নেই। কেননা, মৌলিক অধিকার হলো সেই সমস্ত অধিকার, যেগুলো কোনো রাষ্ট্রের সংবিধান কর্তৃক মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত ও সংরক্ষিত। এই অধিকার লঙ্ঘিত হলে জনগণ রাষ্ট্রীয় আদালতে প্রতিকার চেয়ে মামলা করতে পারে। মৌলিক চাহিদা এবং মৌলিক অধিকারের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো, মৌলিক চাহিদা লঙ্ঘিত হলে আদালতে মামলা করা যায় না; কিন্তু মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে মামলা করা যায়। বাংলাদেশ সংবিধানের ৩য় ভাগে (২৬-৪৭ ক অনুচ্ছেদ) মৌলিক অধিকার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তার মধ্যে ২৭-৪৪ অনুচ্ছেদে ১৮টি মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত হয়েছে, যেখানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্থান দেয়া হয়নি।

বরং শিক্ষাকে স্থান দেয়া হয়েছে বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫ ও ১৭ অনুচ্ছেদে, যা সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের (৮-২৫ অনুচ্ছেদ) অন্তর্ভুক্ত। এ ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি আলোচিত হয়েছে। যেহেতু শিক্ষা মৌলিক অধিকার হিসেবে

স্বীকৃত নয়, তাই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে না। এ বিষয়ে (সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগ সম্পর্কে) বলা হয়েছে–"অনুচ্ছেদ ৮। (২) এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ পরিচালনার মূলসূত্র হইবে, আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করিবেন, সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তিতে হইবে, তবে এই সকল নীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎ যোগ্য হইবে না"।

তবে দেশের যেকোনো অঞ্চলে, গ্রামে বা শহরে কোনো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঠিকমতো লেখাপড়া না হলে বা বিদ্যালয় বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত থাকলে, সেই অঞ্চলের জনগণের এসব বিষয় নিয়ে কথা বলার ও সমস্যা সমাধানে স্থানীয় প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করার অধিকার রয়েছে। প্রয়োজনে শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ করে সর্বসাধারণের কাছে সকলের সমস্যাগুলো প্রকাশ্যে তুলে ধরার এবং তা সমাধানের আহবান জানানো যেতে পারে। কোনো গ্রামের বা শহরের বিভিন্ন স্কুলের লেখাপড়ার মান উন্নয়ন নিয়ে কাজ করার জন্য গ্রামবাসী বা শহরবাসী উদ্যোগী হয়ে কোনো সমিতি বা সংঘ গঠন করতে পারেন। সেই সংঘের মাধ্যমেও স্থানীয় প্রশাসনের ওপর চাপ দেয়া যেতে পারে। কর্তৃপক্ষকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া যেতে পারে। সংবিধানের ৩৭ ও ৩৮ অনুচ্ছেদে এ ধরনের উদ্যোগের অনুমোদন রয়েছে। আবার সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তার স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে।

তবে মোট কথা হলো, সংবিধান অনুসারে শিক্ষা নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা হলেও এখন পর্যন্ত মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত নয়। সাধারণ মানুষ আইনের কৌশলগত দিক বুঝতে চায় না; বরং শিক্ষা আমাদের মৌলিক অধিকার–দীর্ঘদিনের এ ধারণার বাস্তবায়ন চায়। তাই এ বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি করে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি আদায়ের সময় এসেছে।

শিক্ষা: নারীর অধিকার

সাংবিধানিকভাবেই বাংলাদেশের নারীরা জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে অংশ নেয়ার অধিকারী। সংবিধানের ১৯ ও ২৮ অনুচ্ছেদে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরকেও শিক্ষাসহ সকল ধরনের অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, এগুলো বাস্তবায়নে রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতার কথাও মেনে নেয়া হয়েছে। সুতরাং নারীকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অবকাশ নেই; বরং এ ধরনের কাজ আইনের দৃষ্টিতে সংবিধান লঙ্ঘনজনিত অপরাধের সামিল হবে।

গ্রামাঞ্চলে নারীরা শিক্ষার অধিকার থেকে সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত। ১৯৯২ সাল থেকে সারাদেশের গ্রামাঞ্চলে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক বলে ঘোষণা করা হলেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের পাঠানোর বিষয়ে এখনো অভিভাবকশ্রেণীর অনীহা পরিলক্ষিত হয়। এ জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ছাত্রী বেতন বাবদ যে আয় হ্রাস ঘটবে, সরকার সে পরিমাণ অর্থ ভর্তুকি দেবে বলেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নারী শিক্ষা সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে ১৯৯৩ সাল থেকে দেশের ৪৪৬টি উপজেলায় মাধ্যমিক পর্যায়ের (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী) ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। সর্বশেষ ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে একনেকের (জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ) সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক হবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়ভাবে মেয়েদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র পিতা-মাতা মেয়েদের লেখাপড়ায় উৎসাহিত করেননা বা আগ্রহী হননা।

পরিচ্ছেদ ৪.২: সবার জন্য শিক্ষা অধিকার: সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা

যদিও বাংলাদেশের সংবিধান শিক্ষাকে এখনও মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি; কিন্তু মৌলিক নীতিমালায় রাষ্ট্রকে এ ব্যাপারে দায়িত্ব অর্পণ করেছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণা অনুসারে শিক্ষা প্রতিটি মানুষের অধিকার। মানুষের সম্মানজনক জীবনযাপনের জন্য এ অধিকার প্রতিটি নাগরিকের জন্য আবশ্যক। তা ছাড়া এ অধিকার বাংলাদেশের সংবিধানেই কেবল সীমাবদ্ধ নয়; আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ঘোষণা ও কনভেনশনেও ব্যক্ত করা হয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণায় (১০ই ডিসেম্বর ১৯৪৮) ২৬ নং ধারায় শিক্ষা বিষয়ে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত আছে:

ক. প্রত্যেকেরই শিক্ষালাভের অধিকার রয়েছে। অন্ততপক্ষে প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণভাবে লভ্য থাকবে এবং উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত থাকবে।

খ. ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা পরিচালিত হবে। সমঝোতা, সহিষ্ণুতা সকল জাতি, বর্ণ ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে বন্ধুত্ব উন্নয়ন এবং শান্তি রক্ষার্থে জাতিসংঘ কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করবে।

গ. সন্তানদের যে ধরনের শিক্ষা দেয়া হবে তা আগে থেকে বেছে নেয়ার অধিকার পিতামাতার রয়েছে।

এরই প্রেক্ষিতে ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়। জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ সহ অন্যান্য জাতীয় নীতিসমূহেও (শিশু সুরক্ষা নীতি, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ইত্যাদিতে) তা পুনর্ব্যক্ত এবং অঙ্গীকার করা হয়েছে। এক কথায়, 'সবার জন্য শিক্ষা' একটি শ্লোগানে রূপান্তরিত হয়েছে এবং তা রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত হয়েছে। অথচ নানা উদ্যোগ স্বত্ত্বেও এখনো দেশের অধিকাংশ মানুষ মানসম্পন্ন শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত।

পরিচ্ছেদ ৪.৩: অধিকার লজ্ঘন: শাসনপ্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশের সংবিধানে দেশের প্রত্যেক মানুষের জন্য শিক্ষাকে মৌলিক চাহিদা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শিক্ষা সনদসমূহে স্বাক্ষর করার মাধ্যমে বাংলাদেশ শিক্ষা অধিকার বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতার কথা মেনে নিয়েছে। জাতীয়ভাবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয়েছে। শিক্ষানীতি, জাতীয় শিশু অধিকার নীতি, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিসহ একাধিক নীতিমালায় সবার জন্য শিক্ষা অধিকার বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এতসব স্বীকৃতি থাকার পরও বারবার বিভিন্নভাবে দেশের বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠী শিক্ষা অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে।

সন্দেহ নেই, সাংবিধানিক ও আইনগত (বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন) বাধ্যবাধকতা থাকায় সরকার এবং সরকারি সংস্থাগুলো অন্যান্য অধিকারের মতো শিক্ষার অধিকার বাস্তবায়ন ও নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিকভাবে দায়বদ্ধ। তবে এই অধিকার বাস্তবায়ন ও লজ্ঘন দুটোই আসলে হয়ে থাকে শাসন প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতার কারণে। এই শাসন-প্রক্রিয়ার মধ্যে সরকার তথা রাষ্ট্র, সুশীল সমাজ ও অন্যান্য সামাজিক সংস্থাগুলোর অন্তর্ভুক্তি রয়েছে। তার মানে হলো, শিক্ষা-অধিকার বাস্তবায়ন নিশ্চিত ও লজ্ঘন প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে শুধু রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্রের ওপর নির্ভর করার উপায় নেই। বরং বেসরকারিভাবে সুশীল সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে, সমাজের অন্যান্য শ্রেণী যেমন শিক্ষার অধিকারভোগী ও পেশাজীবীদের সক্রিয় হতে হবে। শিক্ষা অধিকার নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি তাঁদেরও কাজ করার প্রয়োজন, সুযোগ ও অধিকার রয়েছে। এ জন্য আইনগত বৈধ ভিত্তিও আছে।

শিক্ষায় অধিকার থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীই শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। এই অধিকারবঞ্চনা শুধু এমন নয় যে, তারা স্কুলে যেতে পারছে না বা স্কুলের বিকল্প নেই। অনেকে বিদ্যালয়ে যেতে পারলেও অধিকারবঞ্চিত হচ্ছে, প্রয়োজনীয় শিক্ষার উপকরণ, সামগ্রী ও শিক্ষক না থাকায়, বিদ্যালয়ে ক্লাস না হওয়ায়; এমনকি অনেকেই বাড়িতে ঠিকমতো পড়ালেখা করতে পারেনা বা করতে দেয়া হয় না। বাংলাদেশের পল্লী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ চিত্রগুলো খুবই পরিচিত। এমনকি অনেক মফস্বল ও শহর এলাকায়ও এ ধরনের দুরবস্থা দেখা যায়।

অধিকার-বঞ্চনার একটি সাধারণ প্রবণতা হলো, যেকোনো অধিকারবঞ্চিতদের তালিকায় নারী ও শিশুরা এগিয়ে থাকে। শিক্ষা- থেকেও বাংলাদেশের গরিব নারী ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত। প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি দেখলে দেখা যাবে, শিশুদের মধ্যে মেয়েশিশুদেরকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। গরিব ও প্রান্তিক পর্যায়ের জনগণের বিষয়টি যদি আরেকটু বিস্তৃত করা যায়, তাহলে আমরা দেখব যে, বস্তিবাসী, ভিক্ষুক, যৌনকর্মী ও ভাসমান শ্রমিক ও তাদের সন্তানেরা শিক্ষার অধিকারসহ বিভিন্ন মৌলিক অধিকার থেকে বেশি বঞ্চিত।

পরিচ্ছেদ-৪.৪: অধিকার লঙ্ঘন ও তার প্রতিকার

যেকোনো অধিকার বাস্তবায়নের প্রশ্ন সাধারণত তখনই দেখা দেয়, যখন অধিকার লঙ্ঘিত বা অস্বীকৃত হয়। বাংলাদেশের মানুষেরা তাঁদের শিক্ষা-অধিকার থেকে বিভিন্নভাবে বঞ্চিত হয়ে আসছে; বলা চলে অধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে। শিক্ষার অধিকার বিষয়ে কাজ করতে যেয়ে একশনএইড বাংলাদেশ ও এর সহযোগীরা যেসব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে শিক্ষার অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এই অধিকার লঙ্ঘন করছে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী, গোষ্ঠীও এই অধিকার লঙ্ঘন প্রক্রিয়ায় জড়িত। একটি দৃষ্টান্তে বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে। কোনো গ্রামে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমাজের রক্ষণশীলেরা ধর্মের দোহাই দিয়ে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করে থাকে। আবার কোনো উপজেলায় মেয়েদের উপবৃত্তির অর্থ ঠিকমতো বা পুরোটা না প্রদান করে স্থানীয় প্রশাসন অধিকার লঙ্ঘন করে থাকে।

অধিকার লঙ্ঘন দু'দিক থেকে হয়ে থাকে। প্রথমটি হলো, দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি জনসাধারণের জন্য তাদের করণীয় কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন না করে, করতে অস্বীকৃতি জানায় বা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। অপরটি হলো অধিকার দাবিদাররা যদি তাদের অধিকারের বিষয়ে দাবি না করে, সচেতন না হয় কিংবা অধিকার বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত বা সংশ্লিষ্টদের ওপর আইনগত ভিত্তিতে চাপ প্রয়োগ না করে। নিচে অধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হলো :

অধিকার লঙ্ঘনের কারণ ← **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে**

অধিকারপ্রাপকদের দিক থেকে

- অধিকার সম্পর্কে সচেতন না হওয়া
- অধিকার দাবি না করা
- অধিকার নিশ্চিতকরণে সমবেতভাবে চাপ তৈরি না করা
- অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলো গণমাধ্যম ও জনসম্মুখে তুলে না ধরা

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে

- বিধি-বিধানগুলো ঠিকমতো প্রয়োগ না করা
- নিয়মকানুন যথাযথভাবে অনুসরণ না করা
- নিয়মনীতি অস্বীকার বা উপেক্ষা করা
- ইচ্ছে মতো নিজের কাজ করা
- দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয় উপকরণ সামগ্রী না থাকা
- প্রতিবন্ধকতা আরোপে সহায়ক এমন কর্মকাণ্ড সমর্থন করা।

শিক্ষার অধিকার বাস্তবায়নের জন্য তাই প্রয়োজন জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের উদ্যোগ, যেখানে অধিকার দাবিদারদেরই সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

শিক্ষা-অধিকার আদায়ে অধিকার-দাবিদারদের প্রত্যাশিত উদ্যোগ

স্থানীয় পর্যায়ে	জাতীয় পর্যায়ে
• অধিকার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা • অধিকার বাস্তবায়নের কার্যক্রম তদারকি করা • অধিকার-দাবিদারদেরকে অধিকার আদায়ে সমর্থন যোগানো • সমাজের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা	• সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি ও জোট গঠন করা • অধিকার বাস্তবায়নের জন্য প্রচারণা চালানো • দায়িত্বপ্রাপ্তদেরকে কর্মসম্পাদনে সহায়তা করা • রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা

কোন পর্যায়ে	কার কাছে যাওয়া যেতে পারে
গ্রাম ইউনিয়ন থানা	• উপজেলা শিক্ষা অফিসার • ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারপার্সন/সদস্য • থানা নির্বাহী কর্মকর্তা • স্থানীয় পৌর কমিশনার • স্কুল কমিটি • স্থানীয় সংসদ সদস্য
জেলা সদর (শহরাঞ্চল)	• জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা • জেলা প্রশাসন • স্থানীয় কমিশনার • স্থানীয় সংসদ সদস্য

শিক্ষার অধিকার লঙ্ঘন : ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক

বস্তুত শিক্ষার অধিকার ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক পর্যায়ে বিভিন্নভাবে লঙ্ঘিত হয়ে আসছে। অধিকার কীভাবে লঙ্ঘিত হয় এবং কীভাবে তার প্রতিকার করা যেতে পারে, তার নমুনা ছক এখানে তুলে ধরা হলো। এর আলোকে শিক্ষাকর্মী ও অধিকারদাবিদাররা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকারে নিজেরাই উদ্যোগ নিতে পারবেন।

বাংলাদেশে শিক্ষা অধিকার : সামষ্টিক দৃষ্টান্ত

অধিকার	অধিকার-দাবিদার	দায়িত্ব পালনকারী	ব্যর্থ বা লঙ্ঘিত হলে শাস্তি/প্রতিকার
সংবিধান: একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা এবং নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকার অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা	শিশুসহ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল নাগরিক	রাষ্ট্র তথা সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	সাংবিধানিক ধারা অনুসারে উচ্চ আদালতের আশ্রয় নেয়া
সংবিধান: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জন্মস্থান বা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সম অধিকার	শিশুসহ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল নাগরিক	রাষ্ট্র তথা সরকার (শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ)	বৈষম্যের শিকার হলে উচ্চ আদালতে মামলা দাখিল করা

অধিকার	অধিকার-দাবিদার	দায়িত্ব পালনকারী	ব্যর্থ বা লঙ্ঘিত হলে শাস্তি/প্রতিকার
জাতীয় শিক্ষা নীতি: দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা	শিশুসহ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল নাগরিক	সরকার (শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ)	গণমাধ্যমে অভিযোগ তুলে ধরা ও আইনের আশ্রয় নেয়া
জমতিয়েন ঘোষণা: সর্বজনীন শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে শিশু, যুবক ও বয়স্কদের মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করা	বাংলাদেশের সকল বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী ও বয়স্ক পুরুষ-মহিলা	সরকার (এবং সরকারকে সহায়তা করতে বেসরকারি সংস্থাসমূহ)	গণমাধ্যমে প্রচারণার সাহায্যে আন্তর্জাতিক ঘোষণা লঙ্ঘনের বিষয়টি সরকারকে স্মরণ করিয়ে দেয়া
ডাকার ঘোষণা: নারী শিশু, সংখ্যালঘু শিশু ও সংঘাতময় পরিস্থিতির শিকার এমন ধরনের শিশুসহ সকল শিশুর জন্য ২০১৫ সালের মধ্যে বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ	বাংলাদেশের সকল শিশু ও নারী	সরকার (এবং সরকারকে সহায়তা করতে বেসরকারি সংস্থাসমূহ)	গণমাধ্যমে প্রচারণার সাহায্যে আন্তর্জাতিক ঘোষণা লঙ্ঘনের বিষয়টি সরকারকে স্মরণ করিয়ে দেয়া

বাংলাদেশে শিক্ষা অধিকার : ব্যষ্টিক দৃষ্টান্ত

অধিকার	অধিকার-দাবিদার	দায়িত্ব পালনকারী	ব্যর্থ বা লঙ্ঘিত হলে শাস্তি/প্রতিকার
৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠানো	৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশু	অভিভাবক	স্কুল কমিটি খোঁজ নেবে এবং প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে জানাবে
স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর নিয়মিত উপস্থিতি	ছাত্র-ছাত্রী	স্কুল কমিটি	অভিভাবকের বক্তব্য শুনে নিয়মিত উপস্থিতির জন্য লিখিত নির্দেশ; দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য ২০০ টাকা জরিমানা
সময়মতো পাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ পাওয়া	ছাত্র-ছাত্রী	• পাঠ্যপুস্তক বোর্ড • শিক্ষা মন্ত্রণালয়	অভিভাবকের বক্তব্য শুনে নিয়মিত উপস্থিতির জন্য লিখিত নির্দেশ; দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য ২০০ টাকা জরিমানা

প্রাথমিক শিক্ষার কতিপয় অধিকার ও বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় শিক্ষাঅধিকার কমিটির করণীয়

ক্রম	প্রাপ্য অধিকার	অধিকার-দাবিদার	দায়িত্ব পালনকারী	ব্যর্থ বা লঙ্ঘিত হলে শাস্তি/ অধিকার পাওয়ার জন্য করণীয়
১.	প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির জন্য তালিকাভুক্ত হওয়া	৬-১০ বৎসর বয়সী শিশু, অভিভাবক	স্থানীয় প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও স্কুল ম্যানিজিং কমিটি	কাউকে তালিকাভুক্ত না করা হলে 'অধিকার কমিটি' প্রথমে এসএমসি বা প্রধান শিক্ষককে জানাবে। এতে কাজ না হলে প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে জানাবে।
২.	৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠানো	ছাত্র-ছাত্রী	অভিভাবক, ওয়ার্ড কমিটি, শিক্ষক	অভিভাবকের বক্তব্য শুনে নিয়মিত উপস্থিতির জন্য ওয়ার্ড কমিটি লিখিত নির্দেশ দিবে; পালনে ব্যর্থতার জন্য অভিভাবককে ২০০ টাকা জরিমানা করবে।
৩.	স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর স্কুলে নিয়মিত উপস্থিতি	ছাত্র-ছাত্রী	অভিভাবক	অভিভাবকের বক্তব্য শুনে নিয়মিত উপস্থিতির অনুরোধ করুন।
৪.	শিক্ষকের কাছে স্নেহপূর্ণ আচরণ পাওয়া	ছাত্র-ছাত্রী	শিক্ষক	বঞ্চিত হলে এসএমসি, প্রধান শিক্ষক, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও ইউপি শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটিকে অবহিত করুন।
৫.	স্কুলে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবস্থা পাওয়া	ছাত্র-ছাত্রী	স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটি	ম্যানেজিং কমিটি, প্রধান শিক্ষক, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও ইউপি শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটিকে অবহিত করুন
৬.	ছেলে মেয়ে সবার লেখাপড়া করার অধিকার	ছেলে ও মেয়ে	প্রধান শিক্ষক	কোনো মেয়ে বা ছেলেকে ভর্তি না নিলে তা এসএমসি ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার (এইউইও)কে জানান।
৭.	বিনা বেতনে পড়া	শিক্ষার্থী	এইউইও	এসএমসি ও এইউইও কে জানান, তাতেও কাজ না হলে ইউপি ষ্ট্যান্ডিং কমিটিকে নিয়ে দাবি আদায়ের উদ্যোগ নিন।
৮.	আদিবাসী নমশুদ্র, ডোম, মুচি, মেথর, প্রতিবন্ধী, যৌনকর্মীর সন্তানের শিক্ষা নেয়ার অধিকার	যেকোনো শিশু অভিভাবক	এইউইও	প্রয়োজনে সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদ ব্যাখা করে প্রধান শিক্ষক, এইউইও, ইউএনওকে বোঝান।

পরিচ্ছেদ ৪.৫: বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা আইন

বাংলাদেশের সংবিধান সর্বজনীন শিক্ষাকে একটি মৌলিক রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ নীতি প্রাথমিক শিক্ষার সামাজিক উদ্দেশ্যসমূহও নির্ধারণ করেছে। এ উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে: জনভিত্তিক একই প্রকারের বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন; শিক্ষাকে সমাজের প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্তকরণ এবং দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ। প্রাথমিক শিক্ষার আইনগত ভিত্তি ও কাঠামো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মূলত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে নব্বই দশক পর্যন্ত অনেকগুলো প্রাথমিক শিক্ষা আইন এবং প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়। এ সকল আইন ও প্রশাসনিক আদেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- প্রাথমিক শিক্ষা আইন (১৯১৯); বঙ্গীয় (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন (১৯৩০); পূর্ববঙ্গ (সংশোধিত) প্রাথমিক শিক্ষা আইন (১৯৫১); পূর্ব পাকিস্তান গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা (অতিরিক্ত) আইন (১৯৫৭); প্রাথমিক শিক্ষা সরকারিকরণ আইন (১৯৭৪); প্রাথমিক শিক্ষা আইন (১৯৮১); প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ প্রশাসনিক আদেশ (১৯৮৩) এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন (১৯৯০)। এ সকল আইন ও প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইনগত কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাধ্যতামূলক (অবৈতনিক) প্রাথমিক শিক্ষা আইন (১৯৯০)

১৯৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক) আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে (পড়ুন সংযোজনী–৫ঃ প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক) আইন, ১৯৯০)। প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ (পিএমইডি) নামে একটি আলাদা বিভাগও প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯৩ সালে সারা দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা হয়।

স্থানীয় পর্যায়ের কমিটিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য:

১. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কমিটিতে মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদেরকে উপদেষ্টা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
২. প্রতিটি কমিটিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।
৩. জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ সংশ্লিষ্ট কমিটিতে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
৪. এসব কমিটিতে জনপ্রতিনিধিরাও সম্পৃক্ত থাকবেন।
৫. এসব কমিটিতে মনোনীত/নির্বাচিত স্থানীয় শিক্ষানুরাগীগণ অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।
৬. জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ এসব কমিটিতে সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
৭. প্রতিটি কমিটির জন্য সভা সংখ্যা নির্দিষ্ট করা আছে।
৮. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে সমন্বয় ও মনিটরিং ব্যবস্থার নির্দেশনা দেয়া আছে।
৯. কমিটিগুলোর দায়িত্ব ও কর্তব্য বা কাজ বিস্তারিতভাবে বলা আছে।
১০. প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট করা আছে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনের আওতায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে অংশগ্রহণমূলক করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই আইনে গ্রামাঞ্চলের জন্য প্রতিটি ইউনিয়নের ওয়ার্ডে অথবা শহরাঞ্চলে পৌরসভার ওয়ার্ডে 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি' গঠনের কথা বলা হয়। কমিটিতে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব দেয়া হয়।

যেহেতু আইন অনুসারে সুনির্দিষ্ট কিছু কারণ ছাড়া কোনো শিশুরই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করা যাবে না, সেহেতু শিশুকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করাও হবে আইনগত অপরাধ। এ জন্য একদিকে যেমন পিতামাতা বা অভিভাবক দায়ী হবেন, তেমনি দায়ী হতে পারেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী যে কেউ। আইনানুসারে শিশুর বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে এমন কোনো কাজে শিশুকে কোনোক্রমে নিয়োগ করা চলবে না। গ্রামাঞ্চলে দেখা যায়, কৃষক বাবা তার ছেলেকে স্কুল বাদ দিয়ে ধানক্ষেতে চাষাবাদের কাজের জন্য নিয়ে যাচ্ছে; কিংবা

মাছ ধরার কাজে নদীতে নিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে অভিভাকদের সচেতন করে, শিশুকে শিক্ষার পরিবর্তে শ্রম কাজে অংশগ্রহণ বন্ধ করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা আইনসমূহ থেকে প্রাপ্তি–বাংলাদেশে এ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক ৩টি আইন প্রণীত হয়েছে (১৯৭৪, ১৯৮১, ১৯৯০)। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বিকেন্দ্রিকরণ অধ্যাদেশ প্রণীত হয়েছে ১৯৮৩ সালে এবং তা পরবর্তীতে বাস্তবায়িত হয়েছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৯০ এখনও কার্যকর। প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৮১ ও প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ কয়েকবার বাতিল ঘোষিত হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৯০ এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর ব্যবস্থাপনা কমিটি। এ আইনে জেলা থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত বিভিন্ন কমিটি গঠনের নির্দেশ আছে। উল্লেখযোগ্য কমিটিগুলো হলো: ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা কমিটি। এ ছাড়াও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনও একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি বাদে অন্যগুলো সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের স্থানীয় সরকারসমূহের সাথে সম্পর্কিত বা সংযুক্ত। এ আইনে ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটিগুলো শিশুদের স্কুলে ভর্তির ব্যাপারটিকে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম তদারকি করবেন এবং এসব নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন। তাছাড়া কোনো অভিভাবক তার সন্তানকে স্কুলে না পাঠালে তাকে জবাবদিহির আওতায় আনবেন।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনে উপজেলাকে প্রশাসনিক একক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং প্রতিটি ওয়ার্ডকে গণ্য করা হয়েছে শিক্ষাকেন্দ্র ও শিক্ষাসম্পর্কিত কার্যাবলীর মূল ধারক বাহক। এই আইনের ৪নং অনুচ্ছেদে প্রতিটি ওয়ার্ডে ৬ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে এই আইনে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়েও কমিটি গঠনের নির্দেশনা আছে। এসব স্থানীয় পর্যায়ের কমিটিগুলোর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

পরিচ্ছেদ ৪.৬: জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ (সংক্ষেপিত)

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ উল্লেখিত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ‘শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা, নারীশিক্ষা এবং আরও দু-একটি প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে ধরা হলো।

১. শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

১. শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করা।

২. ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা এবং তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করা এবং তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলীর (যেমন: ন্যায়বোধ, অসাম্প্রদায়িক-চেতনাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার-সচেতনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, শৃঙ্খলা, সৎ জীবনযাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যাবসায়, ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো।

৪. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।

৫. দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবন-ঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করা।

৬. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা; শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশে সহায়তা প্রদান করা।

৭. জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থসামাজিক শ্রেণী-বৈষম্য ও নারীপুরুষ বৈষম্য দূর করা, অসাম্প্রদায়িকতা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।

৮. বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষালাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা। শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্য হিসেবে ব্যবহার না করা।

৯. গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করা।

১০. মুখস্থবিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি ও অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতি স্তরে মানসম্পন্ন প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

১১. বিশ্বপরিমণ্ডলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিষয়ে উচ্চমানের দক্ষতা সৃষ্টি করা।

১২. জ্ঞানভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর (ডিজিটাল) বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি (ICT) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য (গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি) শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা।

১৩. শিক্ষাকে ব্যাপকভিত্তিক করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপর জোর দেয়া, শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর-নির্বিশেষে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।

১৪. সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে সম-মৌলিক চিন্তাচেতনা গড়ে তোলা এবং জাতির জন্য সম-নাগরিক ভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সব ধারার শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ। একই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্তরেও একইভাবে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে পাঠদান।

১৫. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিশুর/শিক্ষার্থীর সুরক্ষা ও যথাযথ বিকাশের অনুকূল আনন্দময় ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সেটি অব্যাহত রাখা।

১৬. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনে সহায়তা করা।

১৭. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে যথাযথ মান নিশ্চিত করা এবং পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত (শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ) জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত দৃঢ় করে পরবর্তী স্তরের সাথে সমন্বয় করা। এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা। এই লক্ষ্যে শিক্ষা প্রক্রিয়ায়, বিশেষ করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ অবদান রাখার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা।

১৮. শিক্ষার্থীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ-সচেতনতা এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।

১৯. সর্বক্ষেত্রে মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উৎসাহী করা; এবং মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার সাথে সাথে দেশের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা।

২০. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা চর্চা এবং শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে সে লক্ষ্যে যথাযথ আবহ ও পারিপার্শ্বিকতা নিশ্চিত করা।

২১. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষাদানের উপকরণ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

২২. পথশিশুসহ আর্থ-সামাজিকভাবে বঞ্চিত সকল ছেলে-মেয়েকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা।

২৩. দেশের আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্রজাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো।

২৪. সব ধরনের প্রতিবন্ধীর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা।

২৫. দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।

২৬. শিক্ষাক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২৭. বাংলাভাষা শুদ্ধ ও ভালভাবে শিক্ষা দেয়া নিশ্চিত করা।

২৮. শিক্ষার্থীদের শারীরিক মানসিক বিকাশের পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাঠ, ক্রীড়া, খেলাধুলা ও শরীর চর্চার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

২৯. শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩০. মাদক জাতীয় নেশাদ্রব্যের বিপদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সতর্ক ও সচেতন করা।

২. প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা

ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

শিশুদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করার আগে শিশুর অন্তর্নিহিত অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল, আনন্দবোধ ও অফুরন্ত উদ্যমের মতো সর্বজনীন মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ এবং প্রয়োজনীয় মানসিক ও দৈহিক প্রস্তুতি গ্রহণের পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। তাই তাদের জন্য প্রস্তুতিমূলক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা জরুরি। অন্যান্য শিশুর সঙ্গে একত্রে এই প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা শিশুর মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। কাজেই ৫+ বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য প্রাথমিকভাবে এক বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হবে। পরবর্তীকালে তা ৪+ বছর বয়স্ক শিশু পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে। এ পর্যায়ে শিক্ষাক্রম হবেঃ

- শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুর আগ্রহ সৃষ্টিমূলক এবং সুকুমার বৃত্তির অনুশীলন।
- অন্যদের প্রতি সহনশীলতা এবং পরবর্তী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ।

কৌশল

১. অন্যান্য গ্রহণযোগ্য উপায়ের সঙ্গে ছবি, রং, নানা ধরনের সহজ আকর্ষণীয় শিক্ষা-উপকরণ, মডেল, হাতের কাজের সঙ্গে ছড়া, গল্প, গান ও খেলার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে।

২. শিশুদের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা ও কৌতুহলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে তাদের স্বাভাবিক প্রাণশক্তি ও উচ্ছ্বাসকে ব্যবহার করে আনন্দময় পরিবেশে মমতা ও ভালোবাসার সঙ্গে শিক্ষা প্রদান করা হবে। শিশুদের সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে যেন তারা কোনোভাবেই কোনোরকম শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের শিকার না হয়।

৩. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে বাড়তি শিক্ষকের পদ সৃষ্টি ও শ্রেণীকক্ষ বৃদ্ধি করা হবে। তবে সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল হওয়ায় ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা হবে।

৪. মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও প্যাগোডায় ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত সকল ধর্মের শিশুদেরকে ধর্মীয়জ্ঞান, অক্ষরজ্ঞানসহ আধুনিক শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষাপ্রদানের কর্মসূচি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে গণ্য করা হবে।

খ. প্রাথমিক শিক্ষা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অত্যাধিক। দেশের সব মানুষের জন্য শিক্ষার আয়োজন এবং জনসংখ্যাকে দক্ষ করে তোলার ভিত্তিমূল–প্রাথমিক শিক্ষা। তাই মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের জন্য জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক, শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা এবং ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকল শিশুর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। এ কাজ করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। শিক্ষার এই স্তর পরবর্তী সকল স্তরের ভিত্তি সৃষ্টি করে বলে যথাযথ মানসম্পন্ন উপযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। প্রাথমিক শিক্ষার পর অনেকে কর্মজীবন আরম্ভ করে বলে মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা তাদের যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে স্থান ও বিদ্যালয়ভেদে সুযোগ-সুবিধার প্রকট বৈষম্য, অবকাঠামোগত সমস্যা, শিক্ষক-স্বল্পতা ও প্রশিক্ষণের দুর্বলতাসহ বিরাজমান সমস্যাসমূহ দূর করে জাতির সার্বিক শিক্ষার ভিত শক্ত করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষা হবে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক এবং সকলের জন্য একই মানের। অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক এবং ভৌগোলিক কারণে বর্তমানে শতভাগ শিশুদের প্রাথমিক স্কুলের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না; তবে ২০১০-১১ সালের মধ্যে প্রথমিক স্কুলে ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত করা হবে। যে সমস্ত গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সে সকল গ্রামে ন্যূনপক্ষে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় দ্রুত প্রতিষ্ঠা করা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ:

১. মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা। বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করা।

২. কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান বাধ্যতামূলক করা।

৩. শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচারবোধ, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবাধিকার, সহ-জীবনযাপনের মানসিকতা, কৌতূহল, প্রীতি, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করা এবং তাকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক করা এবং কুসংস্কারমুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করা।

৪. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে দেশাত্মবোধের বিকাশ ঘটানো এবং দেশগঠনমূলক কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ করা।

৫. শিক্ষার্থীর নিজ স্তরের যথাযথ মানসম্পন্ন প্রান্তিক দক্ষতা নিশ্চিত করে তাকে উচ্চতর ধাপের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী এবং উপযোগী করে তোলা। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। এ ছাড়া ভৌত অবকাঠামো, সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক আকর্ষণীয় করে তোলা এবং মেয়েদের মর্যাদা সমুন্নত রাখা।

৬. শিক্ষার্থীকে জীবনযাপনের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, জীবন-দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, সামাজিক সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখনচাহিদা পূরণে সমর্থ করা এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষালাভের উপযোগী করে গড়ে তোলার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৭. শিক্ষার্থীদের মধ্যে কায়িক শ্রমের প্রতি আগ্রহ ও মর্যাদাবোধ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষাসম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৮. প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব স্ব মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৯. শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ এলাকাসমূহে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ নজর দেয়া।

১০. সবধরনের প্রতিবন্ধীসহ সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

কৌশল

রাষ্ট্রের দায়িত্ব

সকলের জন্য মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার তাগিদ সংবিধানে বিধৃত আছে। তাই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব; এবং রাষ্ট্রকেই এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব বেসরকারি বা এনজিও খাতে হস্তান্তর করা যাবে না। কোনো ব্যক্তি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা কোনো এনজিও প্রাথমিক শিক্ষাদানকল্পে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে চাইলে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান পালন করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ও বাস্তবায়ন

১. প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বৃদ্ধি করে আট বছর অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে। এটি বাস্তবায়নে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অবকাঠামোগত আবশ্যকতা মেটানো এবং প্রয়োজনীয়সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে প্রাথমিক শিক্ষায় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত চালু করার জন্য অনতিবিলম্বে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে:

- প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার নতুন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা;
- প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষকের জন্য শিক্ষাক্রম বিস্তারসহ শিখন-শেখানো কার্যক্রমের ওপর ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস করা।

প্রাথমিক শিক্ষার এই পুনর্বিন্যাসের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের সকল বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো হবে। যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে ২০১৮ এর মধ্যে আট বছরব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন, ছেলে-মেয়ে, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং জাতিসত্তা-নির্বিশেষে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল শিশুর জন্য নিশ্চিত করা হবে।

বিভিন্ন ধারার সমন্বয়

২. একই পদ্ধতির মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার বাংলাদেশের সংবিধানে ব্যক্ত করা হয়েছে। সাংবিধানিক তাগিদে বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে সমগ্র দেশে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত বিষয়সমূহে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করা হবে। অর্থাৎ, প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধারা যথা সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন (বাংলা ও ইংরোজি মাধ্যম), ইবতেদায়িসহ সব ধরনের মাদ্রাসার মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর জন্য এই ব্যবস্থা চালু করা হবে। নিধারিত বিষয়সমূহ ছাড়া অন্যান্য নিজস্ব কিংবা অতিরিক্ত বিষয় শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে বিভিন্ন ধারায় সন্নিবেশ করা যাবে।

৩. শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ইবতেদায়িসহ সবধরনের মাদ্রাসাসমূহ আট বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা চালু করবে এবং প্রাথমিক স্তরের নতুন সমন্বিত শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

৪. বিভিন্ন ধরনের (কমিউনিটি বিদ্যালয়, রেজিস্ট্রিকৃত নয় এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রেজিস্ট্রিকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ ও শহুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে সুযোগ-সুবিধার যে প্রকট বৈষম্য বিরাজমান তা দূরীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয়া হবে। সাধারণ, কিন্ডারগার্টেন, ইংরেজী মাধ্যম ও সব ধরনের মাদ্রাসাসহ সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নিয়মনীতি মেনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধন করতে হবে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি

৫. প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার ধারা নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট শ্রেণীর পাঠ্যসূচি অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজি, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, গণিত, সামাজিক পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হবে। সকল বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হবে। ওই কমিটি যথাযথ পর্যালোচনার মাধ্যমে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করবে। সর্বত্র অবকাঠামো তৈরি এবং কম্পিউটার সরবরাহ ও কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগ না দেয়া পর্যন্ত তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা ও মূল্যায়ন সহজপাঠ ও অনুশীলন পুস্তকভিত্তিক হবে। মানসম্পন্ন ইংরেজি লিখন-কথনের লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম শুরু থেকেই গ্রহণ করা হবে এবং ক্রমান্বয়ে ওপরের শ্রেণীসমূহে প্রয়োজন অনুসারে তা জোরদার করা হবে। প্রথম শ্রেণী থেকে সহশিক্ষাক্রম বিষয় থাকতে পারে। প্রাথমিক স্তর থেকে নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। প্রাথমিক স্তরের শেষ তিন শ্রেণীতে অর্থাৎ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জীবন ও পরিবেশ-উপযোগী প্রাক-বৃত্তিমূলক এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা প্রদান করা হবে; যাতে যারা কোনো কারণে আর উচ্চতর পর্যায়ে পড়ার সুযোগ না পেলে, এ শিক্ষার ফলে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে পারে।

ভর্তির বয়স

৬. বর্তমানে চালু ৬+ বছর বয়সে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির নিয়ম বাধ্যতামূলক করা হবে।

৭. প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১: ৩০। এ লক্ষ্য পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে অর্জন করা হবে।

বিদ্যালয়ের পরিবেশ

৮. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক/শিক্ষিকার আচরণ যেন শিক্ষার্থীদের কাছে বিদ্যালয়কে আকর্ষণীয় করে তোলে সেদিকে নজর দেয়া হবে এবং শিক্ষা পদ্ধতি হবে শিক্ষার্থীদের জন্য আনন্দদায়ক, চিত্তাকর্ষক এবং পঠনে আগ্রহ সৃষ্টির সহায়ক।

৯. সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান ও গ্রহণ এবং শিক্ষার্থীর সুরক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে।

শিক্ষা-সামগ্রী

১০. প্রাথমিক শিক্ষার নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলীর ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম-কাঠামো অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য পৃথক বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা এবং শ্রেণীগত যোগ্যতা নির্ধারণ করে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা সামগ্রী যথা পাঠ্যপুস্তক এবং প্রয়োজনবোধে সম্পূরক পঠনসামগ্রী এবং অনুশীলনপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা (বিশ্লেষণ, উদাহরণ ও অনুশীলনসংবলিত পুস্তক) প্রণয়ন করবে। সকল পাঠ্যপুস্তক সহজ ও সাবলীল ভাষায় রচিত, আকর্ষণীয় এবং নির্ভুল করা হবে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতিতে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা হবে।

ঝরে পড়া সমস্যার সমাধান

১১. দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্য উপবৃত্তি সম্প্রসারণ করা হবে।

১২. স্কুলের পরিবেশ আকর্ষণীয় ও আনন্দময় করে তোলা হবে। এ লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য খেলাধুলার সুব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের আগ্রহ, মমত্ববোধ ও সহানুভূতিশীল আচরণ নিশ্চিত করা এবং পরিচ্ছন্ন ভৌত পরিবেশসহ উল্লেখযোগ্য উপকরণের উন্নয়ন ঘটানো হবে। ছেলে এবং মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্পন্ন পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করা হবে। শারীরিক শাস্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা হবে।

১৩. দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা জরুরি। পিছিয়ে পড়া এলাকাসহ গ্রামীণ সকল বিদ্যালয়ে দুপুরে খাবার ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে চালু করা হবে।

১৪. পাহাড়ি এলাকায় এবং দূরবর্তী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ের হোস্টেলের ব্যবস্থা করার দিকে নজর দেয়া হবে।

১৫. হাওর, চর এবং একসাথে বেশ কিছুদিন ধরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হয়, এমন এলাকার বিদ্যালয়ের সময়সূচি এবং ছুটির দিনসমূহের পরিবর্তন করার সুযোগ থাকবে। এ সকল বিষয়ে স্থানীয় সমাজভিত্তিক তদারকি ব্যবস্থার সুপারিশে স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।

১৬. মেয়েশিশুদের মধ্যে ঝরে পড়ার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে অধিক হওয়ায় তারা যাতে ঝরে না পড়ে সেদিকে বিশেষ নজর দেয়া হবে।

১৭. বর্তমানে পঞ্চম শ্রেণী শেষ করার আগে প্রায় অর্ধেক এবং যারা পরবর্তী পর্যায়ে যায় তাদের প্রায় ৪০ শতাংশ দশম শ্রেণী শেষ করার আগে ঝরে পড়ে। তাই ঝরে পড়া দ্রুত কমিয়ে আনা জরুরি। ২০১৮ সালের মধ্যে সকল শিক্ষার্থী যেন অষ্টম শ্রেণী শেষ করে, সে লক্ষ্যে উপযুক্ত পদক্ষেপগুলোসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দ্রুত গ্রহণ করা হবে।

আদিবাসী শিশু

১৮. আদিবাসী শিশুরা যাতে নিজেদের ভাষা শিখতে পারে সেই লক্ষ্যে তাদের জন্য আদিবাসী শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা হবে। এই কাজে, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে, আদিবাসী সমাজকে সম্পৃক্ত করা হবে।

১৯. আদিবাসী প্রান্তিক শিশুদের জন্য বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে।

২০. আদিবাসী-অধ্যুষিত (পাহাড় কিংবা সমতল) যে সকল এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সে সকল এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। যেহেতু কোনো কোনো এলাকায় আদিসাবীদের বসতি হালকা, তাই একটি বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের আবাসিক ব্যবস্থার প্রয়োজন হলে সেদিকে নজর দেয়া হবে।

প্রতিবন্ধী শিশু

২১. সব ধরনের প্রতিবন্ধীর জন্য প্রয়োজনানুসারে বিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবন্ধীবান্ধব সুযোগ-সুবিধা, যেমন-শৌচাগার ব্যবহারসহ চলাফেরা করা ও অন্যান্য সুযোগ নিশ্চিত করা হবে।

২২. প্রতিবন্ধীদের বিশেষ প্রয়োজনকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিশেষ বিবেচনা করা হবে।

২৩. প্রত্যেক পিটিআইতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর কমপক্ষে একজন প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

পথশিশু ও অন্যান্য অতিবঞ্চিত শিশু

২৪.এদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনার এবং ধরে রাখার লক্ষ্যে বিনা খরচে ভর্তির সুযোগ, বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, দুপুরের খাবার ব্যবস্থা এবং বৃত্তিদানসহ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিদ্যালয়ে তাদের সুরক্ষার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিভিন্ন ধরনের এবং এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে বিদ্যমান প্রকট বৈষম্য

২৫.এই বৈষম্য ধাপে ধাপে কমিয়ে আনা হবে। সেই লক্ষ্যে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া এলাকাসমূহে অবস্থিত স্কুলসহ গ্রামীণ বিদ্যালয়সমূহকে পরিকল্পিত কর্মসূচির ভিত্তিতে বিশেষ সহায়তা দেওয়া হবে, যাতে কয়েক বছরের মধ্যে বৈষম্য নিরসনে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে।

শিক্ষণ পদ্ধতি

২৬. শিশুর সৃজনশীল চিন্তা ও দক্ষতার প্রসারের জন্য সক্রিয় শিক্ষণ-পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীকে এককভাবে বা দলগতভাবে কার্য সম্পাদনের সুযোগ দেয়া হবে। ফলপ্রসূ শিক্ষাদান পদ্ধতি উদ্ভাবন, পরীক্ষণ ও বাস্তবায়নের জন্য গবেষণা উৎসাহিত করা হবে এবং সেজন্য সহায়তা দেয়া হবে।

শিক্ষার্থী মূল্যায়ন

২৭.প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় থেকে সকল শ্রেণীতে ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা চালু থাকবে। পঞ্চম শ্রেণী শেষে উপজেলা/পৌরসভা/থানা (বড় বড় শহর) পর্যায়ে সকলের জন্য অভিন্ন প্রশ্নপত্রে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অষ্টম শ্রেণী শেষে আপাততঃ জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা নামে একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং এই পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হবে।

বিদ্যালয়ের উন্নতি ও শিক্ষার মানোন্নয়নে তদারকি এবং তাতে জনসম্পৃক্ততা

২৮.বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ বিবেচনার ভিত্তিতে নির্বাচিত ও পদাধিকারবলে অন্তর্ভুক্ত সদস্য সম্বলিত ব্যবস্থাপনা কমিটিকে আরো সক্রিয় করার লক্ষ্যে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কমিটিকে প্রয়োজনে আরও ক্ষমতা দেয়া হবে। তবে পাশাপাশি কমিটির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

২৯.সক্রিয় অভিভাবক-শিক্ষক কমিটি প্রতিষ্ঠা করে অভিভাবকদেরকে বিদ্যালয় এবং তাঁদের ছেলেমেদের পড়াশোনার বিষয়ে আরও উৎসাহী করার পদক্ষেপ নেয়া হবে।

শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষকদের পদোন্নতি

৩০.প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষক নিয়োগের সর্বনিম্ন সাধারণ যোগ্যতা হবে দ্বিতীয় বিভাগসহ এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষা পাশ এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর জন্য দ্বিতীয় বিভাগসহ স্নাতক ডিগ্রিধারী নারী বা পুরুষ। তবে নিচের শ্রেণীতে নারী শিক্ষকদের প্রাধান্য দেয়া হবে। যোগদানের পর সর্বোচ্চ তিন বছরের মধ্যে এ সকল শিক্ষককে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে এবং সি-ইন-এড/বিএড অর্জন করতে হবে। প্রধান শিক্ষকের সরাসরি নিয়োগের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হবে দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং যোগদানের পর সর্বোচ্চ তিন বছরের মধ্যে সি-ইন-এড/বি.এড (প্রাইমারি) ডিগ্রি অর্জন করতে হবে। শিক্ষকদের স্তর এবং বেতন স্কেল যথোপোযুক্ত বিন্যাস করে (যথা-সহকারি শিক্ষক, সহকারি প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক) তাদের পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করে শিক্ষকদের উৎসাহিত করা হবে। অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং জাতির ভবিষ্যৎ গঠনে শিক্ষকদের গুরুত্ব ও মর্যাদা বিবেচনায় নিয়ে তাদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ করা হবে; পাশাপাশি তাদের জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করা হবে।

৩১.শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং কর্মকালীন প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। প্রয়োজনবোধে ও সম্ভাব্যক্ষেত্রে বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। দেশে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ ক্ষমতা বাড়ানো হবে।

৩২. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সঙ্গে পদোন্নতির যোগসূত্র স্থাপন করা আবশ্যক বলে উচ্চতর ডিগ্রিধারী এবং প্রশিক্ষিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সরাসরি নিয়োগ এবং ত্বরান্বিত পদোন্নতির মাধ্যমে উচ্চতর পদ পূরণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রয়োজনে পদ উন্নীত (আপগ্রেইডিং) করা হবে। তবে এর জন্য যথাযথ বিধি-বিধান তৈরি করা হবে।

শিক্ষক নির্বাচন

৩৩. সরকারি অনুমোদন ও আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ইবতেদায়ি মাদ্রাসাসমূহের জন্য মেধাভিত্তিক ও উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচনের লক্ষ্যে সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ একটি বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। এই কমিশন শিক্ষা ও প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হবে। যথাযথ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে কমিশন শিক্ষক নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পাদন করবে। এই নির্বাচন উপজেলা বা জেলাভিত্তিক হবে। কমিশন দ্বারা নির্বাচিতদের মধ্য থেকে যথাযথ নিয়োগদানকারী কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেবে। বিদ্যালয়গুলোতে প্রত্যেক বছর কতজন শিক্ষক প্রয়োজন তা উপজেলা সমন্বয় করে কমিশনকে জানাবে। আর এই ভিত্তিতে এক বছরের জন্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নির্বাচনের উপজেলা লক্ষ্য স্থির করা হবে। এই কমিশনকে মাধ্যমিক ও বেসরকারি (সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত) ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক নির্বাচনের দায়িত্ব দেয়া হবে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ

৩৪. বিদ্যালয়ে অভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব মূলত প্রধান শিক্ষকের ওপর। তাই এই দায়িত্ব দক্ষতার সাথে যাতে প্রধান শিক্ষকগণ পালন করতে পারেন সেজন্য তাঁদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের বহিঃতত্ত্বাবধানের ও পরিবীক্ষণের কাজ যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ করা আবশ্যক। একাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদেরকে (যেমন-সহকারি শিক্ষা অফিসার) বাস্তবসম্মতভাবে বিদ্যালয়ের সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়া হবে, যাতে তাঁরা তত্ত্বাবধায়ন ও পরিবীক্ষণের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেন।

অন্যান্য

৩৫. প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীন বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হবে। কোনো গ্রামে বিদ্যালয় নেই বা কোনোগ্রামে আরও বিদ্যালয় প্রয়োজন তা জরিপের মাধ্যমে স্থির করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হবে।

৩৬. ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্রাইমারি এডুকেশন (নেপ)-কে অভীষ্ট মানের শীর্ষ পর্যায়ের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে, যেন তা কার্যকরভাবে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভিন্ন উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ পিটিআইগুলোর অ্যাকাডেমিক স্টাফদের এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও প্রকল্পভুক্ত অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, মৌলিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম তৈরি ও অনুমোদন, প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধান, প্রশিক্ষণার্থীদের পরীক্ষা পরিচালনা ও ডিপ্লোমা প্রদান করা, প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা, কর্মশালা, সম্মেলন পরিচালনা ইত্যাদি।

৩৭. সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমগ্র জাতিকে সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে হবে।

৩৮. শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় আচরণিক সচেতনতা (যেমন: নখ কাটা, হাত ধোয়া, দাঁত পরিষ্কার করা ইত্যাদি) সৃষ্টি করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৩. মাদ্রাসা শিক্ষা

মাদ্রাসা শিক্ষায় ইসলাম ধর্ম শিক্ষার সকল প্রকার সুযোগ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষার্থীরা যেন ইসলামের আদর্শ ও মর্মবাণী অনুধাবনের পাশাপাশি জীবনধারণ সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী হয় ও উৎকর্ষ সাধনে ভূমিকা রাখতে পারে তার জন্য যথার্থ জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা করা হবে।

শিক্ষাক্রম ও কৌশল

১. শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ইবতেদায়িসহ সব ধরনের মাদ্রাসাসমূহ আট বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা চালু করবে এবং প্রথমিক স্তরের নতুন সমন্বিত শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

২. অন্যান্য ধারার সঙ্গে সমন্বয় রেখে ইবতেদায়ি পর্যায়ে নির্দিষ্ট শ্রেণীর শিক্ষাক্রম অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজি, গণিত, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, সামাজিক পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি, তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করা হবে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা প্রদান করা হবে। দাখিল পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ গণিত, বাংলাদেশ স্টাডিজ এবং তথ্য প্রযুক্তি বিষয় বাধ্যতামূলক থাকবে।

৩. সাধারণ শিক্ষার মতো মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার, শিক্ষা-উপকরণ, বৃত্তিদান, বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ ইত্যাদির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে এবং খেলাধুলার সরঞ্জাম ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা হবে।

৪. মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চ অর্থাৎ ফাজিল ও কামিল পর্যায়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পাঠদান করা হবে।

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

১. মাদ্রাসার ক্ষেত্রে জুনিয়র দাখিল, দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় সকল ধারার জন্য আবশ্যিক বিষয়সমূহে অন্যান্য ধারার সঙ্গে অভিন্ন প্রশ্নপত্র অনুসরণ করা হবে।

২. সকল স্তরের সুচারুরূপে পরিচালনা ও তদারকির জন্য সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিতরূপে পরিবীক্ষণ ও অ্যাকাডেমিক পরিদর্শনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪. নারী শিক্ষা

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। নারীশিক্ষাকে শুধু পরিবারের মঙ্গল, শিশু যত্ন ও ঘরকন্নার কাজে সীমাবদ্ধ রেখে জাতীয় উন্নয়নে নারীকে নিষ্ক্রিয় রাখার বিরাজমান প্রবণতা দূর করা হবে। সার্বিক উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও সুষম সামাজিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারী শিক্ষার ওপর জোর দেয়া হবে।

১. মেয়েশিশুরা যাতে বিদ্যালয় থেকে ঝরে না পড়ে সেদিকে বিশেষ নজর দেয়া হবে। ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে যাতায়াতের সময় যাতে অসুবিধার সম্মুখীন না হয়, সেজন্য তাদের শিক্ষার সুবিধার্থে বিদ্যালয়ে যাতায়াতের সুবিধা ও প্রয়োজনে নিরাপদ ছাত্রীনিবাসের ব্যবস্থা করা হবে।

২. ঝরে পড়া ছাত্রীদের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ নেয়া হবে। যাদেরকে এভাবে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না, তাদেরকে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কর্মসূচির আওতায় আনা হবে।

৩. প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে পাঠ্যসূচিতে নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তি ও সমান অধিকারের কথা তুলে ধরা হবে, যাতে নারীর প্রতি সামাজিক আচরণের পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

৪. যৌতুক ও নারী নির্যাতন নিরসন এবং নারীর অধস্তন অবস্থার পরিবর্তন ও সম-অধিকার নিশ্চিত করার প্রক্রিয়ায় নারী যাতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে পারেন তার উপযোগী করে নারীকে গড়ে তোলা।

৫. বাজেটে নারীশিক্ষা খাতে বিশেষ বরাদ্দ দেয়া হবে। শিক্ষার সকল স্তরে নারী শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করা হবে এবং বেসরকারি উদ্যোগ ও অর্থায়ন উৎসাহিত করার ব্যবস্থা করা হবে।

৬. ছাত্রীদের জন্য খণ্ডকালীন, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার প্রতি নজর দেয়া হবে।

৭. অধিক সংখ্যক মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় আনা হবে এবং তাদের প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা/ পেশাদারি শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হবে এবং এ বিষয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৮. মেয়েদেরকে বিজ্ঞান শিক্ষায় এবং পেশাদারি শিক্ষায় (যেমন: প্রকৌশল, মেডিকেল, আইন, ব্যবসায় ইত্যাদি) উৎসাহিত করা হবে।

৯. মেয়েরা যাতে অধিক হারে কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সে লক্ষ্যে প্রয়োজনে মেয়েদের জন্য পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আরও বাড়ানো হবে। প্রস্তাবিত উপজেলা কারিগরি বিদ্যালয়সমূহে মেয়েদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হবে এবং তাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে।

১০. উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণা করার জন্য দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের বিশষ বৃত্তির ব্যবস্থা এবং সুদমুক্ত/স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা হবে।

১১. প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সকল নীতি নির্ধারণী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

১২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রণীত যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন রোধ সংক্রান্ত বিধিবিধান কঠোরভাবে অনুসরণ করা হবে।

৫. কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়

ক. গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার সভ্যতার দর্পণ বলে বিবেচিত। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রন্থাগার যেমন একটি দেশের সার্বিক সাংস্কৃতিক বিকাশগত মান নির্ধারণের অন্যতম সূচক, তেমনি গ্রন্থাগার একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। দেশের নাগরিকদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা জীবনব্যাপী শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, গবেষণা, নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিক্ষা গ্রহণে গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যমে জ্ঞান ও তথ্য সহজলভ্য করার দায়িত্ব হলো গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্রের। এই প্রত্যয়কে ভিত্তি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

কৌশল

১. দেশের প্রত্যেকটি উপজেলা সদরে এবং বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপন করা হবে এবং উপজেলা গ্রন্থাগারের দায়িত্ব হবে প্রাথমিক/মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপযোগী বই সবরাহ করা।

২. উপজেলাভিত্তিক গ্রন্থাগারগুলোকে পর্যায়ক্রমে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর করা হবে। পিটিআই, নেপ এবং অধিদপ্তরসমূহের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারগুলো আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৩. শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য যথাযথ কর্মসূচি নেয়া হবে। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারিক, সহ-গ্রন্থাগারিকসহ অন্যান্য পদ সৃষ্টি করা ও তাদের যথাযথ মর্যাদা নির্ধারণ করা হবে। গ্রন্থাগারে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে।

খ. পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

পরীক্ষা ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে নিম্নরূপ:

১. মুখস্থ বিদ্যা নয়; বরং শিক্ষার্থী বিষয়বস্তুকে কতটুকু আত্মস্থ করতে পেরেছে তা মূল্যায়নের লক্ষ্যে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা।

২. পরীক্ষা ও মূল্যায়নের স্তর, পদ্ধতি এবং সকল ধারার জন্য অভিন্ন কৌশল অনুসরণের নিয়মনীতি নির্ধারণ করা।

৩. যথাযথ মূল্যায়নের জন্য পাঠ্যপুস্তক, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করার নিয়মকানুন নির্ধারণ এবং প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের তা বুঝতে পারার উপায় নির্ধারণ এবং এ বিষয়ে তাঁদের সচেতন করা।

কৌশল

১. শিক্ষার সকল স্তরে জ্ঞানার্জন মূল্যায়ন যাতে যথার্থ হয় সেদিকে যথাযথ নজর দেয়া হবে। পরীক্ষা পদ্ধতিকে আরও কার্যকর করা হবে।

২. ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীদের অনুভূতি ও মনন সম্পর্কিত বিকাশ মূল্যায়ন করার পদ্ধতি নিরূপণের ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে।

৩. প্রচলিত পদ্ধতিতে মূলতঃ মুখস্থ বিদ্যা মূল্যায়িত হয়। এটি প্রকৃত মূল্যায়ন হতে পারে না। আসলে মুখস্থ বিদ্যা নয়; বরং বিষয়বস্তুকে কতটুকু আত্মস্থ করা হয়েছে তার মূল্যায়ন করা গেলেই শিক্ষার প্রকৃত মূল্যায়ন করা হবে। বর্তমানে যে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হচ্ছে, সেটি আত্মস্থ করা মূল্যায়নের একটি প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগ নির্ভর করবে উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিল রেখে যথাযথ পাঠ্যপুস্তক, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করার নিয়মকানুন নির্ধারণ করা এবং প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের তা যথাযথভাবে বুঝতে পারার ওপর। কাজেই এ বিষয়ে

যথাযথ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, নিয়মকানুন নির্ধারণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা ও জ্ঞান সৃষ্টি করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা: পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

১. স্কুল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক মূল্যায়ন পদ্ধতি অব্যাহত থাকবে। সকল শ্রেণীতে কার্যকরভাবে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হবে। খেলাধুলা ও শরীরচর্চার দক্ষতা ধারাবাহিক মূল্যায়নে স্থান পাবে।

২. পঞ্চম শ্রেণী শেষে উপজেলা/পৌরসভা/থানা (বড় বড় শহর) পর্যায়ে সকলের জন্য অভিন্ন প্রশ্নপত্রে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

গ. শিক্ষার্থীকল্যাণ ও নির্দেশনা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

শিক্ষার্থীকল্যাণ ব্যবস্থা ও নির্দেশনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে নিম্নরূপ:

১. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিবেশ উন্নয়নে এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নত পরিবেশ সৃষ্টির/অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা।

২. নারীপুরুষ, জাতিস্বত্তা, আর্থ-সামাজিক অবস্থান, শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা নির্বিশেষে সবাই পূর্ণ মানবাধিকারসম্পন্ন মানুষ– এই বোধ শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে উজ্জীবিত করা।

৩. শিক্ষার সকল পর্যায়ের পাঠক্রমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা করা। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আরও ব্যাপক উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা/জোরদার করা।

৪. প্রয়োজন-নির্ধারণ করে শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষার্থীদেরকে সহায়তা প্রদান করা।

৫. শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ব্যয় ভার লাঘব করে শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নে উৎসাহিত করা এবং প্রয়োজনীয় ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা ও পাঠ্য অতিরিক্ত কার্যক্রমের সুযোগ সৃষ্টি করা।

কৌশল

১. পাঠ অতিরিক্ত কার্যক্রম (যথা খেলাধুলা, বিতর্ক, বই পড়া, রচনা প্রতিযোগিতা, ম্যাগাজিন প্রকাশনা ইত্যাদি)-এ শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত ও সহায়তা করা হবে।

২. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল ধারার শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ করা হচ্ছে। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা হবে।

৩. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি দানের ব্যবস্থা সম্প্রসারিত এবং উচ্চশিক্ষার জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করার জন্য ঋণ প্রদানকারী সংস্থা/ব্যাংকসমূহকে উৎসাহিত করা হবে।

৪. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের জন্য পুষ্টিকর দুপুরের খাবার এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে; এবং প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সুযোগসহ সমৃদ্ধ চিকিৎসা কেন্দ্র থাকবে।

৫. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করার জন্য শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও স্থানীয় সমাজের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কর্মদল গঠন করা হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হবে।

৬. প্রতিটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক ব্যায়ামাগার তৈরির পদক্ষেপ নেয়া হবে। কোন স্তরে কী আকারের/পর্যায়ের ব্যায়ামাগার হবে, তা একটি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে।

ঘ. শিক্ষার্থী ভর্তি

কৌশল

১. নীতিগতভাবে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য নির্বাচনী পরীক্ষা থাকবে না। তবে যে-সকল বিদ্যালয়ে আসনসংখ্যা অপেক্ষা ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হবে, সে-সকল বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রাথমিক

ও মাধ্যমিক স্তরের পরবর্তী যে-সকল শ্রেণীতে ভর্তির জন্য নির্বাচনী পরীক্ষার প্রয়োজন হয়, সে ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার স্বার্থে কোড পদ্ধতি অবলম্বন করে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা করা হবে।

২. শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্লাসের শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত বিবেচনায় আনা হবে। এই বিবেচনায় নির্ধারিত সংখ্যার অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে না।

ঙ. শিক্ষকদের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব

১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে ছুটির সময় ব্যতীত শিক্ষাসংক্রান্ত কাজের বাইরে অন্যান্য কাজে সম্পৃক্ত করা হবে না।

২. শিক্ষার্থীদের মনে সুকুমার বৃত্তির অনুশীলনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি, তাদের মধ্যে শ্রমশীলতা, সহনশীলতা, ধৈর্য্য, নিজ ও অন্যের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা এবং অধ্যবসায়ের অভ্যাস গঠন এবং কুসংস্কারমুক্ত, দেশপ্রেমিক ও কর্মকুশল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা শিক্ষকদের প্রধান কর্তব্য। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত বিনির্মাণের ব্রত নিয়ে শিক্ষকবৃন্দ মনোযোগ সহকারে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করবেন। শিক্ষাসম্পর্কিত অন্যান্য কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করা তাঁদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ জন্য শিক্ষকবৃন্দের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অবস্থান করা বাঞ্ছনীয়।

পরিচ্ছেদ ৪.৭: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি ২০০৬ (সংক্ষেপিত)

১. সংজ্ঞাসমূহ– পরিচ্ছেদ ২.১ এ প্রদত্ত শিক্ষা বিষয়ক ধারণায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাবিষয়ে একটি সাধারণ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতিতে এ বিষয়টি কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, তা তুলে ধরা হলো:

ক. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা হচ্ছে, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে পরিচালিত উদ্দেশ্যমূলক এবং পদ্ধতিগতভাবে বিন্যস্ত একটি শিখন-প্রক্রিয়া। এটি বিভিন্ন রকমের, বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন পরিবেশের শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য সময়, স্থান ও সাংগঠনিকভাবে শিথিল প্রক্রিয়ায় বিন্যস্ত এবং মৌলিক শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবনব্যাপী শিক্ষা পর্যন্ত এর পরিধি বিস্তৃত। এ শিখন-প্রক্রিয়া উপার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের সুযোগ সৃষ্টি করে। এটি শিক্ষায় প্রবেশাধিকার এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের সুযোগের ক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিত করে। মৌলিক শিক্ষা, দক্ষতা প্রশিক্ষণ, অব্যাহত শিক্ষা প্রভৃতি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিভিন্ন ধাপের মধ্যে ধারাবহিকতা থাকতে পারে; অথবা এটি বিচ্ছিন্নভবেও পরিচালিত হতে পারে।

খ. সাক্ষরতা: সাক্ষরতা হচ্ছে পড়া, অনুধাবন করা, মৌখিকভাবে ও লেখার মাধ্যমে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা, যোগাযোগ স্থাপন করা এবং হিসাব-নিকাশ করার দক্ষতা। এটি একটি ধারাবাহিক শিখন-প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নিজস্ব বলয় এবং বৃহত্তর সমাজের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য ক্ষমতা ও জ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করতে পারে।

গ. অব্যাহত শিক্ষা: অব্যাহত শিক্ষা হচ্ছে, সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তি এবং জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মৌলিক শিক্ষার (সাক্ষরতা ও প্রাথমিক শিক্ষা) বাইরে জীবনব্যাপী শিখন-প্রক্রিয়ার একটি সুযোগ।

২. লক্ষ্য– সবার জন্য শিক্ষাবিষয়ক জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা-২ (২০০৪-২০১৫) এবং দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে নিরক্ষরতার হার ৫০% ভাগে হ্রাসকরণের লক্ষ্যে কমিউনিটি শিখন কেন্দ্রের একটি নেটওয়ার্ক স্থাপন করে কার্যকর দক্ষতা-প্রশিক্ষণ, অব্যাহত শিক্ষা ও জীবনব্যাপী শিখন-প্রক্রিয়ার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ‘সবার জন্য শিক্ষা’র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং দারিদ্র্য বিমোচন।

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমূহ:

শিশু, কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক-

১. সম্ভাব্য সুবিধাভোগীর চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ ও মানসম্মত উপনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং দক্ষতা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

২. শিক্ষা এবং দক্ষতা-প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীকে আয়সৃজনী ও জীবনমুখী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে স্বনির্ভর, উৎপাদনশীল এবং ক্ষমতাবান নাগরিকে পরিণতকরণ;

৩. সরকার, বেসরকারি সংস্থা ও সুশীল সমাজের সমন্বয়ে পরিচালনা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত কর্মপন্থা নির্ধারণের মাধ্যমে নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন;

৪. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন; এবং

৫. শিক্ষার্থী, স্থানীয় সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, কমিউনিটিভিত্তিক সংস্থা এবং স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে একটি বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে মালিকানাবোধ সৃষ্টি, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি ও কাঠামোর স্থায়িত্ব নিশ্চিত এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা।

৩. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিধি–উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিধি নিম্নরূপ:

ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা;

খ. যে সকল শিশু বিভিন্ন কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হয়েছে, তাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে বিকল্প ধারার মৌলিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি;

গ. কিশোর-কিশোরী, ১৬-২৪ বছর এবং পঁচিশোর্ধ বয়সী যারা কখনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি অথবা ঝরে পড়েছে, উপানুষ্ঠানিক মৌলিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে তাদের জন্য শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ সৃষ্টি;

ঘ. সকল ধরনের অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিখনের সুযোগ সৃষ্টি; এবং

ঙ. উপানুষ্ঠানিক ধারায় বৃত্তিমূলক, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।

৪. গুণগতমান নিশ্চিতকরণ– উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে গুণগতমান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পেশাগত দক্ষতা ও কার্যকর বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এগুলো হলো:

- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের সম্ভাব্য সুবিধাভোগীদের জ্ঞানের পরিধি, দক্ষতা ও শিখন-চাহিদা নিরূপণ;
- যথাযথ পরিবীক্ষণ ও শিক্ষার্থীদের অর্জিত দক্ষতা নিরূপণ;

শিক্ষার স্তর	শ্রেণী	সময় বিন্যাস				
		সাপ্তাহিক মোট কার্য ঘণ্টা	পাঠদান	শিক্ষার্থী পরিচালনা ও সংশোধন	অনুশীলনী তৈরি	অন্যান্য কাজ
প্রাক প্রাথমিক	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণী	২৪	১২	৬	৩	৩
প্রাথমিক	প্রথম থেকে পঞ্চম	৩৬	১৮	৬	৮	৪
	ষষ্ঠ থেকে অষ্টম	৪০	২৪	৬	৬	৪
মাধ্যমিক	নবম থেকে দ্বাদশ	৪০	২৪	৬	৬	৪

- শিক্ষার্থীদের জন্য প্রমিত মূল্যায়নের উপায় ও পদ্ধতি প্রণয়ন;
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কোর্স সমাপ্তকারীদের মূলধারায় আনার ব্যবস্থাকরণ;
- বিভিন্ন কোর্সের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণসহ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জাতীয় কারিকুলাম ও শিখন মডিউল প্রণয়ন;
- যে সকল ক্ষেত্রে সম্ভব, সে সকল ক্ষেত্রে উপানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে সমমান প্রতিষ্ঠাকরণ;
- শিক্ষক ও সুপারভাইজারদের জন্য পর্যাপ্ত ও যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

- কর্মসূচির কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য তৃতীয় একটি সংস্থা নিয়োজিতকরণ;
- কর্মসূচির লক্ষ্য সহজে বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদের সংস্থান, অভ্যন্তরীণ সম্পদ চিহ্নিতকরণ এবং গুণগতমানের সূচক নির্ধারণ ও মূল্যায়ন; এবং
- কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও দীর্ঘমেয়াদী দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি নির্ধারণ।

৫. স্থায়িত্ব এবং স্থানীয় জনসাধারণের মালিকানাবোধ

- চাহিদা, ব্যয়, চাহিত সুযোগ-সুবিধার সম্ভাবনা এবং অর্থায়নের উপর ভিত্তি করে কর্মসূচির বাস্তবভিত্তিক অঙ্গসমূহ নির্ধারণ;
- যে সকল কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে, সেগুলো ইতোপূর্বে যাচাইকৃত শিখনচাহিদা পূরণে সক্ষম কি-না তা মূল্যায়ন করা;
- প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস, কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা এবং এতে কমিউনিটি এবং অন্যান্য অংশীজনের মালিকানাবোধ প্রতিষ্ঠা;
- শিখন কেন্দ্রসমূহের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনসাধারণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন;
- কর্মসূচির কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতার অব্যাহত মূল্যায়ন;
- শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে গুণগত মান নিরুপণের প্রক্রিয়া চালুকরণ, পরিবর্তনশীল চাহিদা নিরুপণ এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতাকে কাজে লাগানোর জন্য তথ্যপ্রবাহ, উপদেশমূলক সহায়তা, সংযোগ স্থাপন, প্রাপ্যতা, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের সহায়তা গ্রহণ।

৬. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জাতীয় পর্যায়ের কাঠামো নিম্নরুপ–উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা কাঠামোর মূল দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ:

১) জাতীয় পর্যায়–উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জাতীয় পর্যায়ের কাঠামো নিম্নরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে:

ক. **একটি সমন্বিত সাব-সেক্টর অ্যাপ্রোচ:** সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, বৃহত্তর সুশীল সমাজ ও উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় একটি সমন্বিত নন ফরমাল এডুকেশন সাব-সেক্টর অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং এর গতি সঞ্চার করবে। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মকাণ্ডের সার্বিক সমন্বয়ের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করবে।

খ. **নীতি নির্ধারণ, সমন্বয় এবং সহায়তা প্রদান:** উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির উন্নয়ন ও পর্যলোচনা, প্রোগ্রাম অ্যাপ্রোচের সাহায্যে সরকারি ও বেসরকারি সকল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের পর্যালোচনা এবং এগুলোর মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করবে।

গ. **অর্থ সঞ্চালন:** দেশের উপনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মকাণ্ডের জন্য সরকার, আন্তর্জাতিক ও দ্বি-পাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, স্থানীয় জনগণ এবং অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ গ্রহণ ও সঞ্চালন করবে।

ঘ. **কারিগরি সহায়তা:** প্রশিক্ষণ, শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উপদেষ্টা-সহায়তা এবং স্থানীয়ভাবে কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।

ঙ. **ডাটাবেজ স্থাপন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম:** সমগ্র উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরের মধ্যে ডাটাবেজ পরিচালনা ও এমআইএস চালু করবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় মানে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করার জন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা এবং সংগঠনের সরাসরি সহায়তাপুষ্ট কর্মসূচিসমূহ মূল্যায়ন করবে।

চ. **উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন:** সংগঠনটি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনটি কেবল সুনির্দিষ্ট সরকারি ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে না; বরং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরের সমস্ত কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করবে।

ছ. **সাধারণ প্রশাসন:** জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রশাসন (দৈনন্দিন কার্যক্রম, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সংগ্রহ-ব্যবস্থাপনা, বৃদ্ধি, কর্মচারী ব্যবস্থাপনা) পরিচালনা করবে।

২) মাঠ পর্যায়-প্রারম্ভিক পর্যায়ে স্থানীয় পর্যায়ের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা কাঠামো জেলা পর্যায়ে স্থাপন করা হবে। জেলা পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কাঠামো জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। জাতীয় পর্যায়ের সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জেলা পর্যায়ে দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা হবে। উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ হবে নিম্নরূপ:

ক. জেলা পর্যায়ে প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ এবং সকল অংশগ্রহণকারীর সহযোগিতায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসুচি পরিচালনা;

খ. বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত সম্পদের সঞ্চালন ও ব্যবহার;

গ. জেলা পর্যায়ে ডাটাবেজ স্থাপন এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

ঘ. জেলা পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের সমন্বয় এবং গতি সঞ্চার করা, এবং

ঙ. জেলা পর্যায়ের কাঠামোর অভ্যন্তরীণ প্রশাসন।

৭. **প্রস্তাবিত কাঠামোর মূল গঠন–** প্রস্তাবিত কাঠামোর মূল গঠন নিম্নরূপ:

১) জাতীয় পর্যায়ে কাঠামো-জাতীয় পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো স্থাপন করা হয়েছে। এর বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

ক. দেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মকাণ্ড তদারকি এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো। ব্যুরো সরকারের পক্ষ হতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে।

খ. একজন মহাপরিচালক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর নেতৃত্ব প্রদান করবেন। এ ছাড়াও সরকার কর্তৃক নিযুক্ত আরও ৩৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী ব্যুরোতে দায়িত্ব পালন করবেন।

গ. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এবং এর কার্যক্রম পরিচালনার ব্যয় সরকার তার বাৎসরিক নিজস্ব বাজেট বরাদ্দ হতে নির্বাহ করবে।

২) জেলা পর্যায়ের কাঠামো –জেলা পর্যায়ের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা ও তদারকির জন্য ৬৪টি জেলায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কাঠামো স্থাপন করা হয়েছে। ৬৪টি জেলার প্রতিটিতে ৩ জন করে কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন।

৮. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়ন কৌশল– সার্বিক ও কার্যকর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিম্নরূপ বাস্তবায়ন কৌশল অনুসরণ করবে:

ক. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ;

খ. স্থানীয় শিক্ষকদের উদ্বুদ্ধকরণ;

গ. শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন-পদ্ধতি কার্যকরকরণ;

ঘ. নমনীয় শিখন-পদ্ধতি- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন একটি নমনীয় শিখন-পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে, যাতে সীমিত সম্পদের মধ্যে শিখনপ্রক্রিয়া, বিষয়, ধারা, সময় এবং স্থান নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে এবং তাদের পছন্দকে গুরুত্ব দেয়া হবে;

ঙ. পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিষয়সমূহ–উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচিসমূহ সমতা, লিঙ্গ-সংবেদনশীলতা, দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ-সংবেদনশীলতা, সুশাসন, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ এবং ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষার একীভূতকরণের মতো পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিষয়সমূহ চিহ্নিত, সহায়তা ও উন্নয়ন করবে, যা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া, শিক্ষক/সহায়কদের প্রশিক্ষণের বিষয় ও প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত হবে;

চ. দক্ষতা-প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি বিভাগসমূহ, বেসরকারি সংস্থা এবং কমিউনিটিভিত্তিক সংস্থাসমূহকে ব্যবহার করা হবে;

ছ. বেসরকারি খাত এবং বেসরকারি সংস্থা যারা দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান, শিক্ষানবিশী ও কর্মসংস্থান করে থাকে, ক্ষেত্রবিশেষে তাদের সম্পর্কে তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করা হবে।

পরিচ্ছেদ ৪.৮: তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি৩) মূলকথা

পিইডিপি-২ এর অভিজ্ঞতা ও শিখনের উপর ভিত্তি করে সরকার ৫ বছর মেয়াদী পিইডিপি৩ প্রণয়ন করেছে। গত ১৩ বছরে প্রাথমিক শিক্ষায় বৃহৎ বিনিয়োগকৃত দেশি ও বিদেশি দাতাগোষ্ঠীর সহায়তায় পরিচালিত কর্মসূচির মধ্যে এটি তৃতীয়। এ কর্মসূচিতে প্রাথমিক শিক্ষা খাত সামগ্রিকভাবে আওতাভুক্ত। পিইডিপি-১ (১৯৯৭-২০০৩) এর মূল ফোকাস ছিল, ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষাচক্র সমাপ্তি, গুণগত ইনপুটস ও মনিটরিং। পিইডিপি-২ (২০০৪-২০১১) এর ফোকাস ছিল, মান উন্নতকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, ব্যবস্থাগত (Systemic) সংস্কার সাধন। আর পিইডিপি৩ এর মূল ফোকাস হচ্ছে, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষায় নিবেদিত সব উদ্যোগকে একটি খাতভিত্তিক অ্যাপ্রোচের আওতাভুক্ত করা এবং পিইডিপি২ এর মূল উপাদানসমূহকে অব্যাহত রাখা। তবে এ কর্মসুচিতে বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা সমাপনীতে এবং শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে ইনপুট প্রদানে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কর্মরত কর্মী-কুশলীদের জন্য পিইডিপি৩ এর কর্মসূচিগত কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নিচে উল্লেখ করা হলো:

মৌল নীতিগত ভিত্তি: বাংলাদেশের সংবিধানে প্রদত্ত ১৭নং অনুচ্ছেদের মর্মবাণীকে (পড়ুন সংযোজনী–১ঃ বাংলাদেশের সংবিধানের প্রাসঙ্গিক অংশসমূহ) বাস্তবে রূপ দিতে এবং সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্ব দিয়ে এ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ ছাড়াও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ নির্দেশিত ৪টি নীতি নির্দেশনা এতে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে:

১. সরকারি, এনজিও ও প্রাইভেট উদ্যোগে পরিচালিত প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচিসমূহকে একটি ফ্রেমওয়ার্কের আওতাভুক্ত ও সমন্বিত করা;

২. ক্লাস সাইজ কমিয়ে অর্থাৎ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অনুপাত হ্রাস করে, শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া উন্নত করে এবং ICT সাক্ষরতাকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করা;

৩. প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ করা;

৪. এনজিও ও প্রাইভেট সেক্টরের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কাজ করা।

অবশ্য, জাতীয় শিক্ষা নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা পিইডিপি৩ তে বাস্তবায়নের জন্য কোনো কার্যক্রম নেয়া হয়নি, তা হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা।

পিইডিপি৩ এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূল উপাদানসমূহ

সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষা খাতই পিইডিপি৩ এর আওতাভুক্ত; এবং ক্রমান্বয়ে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়েই ৫-৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য এক বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এ জন্য পাঠ্যবই ও শিক্ষক গাইড ইতোমধ্যেই MoPME-এর তত্ত্বাবধানে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে। কর্মসূচি-৩ এর সামাজিক লক্ষ্য হচ্ছে, 'সকল শিশুর জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা'। এ লক্ষ্য অর্জনে কয়েকটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা হবে। বাংলাদেশের সকল শিশু যাতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক, কার্যকর ও শিশুবান্ধব শিখন অর্জন করতে পারে সেজন্য একটি কার্যকর, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

এর অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে, বিদ্যালয় গমনোপযোগী শতভাগ শিশুকে শ্রেণীকক্ষে মানসম্মত শিক্ষা দান, অনগ্রসর ও সুযোগবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষার সুযোগ প্রদানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ, বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত কমানোর জন্য বিদ্যালয়সমূহের শ্রেণীকক্ষ বাড়ানো, শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ, ইত্যাদি নিশ্চিত করা হবে। পিইডিপি৩ এর মেয়াদ ধরা হয়েছে ২০১১ এর জুলাই থেকে ২০১৬ সালের জুন পর্যন্ত। শিক্ষা খাতে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় এ কর্মসূচি প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করবে। নতুন এ কর্মসূচিতে শ্রেণীকক্ষের শিক্ষার (পাঠদান) মান উন্নয়নে জোর দেয়া হবে।

এ কর্মসূচির আনুমানিক বাজেট হচ্ছে ৮.৬ বিলিয়ন ইউএস ডলার। এতে উন্নয়ন অংশীদার তথা দাতা সংস্থাসমূহের অবদান হবে (প্রত্যাশিত) ১.৪ বিলিয়ন ডলার।

ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা–ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা হবে পিইডিপি৩ এর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসৃত হবে। এতে ৬টি ফলাফল (আউটকাম) বিবেচনায় নিয়ে তা নিয়মিত মনিটরিং করা হবে। ফলাফলগুলো নিম্নরূপ:

১. উন্নত শিখন ফল;
২. সর্বজনীন সহজগম্যতা ও অংশগ্রহণ;
৩. বৈষম্য হ্রাসকরণ;
৪. বিকেন্দ্রিকরণ;
৫. ফলপ্রসূতা বাড়ানো;
৬. কর্মসূচি পরিকল্পনা ও মনিটরিং

ক) ফলাফল/আউটকামসমূহ এবং তা অর্জনে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

নিচে প্রত্যাশিত ফলাফল/আউটকাম এবং তা অর্জনে পিইডিপি৩ তে কী কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা উল্লেখ করা হলো:

১. উন্নত শিখনফল অর্জন–প্রতিটি শিক্ষার্থীই ক্লাসে বিষয়ভিত্তিক প্রত্যাশিত শিখনফল অর্জন করবে। সংস্কার/পদক্ষেপ–মানসম্পন্ন শিখন-শেখানো পন্থা; শিক্ষকেরা প্রতিটি শিশুর শিখন অর্জনে দায়বদ্ধ; পরিমার্জিত কারিকুলাম ও পাঠ্যবই; শ্রেণীকক্ষভিত্তিক ও বিদ্যালয়ভিত্তিক অগ্রগতি নিরূপণ; শিক্ষকদের পূর্ব-প্রশিক্ষণ হবে ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশন।

২. সর্বজনীন সহজগম্যতা ও অংশগ্রহণ–সব ধরনের বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষায় সকল শিশুর অংশগ্রহণ।

   সংস্কার/পদক্ষেপ–সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একবছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা; আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে সমতাবিধান; অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা'র ধারণা সম্প্রসারিত করা এবং তাকে মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ।

৩. বৈষম্য হ্রাসকরণ–শিক্ষায় অংশগ্রহণ, শিক্ষা-চক্র সমাপ্তি ও শিখনফল অর্জনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও অন্যান্য ধরনের বৈষম্য হ্রাস।

   সংস্কার/পদক্ষেপ–চাহিদাভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা বাড়ানো এবং প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর চাপ কমানো; বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য ও ফিডিং কর্মসূচি সম্প্রসারণ।

৪. বিকেন্দ্রিভুত পরিকল্পনা-উপজেলা ও স্কুলপর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন।

   সংস্কার কর্মসূচি/পদক্ষেপ-বিদ্যালয় পর্যায়ে নেতৃত্ব বিকাশ; বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রিকরণ; বিদ্যালয়ে গ্রান্ট/মঞ্জুরি মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ।

৫. কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি-বাজেট বরাদ্দ প্রক্রিয়া কার্যকর ও ফলপ্রসূকরণ।

   সংস্কার কর্মসূচি/পদক্ষেপ-প্রাথমিক শিক্ষায় বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে পিইডিপি৩ এর ফ্রেমওয়ার্কের সাথে সংগতি রক্ষা; প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে পুনর্গঠন; প্রান্তিক যোগ্যতাভিত্তিক পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা।

৬. কর্মসূচি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা-খাতভিত্তিক পরিকল্পনার উন্নয়ন সাধন এবং ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা; ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ; পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ ব্যবস্থাকে আনুষ্ঠানিকীকরণ।

খ) কম্পোনেন্ট ও সাব-কম্পোনেন্ট

নিচে কর্মসূচি-৩ এর ৪টি কম্পোনেন্ট ও সাব-কম্পোনেন্টসমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলোঃ

কম্পোনেন্ট-১: শিখন-শেখানো কার্যক্রম

শিখনফল উন্নীতকরণ ও শিক্ষাচক্র সমাপ্তিকরণ পিইডিপি৩ এর দুটি উদ্দেশ্য। এ জন্য শিখন পাঠমালা ও শিখন-পদ্ধতি উন্নত করা হবে।

সাব-কম্পোনেন্টস:

- শিখবে প্রতিটি শিশু–প্রতিটি শিশুই যাতে যথার্থ শিখন অর্জন করতে পারে, তার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকবে এবং এজন্য শিক্ষক দায়বদ্ধ থাকবেন।
- বিদ্যালয় ও ক্লাসরুমভিত্তিক অগ্রগতি নিরূপণ–ক্লাসরুমভিত্তিক ও বিদ্যালয়ভিত্তিক অগ্রগতি নিরূপণ নিশ্চিত করা হবে।
- কারিকুলাম ও পাঠ্যবই উন্নীতকরণ–ডিপিই'র সহযোগিতায় এনসিটিবি প্রাথমিক শিক্ষার কারিকুলাম পুনঃমার্জিত করবে।
- পাঠ্যবই প্রণয়ন ও বিতরণ–প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। এ ছাড়াও প্রতিটি বিদ্যালয় শিখন-শেখানো কার্যক্রমের গুণগতমান বাড়ানোর জন্য ৫৮টি শিক্ষক গাইড ও ২১টি অতিরিক্ত পাঠোপকরণ পাবে। প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সম্পূরক পাঠোপকরণ দেয়া হবে। উল্লেখ্য, যেসব উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে জাতীয় কারিকুলাম অনুসরণ করা হবে, তাতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরাও এসব পাঠ্যবই পাবে।
- শিক্ষায় আইসিটি– ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে শ্রেণীকক্ষগুলোতে পর্যায়ক্রমে মাল্টিমিডিয়া দেয়ার জন্য বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা করা হবে।
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও তার উন্নয়ন–ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশন, চাহিদাভিত্তিক কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ও শিক্ষক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হবে।

কম্পোনেন্ট-২: অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও বৈষম্য হ্রাসকরণ

অংশগ্রহণ বৃদ্ধি–দরিদ্র, আদিবাসী, প্রতিবন্ধীসহ ঝরে পড়া ও দুর্যোগ-আক্রান্ত সকল শিশুর শিক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য পিইডিপি৩ তে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এজন্য নিম্নোক্ত সাব-কম্পোনেন্টগুলো বাস্তবায়ন হবে:

সাব-কম্পোনেন্টস:

- দ্বিতীয় সুযোগ ও বিকল্প শিক্ষাধারা–যারা কখনো বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি এবং যারা ঝরে পড়েছে তাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ অব্যাহত থাকবে। পঞ্চম শ্রেণীতে সমাপনী পরীক্ষায় তাদের অংশগ্রহণ এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির ব্যাপারে জোর দেয়া হবে।
- প্রাক-প্রাথমিক–সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে পর্যায়ক্রমে ৫ থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য এক বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হবে।
- একীভূত বা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ–সকল শিশুর আছে শিক্ষায় অধিকার–এই অধিকারভিত্তিক ধারণাকে বাস্তবায়িত করতে সকল শিশুর (আদিবাসী, প্রতিবন্ধীসহ) প্রাসঙ্গিক চাহিদা পূরণে গুরুত্ব দেয়া হবে।
- দুর্যোগ-পরিস্থিতিতে শিক্ষা–যেকোনো দুর্যোগ-পরিস্থিতিতে যাতে শিশুরা শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে, সেজন্য উপজেলাভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনার (UPEP) আওতায় দুর্যোগপ্রবণ উপজেলাতে 'থোক বরাদ্দ' দেয়া হবে।
- যোগাযোগ ও সামাজিক সম্পৃক্তকরণ–কম্যুনিটি বা সমাজবাসীর দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ উন্নত করতে একটি ফ্রেমওয়ার্ক ও কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।

বৈষম্য হ্রাসকরণ

পল্লী ও শহরে দরিদ্র ও বঞ্চিত পরিবারের শিশুরা যাতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে এবং যথার্থ শিখনফল লাভ করতে পারে সেজন্য নিম্নোক্ত কর্মসূচি নেয়া হবে। এক্ষেত্রে জেন্ডার ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাকেও সমান গুরুত্ব দেয়া হবে।

১. উপবৃত্তি কর্মসূচি-অব্যাহত থাকবে।

২. স্কুল হেল্‌থ ও স্কুল ফিডিং-অব্যাহত থাকবে এবং এর মান বাড়ানো হবে।

বৈষম্য দূরীকরণে/হ্রাসকরণে গৃহীত কার্যক্রম

চরম দরিদ্র ও নগর বস্তিবাসী শিশুদের বৈষম্য দূর বা হ্রাস করা পিইডিপি৩ এর তথা সরকার এর অন্যতম প্রধান বিষয়। এ জন্য নিম্নোক্ত উদ্যোগসমূহ নেয়া হচ্ছে বা হবে:

১) বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ;

২) MoPME-এর সহায়তাপুষ্ট ৪ ধরনের স্কুলে টিউশন ফি না নেয়া;

৩) উপবৃত্তি কর্মসূচি;

৪) স্কুল ফিডিং কর্মসূচি;

৫) দ্বিতীয় সুযোগ ও বিকল্প শিক্ষা (উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে);

৬) একীভুত বা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা–সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা (যেমন: দরিদ্র, প্রতিবন্ধী ও আদিবাসী শিশু) এ থেকে উপকৃত হবে;

৭) শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত–২০০৫ এ এই অনুপাত ছিল ৫৪:১, যা ২০০৯-এর মধ্যে ৪৮:১ এ নামিয়ে আনার টার্গেট নেয়া হয়; তবে এখনও তা অর্জিত হয়নি। নতুন শিক্ষানীতিতে ২০১৮ এর মধ্যে এ অনুপাত টার্গেট করা হয়েছে ১:৩০।

কম্পোনেন্ট-৩: বিকেন্দ্রিকরণ ও কর্মক্ষমতা

বিকেন্দ্রিকরণ: জেলা, উপজেলা ও স্কুলপর্যায়ে বিকেন্দ্রিভূত ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ/কর্মসূচিসমূহ গৃহীত হবে:

১) মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহ শক্তিশালীকরণ–পিইডিপি২ এর ধারাবাহিকতায় এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। পিটিআই, উপজেলা শিক্ষা অফিস ও ইউআরসিতে শূন্যপদ পূরণ করা হবে।

২) বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও গভার্নেন্স বিকেন্দ্রিকরণ–বিদ্যালয়ের মান বৃদ্ধিতে পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং-এর ক্ষেত্রে এসএমসি'র কার্যাবলী ও দায়-দায়িত্ব যুগোপযোগী করা হবে।

৩) স্কুলপর্যায়ে নেতৃত্ব বিকাশ– ক্লাসে প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জন ও তার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রধান শিক্ষকের অ্যাকাডেমিক সুপারভিশন নিশ্চিত করার জন্য তাঁকে আরও দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব দেয়া হবে।

৪) সাংগঠনিক পর্যালোচনা ও তা শক্তিশালীকরণ–কেন্দ্রীয় ও মাঠপর্যায়ে নতুন পদ সৃষ্টি ও শূন্য পদ পূরণের মাধ্যমে সংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করা হবে।

কার্যকারিতা (Effectiveness):

বিদ্যালয় ব্যবস্থার কার্যকারিতা বিচারে চূড়ান্তভাবে শিখনফলই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এ লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সাব-কম্পোনেন্টস গৃহীত হবে:

১. পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা–এর মান আরও বৃদ্ধি করা হবে।

২. শিক্ষক নিয়োগ ও নিয়োজন–এ ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ভিত্তিক চাহিদা মোতাবেক শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে।

৩. বার্ষিক বিদ্যালয় জরিপ–বার্ষিক বিদ্যালয় জরিপ (Annual School Census-ASC) এর মাধ্যমে ইনপুটস, প্রসেজ, আউটপুট ও আউটকাম নির্ধারণের জন্য আরও শক্তিশালী করা হবে।

৪. শিক্ষার্থীর বার্ষিক অগ্রগতি নিরূপণ –আরও কার্যকর ও শক্তিশালী করা হবে।

কম্পোনেন্ট-৪: পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা

পিইডিপি৩ তে ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (RBM) মডেল অনুসৃত হবে এবং এতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ/কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত হবে:

১. পিইডিপি৩ এর ব্যবস্থাপনা ও সুশাসন–একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি দ্বারা কর্মসূচি-৩ এর ব্যবস্থাপনা ও সুশাসন নিশ্চিত করা হবে। সার্বিক সমন্বয় সাধানের জন্য MoPME তে একটি নতুন ইউনিট এবং ডিপিইতে একটি নতুন ডিভিশন সৃষ্টি ও কার্যকর করা হবে।

২. অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা –একটি যৌথ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এটি পরিচালিত হবে।

৩. সেক্টর অর্থায়ন– অর্থ মন্ত্রণালয় প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা খাতের জন্য পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক বরাদ্দ নিশ্চিত করবে।

৪. মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণ ইনপুট, প্রসেজ, আউটপুট মনিটরিং-এর জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ডিভিশন ও এজেন্সির মনিটরিং সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

৫. মানবসম্পদ উন্নয়ন–পূর্ব-নির্ধারিত প্রশিক্ষণের পরিবর্তে চাহিদা মোতাবেক মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে।

৬. পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ–এনজিও ও বেসরকারি খাতকে অন্তর্ভুক্ত করে এ কর্মসূচি সফল করা হবে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ও জেন্ডার অ্যাকশন প্লান

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা–প্রত্যেকের শিক্ষা অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পিইডিপি৩ তে শিক্ষায় অংশগ্রহণের বাধা দূরীকরণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সংস্কৃতি গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শুধুমাত্র বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ও নিছক যাতায়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রত্যেকে যাতে প্রাসঙ্গিক ও মানসম্পন্ন শিক্ষা অর্জন করতে পারে তার জন্য পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে। কর্মসূচি-৩ এ বিদ্যালয় ও ক্লাসের কাঙ্খিত মান ও ফল পাবার জন্য চাহিদা মোতাবেক সহায়তা দেয়া হবে। এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ও জেন্ডার ইস্যু বিদ্যালয়, উপজেলা, জেলা ও জাতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

জেন্ডার–ভর্তি ও টিকে থাকার ক্ষেত্রে জেন্ডারসাম্য অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রশংসনীয়; তা স্বত্ত্বেও, এখনও কাজের তাগিদে ছেলেদের এবং নিরাপত্তা অভাব, হয়রানি, যাতায়াত সমস্যা ও আত্মবিশ্বাসের অভাবে মেয়েদের শিখনফল ও শিক্ষাচক্র সমাপনীতে চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান।

দুটি কর্ম-পরিকল্পনা–উপযুক্ত বিষয় বিবেচনায় ২টি কর্ম-পরিকল্পনা গৃহীত হবে–

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা–এক্ষেত্রে ৪টি ক্ষেত্রে নজর দেয়া হবে:

১) অন্তর্ভুক্তিমূলক মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান/অর্জন; ২) অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ গড়ে তোলা; ৩) অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টান্ত/অনুশীলন সৃষ্টি করা; ৪) অন্তর্ভুক্তিমূলক সংস্কৃতি গড়ে তোলা।

জেন্ডার পরিকল্পনা–এ পরিকল্পনায় পিইডিপি৩ এর প্রতিটি সাব-কম্পোনেন্ট এর কার্যক্রমগুলো হাইলাইট করা হয়েছে; যা এমডিজি'র লক্ষ্যে পৌছাতে রাষ্ট্রকে সহায়তা করবে।

অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য

- এ কর্মসূচির মূল কার্যক্রমের মধ্যে থাকবে ৪৭ হাজার ৬৭২ জন সহকারি শিক্ষক নিয়োগ (এর মধ্যে প্রাক-প্রাথমিকের জন্য প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন);
- চাহিদাভিত্তিক ৩১ হাজার ৬৮৫টি অতিরিক্ত শ্রেণী কক্ষ তৈরি, দুই হাজার ৭০৯টি বিদ্যালয় স্থাপন;
- এক লাখ ২৮ হাজার ৯৫৫টি টয়লেট নির্মাণ;
- ৩৯ হাজার ৩০০টি নলকূপ স্থাপন;
- মাঠ পর্যায়ের ৬৬৮টি কার্যালয় মেরামত;
- অধিদপ্তরের নতুন ভবন, ৭টি বিভাগীয় কার্যালয়ে বিশ্রামাগার (রেস্ট হাউস) স্থাপন;
- ৬০টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় সম্প্রসারণ;
- সব বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ কম্পিউটার দেয়া এবং প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নকাজ। (সূত্র: প্রথম আলো, ৩ আগষ্ট ২০১১)

এ ছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় ঝরে পড়া ও বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশুদের জন্য 'উপানুষ্ঠনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প (রস্ক)' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে (পড়ুন সংযোজনী–৯ঃ অভিজ্ঞতার আলোকে সাজানো–রস্ক)

পরিচ্ছেদ-৪.৯: জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১

মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে সংবিধানে স্বীকৃত নারীর মৌলিক অধিকার, আন্তর্জাতিক সনদসমূহ যথা-সিডও, সিআরসি এবং বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনার আলোকে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার নিমিত্তে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১' প্রণয়ন করেছে।

এই নীতিতে ৪১টি লক্ষ্যের মধ্যে একটি অন্যতম লক্ষ্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। এতে যা বলা হয়েছেঃ

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

১. নারীশিক্ষা বৃদ্ধি, নারী-পুরুষের মধ্যে শিক্ষার হার ও সুযোগের বৈষম্য দূর করা এবং উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষানীতি ২০১০ অনুসরণ করা।

২. নারীর নিরক্ষরতা দূর করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, বিশেষতঃ কন্যাশিশু ও নারী সমাজকে কারিগরি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ সকল বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা।

৩. কন্যা শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রদান অব্যাহত রাখা।

৪. মেয়েদের জন্য স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

পরিচ্ছেদ-৪.১০: শিশু নীতি, ২০১০ (চূড়ান্ত খসড়া)

জাতীয় শিশু নীতি, ২০১০ বাংলাদেশের শিশুদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নির্মাণে একটি সুদূরপ্রসারী রূপকল্প। শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষার্থে জাতীয় সকল উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় শিশু নীতি ২০১০ প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে।

শিশু শিক্ষা

১. বর্তমানে প্রচলিত প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে শিশুর প্রারম্ভিক শৈশব বিকাশে কার্যক্রম আরও শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করা হবে।

২. প্রাথমিক শিক্ষা বিনামূল্যে প্রদান করা হবে। অর্থনৈতিক, নৃতাত্ত্বিক ও অন্যান্য কারণে পশ্চাৎপদ ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির শিশুদের জন্য শিক্ষা উপকরণসহ উৎসাহ প্রদানকারী বিশেষ সুবিধাদি প্রদান করা হবে।

৩. সকল শিশুকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার আওতায় আনা এবং ঝরে পড়া রোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪. মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে শিশুরা যেন তাদের চিন্তাশক্তি, কল্পনা শক্তি ও অনুসন্ধিৎসু মননকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার প্রতিটি স্তরে মানসম্পন্ন যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা হবে।

৫. আধুনিক বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। এ ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

৬. শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

৭. মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষার শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৮. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকল ধরনের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা এবং শাস্তির ফলস্বরূপ কোনো শিশু ও বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোর-কিশোরীর যেন শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি না হয় সে লক্ষ্যে শিশুবান্ধব শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রবর্তন করা হবে।

৯. দেশের প্রচলিত বিভিন্ন ধারার শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হবে যাতে সকল ধারার শিক্ষার্থীরা সমভাবে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ লাভ এবং দেশের উন্নয়ন চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়।

১০. শিশুদের শিক্ষার মান ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ লক্ষ্যে শিক্ষকদের উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুবান্ধব উন্নত পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

১১. ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিশুদের জন্য শিশুতোষ বই-পুস্তক, পত্রিকা, সিনেমা ও সুকুমার কলা চর্চার সামগ্রী বিনামূল্যে বা ভর্তুকিমূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া হবে। নানা ধরনের সহজ ও আকর্ষনীয় শিক্ষা উপকরণ, মডেল, ছড়া, গল্প, গান ও খেলার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক বা বিশেষ শিক্ষা যেমন: ক্রীড়া শিক্ষা, স্কাউট, গার্লস গাইড ইত্যাদির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

১৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও কার্যকর সহায়তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিচালনা ব্যবস্থা আরও উন্নত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

শিশুর বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

১. শিশুর জন্য মানসম্পন্ন বিনোদন, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য খেলার মাঠ ও খেলার সরঞ্জামের ব্যবস্থা করো হবে। এলাকাভিত্তিক শিশুপার্ক স্থাপন এবং নগর পরিকল্পনায় আবশ্যিকভাবে শিশুদের জন্য খেলার মাঠ অন্তর্ভুক্ত করা হবে। দুর্যোগকালীন সময় ও তার পরবর্তীতে আশ্রয়কেন্দ্রে শিশুদের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা করা হবে।

২. শিশুরা যেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, দেশাত্মবোধ, মানবিক মূল্যবোধ এবং সমাজ, দেশ ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও আদর্শ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে, এই উদ্দেশ্যে শিশুতোষ চলচ্চিত্র, নাটক, চিত্রকলা ও শিল্পের অন্যান্য শাখায় শিশুদের চর্চা ও অংশগ্রহণের পর্যাপ্ত সুযোগ নিশ্চিত করা হবে।

৩. প্রতিটি বিদ্যালয়ে বিনোদনমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং লাইব্রেরী সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে। প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য তাদের উপযোগী বিনোদনের ব্যবস্থা করা হবে।

প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য বিশেষ কার্যক্রম

১. জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী অধিকার সনদ অনুযায়ী, সকল প্রতিবন্ধী শিশুর স্বীকৃতি ও সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

২. প্রতিবন্ধী শিশুদের সমাজের মূলধারায় একীভূত থাকা এবং শিক্ষাসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩. যে সমস্ত শিশু অনিবার্য কারণে শিক্ষার মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না, শুধুমাত্র সেইসব শিশুর জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা বিবেচনা করা হবে।

৪. প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

অটিস্টিক শিশুর জন্য বিশেষ কার্যক্রম

১. অটিস্টিক শিশুদের অধিকাংশই স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন, তাই তাদের সমাজে সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

২. অটিস্টিক শিশুদের জন্য সুনির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা পদ্ধতি এবং উপকরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

৩. অটিস্টিক শিশুদের জন্য যে প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তা যথেষ্ট ব্যয়বহুল, আর তাই সব শিশু যাতে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে, সেজন্য এটা সকলের জন্য সহজলভ্য করা হবে।

সংখ্যালঘু ও আদিবাসী শিশুর জন্য বিশেষ কার্যক্রম

১. নৃতাত্ত্বিক ও সংখ্যালঘু শিশুর উন্নয়ন ও বিকাশের সকল অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

২. নৃতাত্ত্বিক ও সংখ্যালঘু শিশু যাতে তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ন রেখে বিকাশ লাভ করতে পারে এবং তার নিজ ভাষায় শিক্ষা লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে সুরক্ষা

১. দুর্যোগ-পরবর্তী জরুরি অবস্থায় খাদ্যের পাশাপাশি শিশুর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা

হবে। সংক্রামক ও পানিবাহিত রোগ থেকে রক্ষা এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে শিক্ষার সুবিধা পুনর্বহালের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

শ্রমজীবী শিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য (শারীরিক ও মানসিক) ও পুষ্টি

এ ছাড়াও 'জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি, ২০১০'-এ বলা হয়েছে: শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত যে সমস্ত উদ্যোগ/কার্যক্রম ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে। জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন তথা ইউনিসেফ, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাসহ (আইএলও) স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত বিদ্যমান উদ্যোগসমূহের কার্যকর ও ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের জন্য সমন্বয় কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক। এ ছাড়া শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম অনতিবিলম্বে গ্রহণপূর্বক তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের কর্মকৌশল নির্ধারণে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পরিচ্ছেদ-৪.১১: যৌন হয়রানি/মেয়েদের উত্ত্যক্তকরণ

যৌন হয়রানি বা মেয়েদের উত্যক্তকরণ কী?

সহজ কথায়, যৌন হয়রানি বা ইভটিজিং হচ্ছে মেয়েদেরকে উত্যক্ত করা বা বিরক্ত বা হয়রানি করা। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ইভটিজিং নারী নির্যাতনের একটি অন্যতম ধরন। শাব্দিক অর্থে ইভ অর্থ হাওয়া, বাইবেল অনুযায়ী যিনি পৃথিবীর সবচেয়ে আদি মানবী। 'টিজিং' শব্দটির মধ্যে প্রকাশ পায় এক ধরনের মানসিক নির্যাতন বা হয়রানী করা। সব মিলিয়ে ইভটিজিং হলো নারীদেরকে নানা ধরনের অশ্লীল, অশোভন বা কটু মন্তব্য করে উত্ত্যক্ত, ত্যক্ত-বিরক্ত বা মানসিকভাবে নির্যাতন করা। বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতায় নারীরা প্রতিনিয়ত নানাভাবে 'টিজিং' এর শিকার হচ্ছে। সব বয়সের নারীরাই এর শিকার।

নারীরা এখন ঘরের বাইরে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করছে, এবং রাখছে উল্লেখযোগ্য অবদান। মেয়েদের বহিরাঙ্গনে পদার্পণ যত বাড়ছে ততই রাস্তাঘাটে, স্কুল-কলেজে, অফিস-আদালতে তাদেরকে টিজিং এর শিকার হতে হচ্ছে। আর এর ফলে মেয়েরা কখনও হচ্ছে মানসিক যন্ত্রণার শিকার; কখনও বা দৈহিক যন্ত্রণার। তাই এটি এখন গুরুতর সমস্যায় পরিণত হয়েছে। স্কুল-কলেজের সামনে অথবা যাতায়াতের রাস্তায়, বেড়ানোর স্থানে, পার্ক ও বিনোদন এলাকায় 'ইভ টিজিং' হয় অনেক বেশি। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দলবদ্ধভাবে কিছু ছেলে, যারা অনেক ক্ষেত্রেই সমবয়সী তারা ইভটিজিং করে; যারা মেয়েদেরকে সম্মান করে না বা মর্যাদা দিতে জানে না, তারাই 'ইভটিজিং' করে থাকে।

'যৌন হয়রানি' বা নারী উত্ত্যক্তকরণের প্রতিকার ও প্রতিরোধে আইনে যা আছে

ধারা ৫০৯ দণ্ডবিধি: (কোনো ব্যক্তি) কোনো নারীর শালীনতার অমর্যাদা করার অভিপ্রায়ে যদি কোনো মন্তব্য, কোনো শব্দ বা অঙ্গভঙ্গি বা কোনো বস্তু প্রদর্শন করে, যা উক্ত নারী অনুরূপ মন্তব্য বা শব্দ শুনতে পায় বা অনুরূপ অঙ্গভঙ্গি বা বস্তু দেখতে পায়; কিংবা উক্ত নারীর নির্জনবাসে প্রবেশ করে, তবে সেই ব্যক্তি এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ধারা ৭৬: ডিএমপি অধ্যাদেশ (একই ধরনের বিধান অন্যান্য মহানগর এলাকায় প্রচলিত) স্বেচ্ছায় কোনো রাস্তায় বা সাধারণের ব্যবহার্য স্থানে কোনো মহিলাকে পীড়ন বা তার পথ রোধ অথবা কোনো রাস্তায় বা সাধারণের ব্যবহার্য স্থানে অশালীন ভাষা ব্যবহার করে অশ্লীল আওয়াজ, অঙ্গভঙ্গি বা মন্তব্য করে কোন নারীকে বিরক্ত করলে, ১ বৎসর কারাদণ্ড অথবা ২ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩)

ধারা ৯(ক): নারীর আত্মহত্যায় প্ররোচনা - (কোনো ব্যক্তি দ্বারা) কোনো নারী তার সম্ভ্রমহানি ঘটার প্রত্যক্ষ কারণে আত্মহত্যা করলে, উক্ত ব্যক্তি উক্ত নারীকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করার অপরাধে অপরাধী হবে এবং অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবে এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

ধারা ১০: যৌন পীড়ন ইত্যাদির দণ্ড - অবৈধভাবে যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কোনো নারীর শরীরের যেকোনো অঙ্গ বা কোনো বস্তু দ্বারা কোনো নারী বা শিশুর যৌনাঙ্গ বা অন্য কোনো অঙ্গ স্পর্শ করলে সেই কাজটি হবে যৌনপীড়ন। এ কাজের জন্য সেই ব্যক্তি অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হবেন।

উত্ত্যক্তকরণ প্রতিরোধে সাম্প্রতিক কিছু পদক্ষেপ

২০১০ সালের আগস্ট পর্যন্ত এক বছরে সারাদেশে উত্ত্যক্ত করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৫০টি মামলা হয়েছে। আর সাধারণ ডায়েরি (জিডি) হয়েছে মোট ৩৭৭টি। গ্রেফতার করা হয়েছে ৫২০ জনকে। এ ছাড়া উত্ত্যক্তকরণ প্রতিরোধে এবং অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করতে জরুরি ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হয়েছে:

ভ্রাম্যমাণ আদালত - উত্ত্যক্তকরণ প্রতিরোধে বিচারকার্যের জন্য বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৫০৯ ধারাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের তফসিলভুক্ত করে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে ২০১০ সালের ১০ নভেম্বর। আইন মন্ত্রণালয় এ গেজেট প্রকাশ করেছে। এই আইনের ক্ষমতাবলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উত্ত্যক্তকরণের ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলেই অপরাধীকে আমলে গ্রহণ করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করে সর্বোচ্চ এক বছরের কারাদণ্ড বা যেকোনো অঙ্কের জরিমানা বা দুটি সাজাই দিতে পারবেন।

উল্লিখিত আইনের ৭ ধারার বিধান অনুযায়ী মোবাইল কোর্টের পরিচালনা পদ্ধতি হলো:

১. মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার সময় কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে গৃহীত হওয়ার পরপরই মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সংক্ষিপ্ত অভিযোগ লিখিতভাবে গঠন করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পড়ে ও ব্যাখ্যা করে শোনাবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি গঠিত অভিযোগ স্বীকার করেন কি-না তা জানতে চাইবেন। যদি স্বীকার না করেন, তা হলে কেন স্বীকার করেন না তার ব্যাখ্যা জানতে চাইবেন।

২. অভিযুক্ত ব্যক্তি গঠিত অভিযোগ স্বীকার করলে, তার স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করে তাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর বা টিপসই এবং দু'জন সাক্ষীর স্বাক্ষর বা টিপসই গ্রহণ করতে হবে। এরপর মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তার বিবেচনায় যথোপযুক্ত দণ্ড আরোপ করে লিখিত আদেশ প্রদান করবেন এবং সেই আদেশে স্বাক্ষর করবেন।

৩. অভিযোগ অস্বীকার করে আত্মপক্ষ সমর্থনে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হলে, মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করবেন।

৪. অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক উপধারা (৩)-এর অধীন প্রদত্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হলে, মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগটি বিচারের জন্য উপযুক্ত আদালতে প্রেরণ করবেন।

এ আইনের ক্ষমতাবলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উত্ত্যক্তকরণের ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলেই অপরাধটিকে আমলে নিয়ে তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করে, সে অনুযায়ী নির্ধারিত দণ্ড আরোপ করতে পারবেন। এর একটি উদাহরণ হলো ভর্তিচ্ছু ছাত্রীকে উত্ত্যক্তের দায়ে শিক্ষকের কারাদণ্ড। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক এক ছাত্রীকে উত্ত্যক্তের দায়ে ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের এক শিক্ষককে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। 'গ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার হলে ছাত্রীটিকে উত্ত্যক্ত করার অভিযোগে তাকে এ শাস্তি দেয়া হয়।

হাইকোর্টের রায়–উত্ত্যক্তকরণ যৌন নিপীড়নের একটি ধরন। যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন বন্ধে ১৫ মে ২০০৯ মহামান্য হাইকোর্ট নির্দেশনা প্রদান করেন। হাইকোর্ট ঘোষিত যৌন নিপীড়নবিরোধী নির্দেশনায় বলা হয়েছে, অভিযোগ গ্রহণের জন্য, তদন্ত পরিচালনার জন্য এবং সুপারিশ করার জন্য সরকারি-বেসরকারি সকল কর্মক্ষেত্রে এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অভিযোগ গ্রহণের জন্য কমিটি গঠন করবে। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা অপরাধ হিসেবে গণ্য করবে এবং সব সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রের শৃঙ্খলাবিধি অনুসারে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং যদি উক্ত অভিযোগ প্রচলিত আইনের অধীনে অপরাধ হিসাবে গণ্য হয়, সে ক্ষেত্রে আইনের আশ্রয় নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতে প্রেরণ করতে পারবে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধনের উদ্যোগ–নারী উত্যক্তকারীদের সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ডের বিধান রেখে 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (২০০৩-এ সংশোধিত) সংশোধন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ কারণে বিদ্যমান ২০০৩ এ সংশোধিত 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের' কিছু ধারা প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এখন উত্যক্ত করার ধরন বদলে গেছে, মোবাইল ফোনে বা এসএমএসের মাধ্যমেও নারীকে উত্যক্ত করা হচ্ছে। আইনে এসব বিষয়েও দমন আইনের ১০ (২) ধারায় বলা ছিল, "কোনো পুরুষ অবৈধভাবে তাহার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কোনো নারীর শ্লীলতাহানি করলে বা অশোভন অঙ্গভঙ্গি করলে তার এই কাজ হইবে যৌন হয়রানি এবং তার জন্য উক্ত পুরুষ অনধিক সাত বৎসর কিন্তু অন্যূন দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড, অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।" ২০০৩ সালে এ আইনটি সংশোধন করার সময় এ ধারাটি আর রাখা হয়নি। নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ ধারায় আরও কিছু বিধান যুক্ত করে তা প্রতিস্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছে। এ ধারায় শাস্তির মেয়াদ রাখা হবে ৭ থেকে ১০ বছর। এ ছাড়া উত্যক্তকরণের প্রকৃত সংজ্ঞা রাখা হবে। শ্লীলতাহানির ব্যাপারে স্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকবে।

পরিচ্ছেদ ৪.১২: প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা ১৯৯৫

প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা (১৯৯৫)তে বলা হয়েছে: প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্যান্য সাধারণ শিশুর মতই শিক্ষা গ্রহণের অধিকার রয়েছে। প্রতিবন্ধীত্ব নিরূপণের মাধ্যমে প্রত্যেকের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রতিবন্ধীতার শ্রেণী, কারণ, ধরন, প্রভাব, সক্ষমতা ও পারিবারিক পরিবেশ অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এ জন্য

১. প্রতিবন্ধী শিশুদের ধরন, প্রভাব মূল শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে সমন্বিতকরণ, নিয়মিত শ্রেণী কক্ষে তাদের পূর্ণ সমন্বিতকরণ অথবা নিয়মিত শ্রেণীর সংযুক্তিতে তাদের সমন্বিতকরণই এ শিক্ষার উদ্দেশ্য। প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়মিত শ্রেণী কক্ষে সমন্বিত করা হবে (যেখানে তারা নিয়মিত শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে উপকৃত হবে)। প্রশিক্ষণ ইউনিটসমূহ তথ্যাভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা পরিচালিত হবে।

২. রিসোর্স কেন্দ্র পরিচালিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, বিশেষ শিক্ষা উপকরণাদি ও শিখণ সরঞ্জামাদি মূল শিক্ষা কর্মসূচির সমন্বিতকরণে সহায়ক হবে।

৩. বিশেষ বিদ্যালয়গুলো বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এতিম, গৃহহীন, একাধিক প্রতিবন্ধীতা আছে এমন বা চরম প্রতিবন্ধী শিশুরা এখানে অগ্রাধিকার পাবে।

৪. বিশেষ বিদ্যালয় এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অংশবিশেষ ৭ বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণসহ পাঠ্যসূচি অনুসরণ করবে।

৫. বিশেষ শিক্ষা বিদ্যালয় এবং কেন্দ্রে প্রশিক্ষণকালে নিরূপণ পদ্ধতির মাধ্যমে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রমে বদলী করা হবে।

৬. বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ ও আবাসিক ব্যবস্থা বিনামূল্যে প্রদান করা হবে।

৭. প্রতিবন্ধীতার কারণে যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে অধ্যয়নে অসমর্থ হয়, তবে সে ক্ষেত্রে বিকল্প বিষয় বা বিষয়সমূহ অনুমোদন করা হবে।

৮. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা যেখানে ভর্তি হবে সেখানে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ব্রেইল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হবে এবং তাদের উত্তরপত্র ব্রেইল পদ্ধতিতে প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। শারীরিক প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীর যদি লিখতে অসুবিধা থাকে, তাহলে সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হবে।

(পাঠকবান্ধব করার জন্যে মূল নীতিমালার ভাষা পরিমার্জন করা হয়েছে)

এ ছাড়াও, ২০০৪ সালে জুন মাসে এক সরকারি পরিপত্রে বলা হয়-সরকার প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-২ (পিডিইপি-২) এর আওতায় বিশেষ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ লক্ষ্যে দেশের সরকারি ও রেজিস্টার্ড প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিম্নোক্ত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়-

১. যে সকল প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান করা বাস্তবসম্মত নয়, তাদেরকে এ সকল প্রতিষ্ঠানে বিশেষ সুযোগ প্রদান করতে হবে।

২. এ ধরনের শিক্ষার্থীদেরকে যাতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা বন্ধু ও সহপাঠী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে সেজন্যে শিক্ষকদের বিশেষভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম ও খেলাধুলায় যাতে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীগণ অংশ নিতে পারে সে জন্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৪. শিক্ষা উপকরণ ও পুস্তক বিতরণকালে বিশেষ শিক্ষার সুযোগ এর উপযোগী শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

৫. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা যাতে উপবৃত্তি প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পায় সে দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

পরিচ্ছেদ ৪.১৩: জাতীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১

এ আইনে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে:

১. বিশেষ ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিশেষায়িত প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দান, তাদের জন্য বিশেষ পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং ক্ষেত্রমত বিশেষ পরীক্ষা পদ্ধতি চালুর ব্যবস্থা করা।

২. অনধিক আঠারো বৎসর বয়স্ক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিনা বেতনে শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টিসহ তাদেরকে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

৩. সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে একই শ্রেণীকক্ষে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪. প্রতিবন্ধীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের কর্মসূচি গ্রহণ করা।

৫. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষক বা অন্যান্য কর্মীকে প্রশিক্ষণদানের কর্মসূচি গ্রহণ করা।

৬. প্রতিবন্ধীদের জীবনধারা এবং সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সমাজ পরিচিতি বিষয়ক পাঠ্যপুস্তকে যথাযথ প্রবন্ধ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদির সংযোজনের ব্যবস্থা করা।

৭. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধীদের যাতায়াতের সহায়ক ব্যবস্থা করা।

পরিচ্ছেদ ৫

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রাথমিক শিক্ষায় অধিকারসমূহ

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের বিশ্ব মানাবাধিকার ঘোষণায় যেসব অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে স্পষ্টভাষায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক মানুষের অধিকার রয়েছে। জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এ ঘোষণার প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেছে এবং এটি বাস্তবায়নে পূর্ণ অঙ্গীকারাবদ্ধ। একইভাবে 'সবার জন্য শিক্ষা' অধিকার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ একাধিক আন্তর্জাতিক সনদ ও ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতার কথা স্বীকার করে নিয়েছে।

থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে ১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত হয় 'সবার জন্য শিক্ষা সম্মেলন'। জমতিয়েন সম্মেলনে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৫৫টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেন, যেখানে তাঁরা সম্মিলিতভাবে 'সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষক আন্তর্জাতিক ঘোষণা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করেন। এই সম্মেলনে ২০০০ সালের মধ্যে শিক্ষা নিশ্চিত করার আহবান জানিয়ে একটি ঘোষণাপত্র অনুমোদন করা হয়, যাতে বাংলাদেশসহ ১৫০টি দেশ স্বাক্ষর করে। এই ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার সকল শিশু, যুবক ও বয়স্ক নাগরিকের মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। সম্মেলনে বিশ্বের সকল মানুষের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রতিটি দেশ প্রতিশ্রুতি দেয়। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা এ বিষয়ে একমত হন যে, মৌলিক শিক্ষার আসলে এমন কোনো বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন সংজ্ঞা নেই, যা প্রয়োগে সব জায়গায় এর চাহিদা একইভাবে পূরণ করা যায়। আর তাই প্রতিটি দেশের উচিত মৌলিক শিক্ষার চাহিদা অনুযায়ী সাক্ষরতা এবং অব্যাহত শিক্ষার অবস্থা ও অবস্থান চিহ্নিত করা।

১০ বছর পর ২০০০ সালের এপ্রিলে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে 'সবার জন্য শিক্ষা' বিষয়ক দ্বিতীয় বিশ্ব সম্মেলনে বাংলাদেশসহ ১৮০টির বেশি দেশ অংশগ্রহণ করে। বিশ্বব্যাংক, ইউএনডিপি, ইউনিসেফ, ইউনেস্কো ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলনে বাংলাদেশসহ ১৮০টি দেশের শিক্ষামন্ত্রী, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও এনজিও প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। ডাকারের এই সম্মেলনে ২০১৫ সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিতকরণের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত হয়। অংশগ্রহণকারীরা একটি কর্মকাঠামোও অনুমোদন করেন।

দেখা যাচ্ছে, জমতিয়েন ও ডাকার ঘোষণায় স্বাক্ষর করার মাধ্যমে বাংলাদেশ তার প্রতিটি নাগরিকের জন্য মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করায় আন্তর্জাতিকভাবে দায়বদ্ধ হয় এবং এটি বাস্তবায়নে পুনঃপুনঃ অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। অর্থাৎ শিক্ষা অধিকার বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ এখন জাতীয় পর্যায়ের পাশাপাশি আন্তর্জাতিকভাবেও দায়বদ্ধ রয়েছে। আর তাই যারা দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে (স্থানীয়, কেন্দ্রীয় ও জাতীয়) শিক্ষা অধিকার নিয়ে কাজ করছেন, তাঁদের মনে রাখতে হবে–এই কাজের পেছনে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি ও বৈধ ভিত্তি রয়েছে। সেসব আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ বা কনভেনশনের শিক্ষা-অধিকারসংক্রান্ত নির্দেশনা অংশটুকু নিচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

পরিচ্ছেদ ৫.১: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণা

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গ্রহণ ও অনুমোদন করে। এ ঐতিহাসিক পদক্ষেপের পর সাধারণ পরিষদ সকল সদস্য দেশকে ঘোষণাপত্রের বিষয়বস্তু জানানো এবং তা দেশ ও অঞ্চলসমূহের রাজনৈতিক মর্যাদাভিত্তিক পার্থক্য নির্বিশেষে প্রধানত স্কুল ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচার, প্রদর্শন, পঠন ও ব্যাখ্যা করার আহবান জানায়। নিচে এ ঘোষণার শিক্ষাসংশ্লিষ্ট অংশটুকু তুলে ধরা হলো-

- ধারা ১: সব মানুষ স্বাধীনভাবে এবং সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জন্মায়। তারা বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন এবং একে অন্যের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ করা উচিত।
- ধারা ৩: প্রত্যেকেরই জীবন ধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার আছে।
- ধারা ৬: আইনের চোখে প্রত্যেকেরই সর্বত্র ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার আছে।
- ধারা ১৮: প্রত্যেকেরই চিন্তা, চেতনা ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। নিজ ধর্ম বা বিশ্বাস পরিবর্তনের স্বাধীনতা এবং একা বা অন্যদের সঙ্গে একযোগে প্রকাশ্যে বা গোপনে নিজ ধর্ম বা বিশ্বাস শিক্ষাদান, প্রচার, উপাসনা ও পালনের মাধ্যমে তা প্রকাশের স্বাধীনতা এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।
- ধারা ১৯: প্রত্যেকেরই মতামতের ও তা প্রকাশের অধিকার রয়েছে; বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ এবং যে কোনো মাধ্যমে ও রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও মতামত সন্ধান, গ্রহণ ও জ্ঞাত করার স্বাধীনতা–এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।
- ধারা ২০:

  ক. প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণভাবে সম্মিলিত হবার অধিকার আছে।

  খ. কাউকেই কোনো সংঘভুক্ত হতে বাধ্য করা যাবে না।
- ধারা-২৬

  ক. প্রত্যেকেরই শিক্ষালাভের অধিকার রয়েছে। অন্ততপক্ষে প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণভাবে লভ্য থাকবে এবং উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত থাকবে।

  খ. ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ও মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা পরিচালিত হবে। সমঝোতা, সহিষ্ণুতা, সকল জাতি, বর্ণ ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে বন্ধুত্ব উন্নয়ন এবং শান্তি রক্ষার্থে জাতিসংঘ কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করবে।

  গ. সন্তানদের কোন ধরনের শিক্ষা দেয়া হবে, তা আগে থেকে বেছে নেয়ার অধিকার পিতামাতার রয়েছে।

(বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন সংযোজনী ২ঃ সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা)

পরিচ্ছেদ ৫.২: সিডও ঘোষণা

সিডো (CEDAW) সনদ–নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূর করা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সবক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) গৃহীত হয়। নিচে ওই সনদের শিক্ষাবিষয়ক ধারা ও উপধারাসমূহ তুলে ধরা হলো:

ধারা ১০: শিক্ষায় সমঅধিকার–শিক্ষাক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে যেসব বিষয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শরীক রাষ্ট্রসমূহ নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, সেগুলো হচ্ছে–

ক. কর্মজীবন ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা, পল্লী ও শহরাঞ্চলে সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ ও ডিপ্লোমা লাভের সুযোগের জন্য একই শর্তাবলী; স্কুল-পূর্ব, সাধারণ, কারিগরি, পেশাগত ও উচ্চতর কারিগরি শিক্ষা, সেই সাথে সকল ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে এই সমতা নিশ্চিত করা;

খ. একই পাঠ্যক্রম, একই পরীক্ষা, একই মানের যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক এবং একই মানের বিদ্যালয় চত্বর ও সরঞ্জামাদি লাভের সুযোগ প্রদান;

গ. সহশিক্ষা এবং পুরুষ ও নারীর ভূমিকা সম্পর্কিত চিরাচরিত ধারণা দূরীকরণের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক অন্য ধরনের শিক্ষা উৎসাহিত করার মাধ্যমে, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক ও বিদ্যালয় কর্মসূচি সংশোধন এবং উপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে এবং সকল ধরনের শিক্ষায় পুরুষ ও নারীর ভূমিকা সম্পর্কিত চিরাচরিত যেকোনো ধারণা দূরীকরণ;

ঘ. বৃত্তি ও অন্যান্য শিক্ষা মঞ্জুরি থেকে লাভবান হওয়ার সুযোগ প্রদান;

ঙ. বয়স্ক ও কর্মমূলক শিক্ষা কর্মসূচিসহ শিক্ষা অব্যাহত রাখার কর্মসূচি, বিশেষ করে পুরুষ ও নারীর মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান যেকোনো দূরত্ব সম্ভব স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রণীত কর্মসূচিসমূহে সুযোগ লাভের একই সুবিধা প্রদান;

চ. ছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগের হার কমানো এবং নির্দিষ্ট সময়ের আগেই যে সকল ছাত্রী বিদ্যালয় ত্যাগ করেছেন, তাদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন;

ছ. খেলাধুলা ও শারীরিক শিক্ষায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য একই সুযোগ প্রদান;

জ. পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ও পরামর্শসহ নির্দিষ্ট শিক্ষামূলক তথ্য পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি।

পরিচ্ছেদ ৫.৩: জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (১৯৮৯)

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (১৯৮৯) এর অনুচ্ছেদ ২৮ ও ২৯ এ বলা হয়েছে:

অনুচ্ছেদ- ২৮

১. অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্র সমান সুযোগের ভিত্তিতে শিশুর শিক্ষা লাভের অধিকারকে স্বীকার করবে এবং এই অধিকারকে অধিক বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, বিশেষ করে-

  ক. সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং সহজলভ্য করতে হবে।

  খ. সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাসহ বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষাকে উৎসাহ দেয়া; প্রতিটি শিশুর জন্য এরূপ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা। সকল শিশু যেন এ সুযোগ লাভ করতে পারে সে জন্য বিনা খরচে শিক্ষা লাভ ও প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্যের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

  গ. যোগ্যতার ভিত্তিতে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ যাতে সবাই পায়, সে জন্য সব যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

  ঘ. শিক্ষাবিষয়ক ও বৃত্তিমূলক তথ্য এবং দিকনির্দেশনা সব শিশুর জন্য সহজে গ্রহণযোগ্য ও পর্যাপ্ত করতে হবে।

  ঙ. স্কুলে নিয়মিত উপস্থিতি উৎসাহিত করা এবং স্কুল ত্যাগের হার কমানোর লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

২. অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ স্কুলের শৃংখলা বিধানের নিয়ম-কানুন যাতে শিশুর মানবিক মর্যাদা এবং এই সনদের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়, সে জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩. অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে জোরদার ও উৎসাহিত করবে; বিশেষ করে বিশ্বব্যাপী অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা দূর করা এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার ব্যাপারে জ্ঞান সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে। এ ব্যাপারে উন্নয়নশীল দেশগুলোর চাহিদাকে বিশেষ বিবেচনায় আনতে হবে।

অনুচ্ছেদ ২৯

১. অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে যে বিষয়সমূহ লক্ষ্য রাখবে তা হচ্ছে:

  ক. শিশুর ব্যক্তিত্ব, মেধা, এবং মানসিক ও শারিরীক দক্ষতার পূর্ণ বিকাশ।

  খ. মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা এবং জাতিসংঘ ঘোষিত নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ।

  গ. শিশুর পিতা-মাতার নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা, মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং যে দেশে বাস করে, সে দেশের মূল্যবোধ, শিশুর নিজস্ব মাতৃভূমিসহ অপরাপর সভ্যতার প্রতি সম্মানবোধকে জাগিয়ে তোলা।

ঘ. মৈত্রীর চেতনায় একটি মুক্তসমাজে দায়িত্বশীল জীবনের জন্য শিশুকে প্রস্তুতি নিতে হবে। সে কারণে সমঝোতার সাথে শান্তি, সহিষ্ণুতা, নারী-পুরুষের সমান অধিকারসহ সকল জনগণ, বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত জাতি (এথনিক), জাতীয় ও ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং আদিবাসী সকল লোকজনের প্রতি সমান সম্মান দেখাবে।

ঙ. প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

২. এই অনুচ্ছেদ কিংবা ২৮ নং অনুচ্ছেদ-এর যেকোনো অংশ অনুসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং পরিচালনার ব্যাপারে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হবে– এমনভাবে কোনো ব্যাখ্যা দেয়া যাবে না; যদি না ১ নং প্যারায় উল্লেখিত নীতিমালা উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ অনূসরণ না করে থাকে এবং তাদের শিক্ষার মান যদি রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত মানের নূন্যতম সংগতিপূর্ণ না হয়।

পরিচ্ছেদ ৫.৪: জমতিয়েন ঘোষণা ১৯৯০

"প্রত্যেক মানুষের শিক্ষার অধিকার আছে"–এটি জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত অধিকারসমূহের অন্যতম। এই ঘোষণার ৪০ বছর পরে ১৯৯০ সালের মার্চ মাসে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলন। সেই সম্মেলনের ঘোষণায় (World declaration on education for all and framework for action to meet basic learning needs) বলা হয়:

১. **সকলের মৌলিক শিক্ষার চহিদা পূরণ:** মৌলিক শিক্ষার জন্য পরিকল্পিত সুযোগ থেকে প্রত্যেক শিশু, যুবা, বয়স্ক ব্যক্তি উপকৃত হতে পারবে।

২. **দৃষ্টিভঙ্গী গঠন:** সকলের জন্য মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে প্রচলিত মৌলিক শিক্ষার প্রতি সমর্থন পুণর্ব্যক্ত করাই যথেষ্ট নয়। বিদ্যমান সর্বোত্তম ব্যবস্থাদির ভিত্তিতে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি অতিক্রম করে সকলের মৌলিক শিক্ষার চাহিদা পূরণ করা যায়।

৩. **সর্বজনীন শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ও সমতা সৃষ্টি:** সকল শিশু, যুবা ও বয়স্ক ব্যক্তিকে মৌলিক শিক্ষা দিতে হবে।

৪. **শিক্ষা অর্জনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান:** শিক্ষার সম্প্রসারিত সুযোগ কোনো ব্যক্তি বা সমাজের অর্থবহ উন্নয়নের কাজে লাগে কি না তা চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে প্রাপ্ত সুযোগ থেকে ওই ব্যক্তি বা সমাজ প্রকৃতপক্ষে কোনো শিক্ষা অর্জন করে কি না তার ওপর। অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত প্রয়োজনীয় জ্ঞান, যুক্তি, যোগ্যতা, দক্ষতা ও মূল্যবোধ যদি আত্মীকরণ করা যায়, তবেই তা উন্নয়নের কাজে লাগে।

৫. **মৌলিক শিক্ষার পদ্ধতি ও পরিধি বিস্তৃতকরণ:** শিশু, যুবা, বয়স্ক ব্যক্তি সকলের মৌলিক শিক্ষার প্রয়োজনের বৈচিত্র্য, জটিলতা এবং পরিবর্তনশীলতার কারণে মৌলিক শিক্ষার সংজ্ঞায় প্রতিনিয়ত নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হয়ে তার পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে। এর মধ্যে আছে নবজাতকের যত্ন এবং শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, যুবা ও বয়স্কদের বিবিধ প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী বিভিন্নমুখী শিক্ষা, তথ্য বিনিময়ের সকল কৌশল ও মাধ্যম ব্যবহার করে জনসাধারণকে অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞান দান এবং তাদেরকে সামাজিক সমস্যাবলী সম্বন্ধে অবহিত করা ও শিক্ষিত করা।

৬. **শিক্ষার পরিবেশ উন্নতকরণ:** সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে শিক্ষা লাভ হয় না। যাদের জন্য শিক্ষার আয়োজন তারা যেন শিক্ষা কর্মকাণ্ড থেকে উপকৃত হতে পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা, শারীরিক ও আবেগিক সমর্থন পেতে পারে– সমাজকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৭. **অংশীদারিত্ব শক্তিশালীকরণ:** জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ওপর সকলের জন্য মৌলিক শিক্ষা আয়োজনের যে বিশেষ দায়িত্ব তা পালনে কোনো কর্তৃপক্ষ এককভাবে লোকবল, সম্পদ প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন দিতে সক্ষম হবে এমন আশা করা যায় না। সে জন্যেই সকল স্তরে নতুন উদ্যমে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা ও শক্তি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৮. **প্রাসঙ্গিক সমর্থন নীতিমালা গঠন:** ব্যক্তি ও সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে মৌলিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং তার সদ্ব্যবহার করার জন্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমর্থন নীতিমালা গঠন করা প্রয়োজন।

৯. **সম্পদ সংগ্রহ:** অতীতের চেয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিস্তৃততর আকারে সকলের জন্য মৌলিক শিক্ষার আয়োজন করতে গেলে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সরকারি, বেসরকারি, স্বেচ্ছাসেবি কর্মকাণ্ডে অধিকতর অর্থসম্পদ ও মানব সম্পদ যোগানো অপরিহার্য।

১০. **আর্ন্তজাতিক সংহতি দৃঢ়করণ:** মৌলিক শিক্ষার প্রয়োজন মেটানো সকলের ও বিশ্বের মানবিক দায়িত্ব। সেজন্য বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতিকারকল্পে ন্যায্য নিরপেক্ষ অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দৃঢ় করা প্রয়োজন।

পরিচ্ছেদ ৫.৫: ডাকার ঘোষণা ২০০০

২০০০ সালে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষা-উন্নয়ন সংক্রান্ত অনেকগুলো সংস্থা মিলে 'সবার জন্য শিক্ষা' নীতি বাস্তবায়নের জন্য ৬টি লক্ষ্য পূরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন। লক্ষ্যগুলো হলো:

১. সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুসহ সকল শিশুর প্রাক-প্রাথমিক ও শৈশবকালীন শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন।

২. মেয়ে শিশু, সংখ্যালঘু শিশু ও সংঘাতময় পরিস্থিতির শিকার এমন ধরনের শিশুসহ সকল শিশুর জন্য ২০১৫ সালের মধ্যে বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩. সকল শিশু-কিশোর ও বয়স্কদের শিক্ষাচাহিদা নিশ্চিত করতে বুনিয়াদী, জীবনঘনিষ্ঠ ও সামাজিক শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচি এমনভাবে প্রণয়ন করা, যেন সেখানে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

৪. ২০১৫ সালের মধ্যে বিশেষত নারীসহ সকল বয়স্ক সাক্ষরতার হার অন্তত ৫০ভাগে উন্নীত করা এবং বুনিয়াদী ও তৎপরবর্তী শিক্ষায় বয়স্কদের অংশগ্রহণের প্রাথমিক সুযোগ নিশ্চিত করা।

৫. ২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিদ্যমান ছেলে-মেয়েদের সকল বৈষম্য দূরীকরণ; সমস্ত শিক্ষাক্ষেত্রে ২০১৫ সালের মধ্যে ছেলে-মেয়েদের সমতা অর্জন; এবং তা অর্জনে সকল নারীর জন্য মানসম্পন্ন, বুনিয়াদী শিক্ষায় পূর্ণ ও সুষম প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ।

৬. শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং এ-সংক্রান্ত সকল কাজে উৎকর্ষ সাধন, যাতে সবার পক্ষে অন্তত সংখ্যা হিসাব-নিকাশ ও পাঠের মতো বাহ্য ও পরিমাপযোগ্য দক্ষতা অর্জন সম্ভব হয়।

পরিচ্ছেদ ৫.৬: দিল্লি ঘোষণা

১. উচ্চ জনসংখ্যার নয়টি উন্নয়নশীল দেশের দিল্লি ঘোষণা নিম্নরূপ

আমরা বিশ্বের ন'টি উচ্চ জনসংখ্যার উন্নয়নশীল দেশের নেতৃবৃন্দ, এতদ্বারা আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছি যে, আমরা প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করে এবং শিশু, যুব ও প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করে আমাদের সকল নাগরিকের মৌলিক শিক্ষাচাহিদা মেটানোর জন্য ১৯৯০ সালে 'সবার জন্য শিক্ষাবিষয়ক বিশ্ব সম্মেলন' এবং বিশ্ব শিশু সম্মেলনে নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ যথাসাধ্য উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সংকল্প নিয়ে অনুসরণ করব। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি লোক আমাদের এই দেশসমূহে বাস করছে এবং বিশ্বব্যাপী সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে আমাদের প্রচেষ্টার সাফল্য যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ– এ বিষয়ে পূর্ণ সচেতনতার সাথে আমরা এই অঙ্গীকার করছি।

২. আমরা স্বীকার করছি যে–

২.১ আমাদের দেশসমূহের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং উন্নয়ন লক্ষ্য কেবলমাত্র আমাদের সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা এবং আমাদের প্রতিটি দেশের সংবিধান ও আইনে শিক্ষা-অধিকারের অঙ্গীকার রয়েছে;

৩. সমাজের উন্নয়নে শিক্ষা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে–সে ব্যাপারে সচেতন থেকে আমরা এতদ্বারা অঙ্গীকার করছি যে, ২০০০ সালের মধ্যে কিংবা তার যতটা আগে সম্ভব

৩.১ আমরা প্রতিটি শিশুর জন্য কোনো বিদ্যালয়, কিংবা তার সামর্থ্য অনুযায়ী উপযুক্ত শিক্ষা কর্মসূচিতে একটি আসন নিশ্চিত করব, যাতে শিক্ষক, শিক্ষাসামগ্রী কিংবা পর্যাপ্ত স্থানের অভাবে কোনো শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়; আমরা শিশু অধিকার সনদের অধীনে আমাদের অঙ্গীকার পূরণের জন্য এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, সনদ আমরা অনুমোদন করেছি;

৩.৬ ‘সবার জন্য শিক্ষা’ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করব। কারণ, আমরা এই ঘোষণার সাথে কর্মসূচির কাঠামো অনুমোদন করছি; আর আমরা জাতীয় পর্যায়ে আমাদের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং আমাদের নিজেদের মধ্যে ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের অঙ্গীকার করছি।

পরিচ্ছেদ ৫.৭: শিক্ষায় বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব (Global Partnership for Education)

সকল শিশুর মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০২ সালে ‘শিক্ষার জন্যে বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব’ বা গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ৪৬টি উন্নয়নশীল দেশ, ৩০টিরও বেশি দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন ব্যাংক, বেসরকারি খাত, শিক্ষক এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত। উল্লেখ্য, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ৬৭ মিলিয়ন শিশু এখনও বিদ্যালয়ের বাইরে। ‘গ্লোবাল পার্টরনারশিপ ফর এডুকেশন’ একমাত্র বহু অংশীদারিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান, যার মূল কাজ হলো–ঝরে পড়া শিশুদেরকে বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসা এবং তাদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা।

মূলতঃ ‘গ্লোবাল পার্টরনারশিপ ফর এডুকেশন’ নিম্ন আয়ের দেশসমূহ এবং দাতা দেশসমূহের মধ্যে ‘বৈশ্বিক সংযোগ’ হিসেবে কাজ করছে; যার লক্ষ্য হলো, শিক্ষার ক্ষেত্রে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করা এবং সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা। সবার জন্য শিক্ষার মূল লক্ষ্যসমূহ হলো: প্রাক শৈশব শিক্ষার বিকাশ, সবার জন্য বিনামূল্যে মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করা, তরুণ এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য শিখন ও দক্ষতার বিকাশ, বয়স্ক সাক্ষরতার হার বাড়ানো, জেন্ডার বৈষম্য রোধ ও সমতা আনয়ন এবং শিক্ষার মান বাড়ানো।

গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশনের ১০টি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো:

- এটি ৪৬টি উন্নয়নশীল দেশ, ৩০টিরও অধিক দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক, এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন ব্যাংক, বেসরকারি খাত, শিক্ষক এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত।
- এর পূর্বের নাম ছিল, সবার জন্য শিক্ষা বা এডুকেশন ফর অল। ২০১১ সালের সেপেটম্বরে নাম পরিবর্তন করে এটি ‘গ্লোবাল পার্টরনারশিপ ফর এডুকেশন’ নামে পরিচিত হয়।
- ‘গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশন’ হলো একমাত্র বহুপক্ষীয় কৌশল যা প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষায় অর্থায়ন নিয়ে কাজ করছে।
- কেবলমাত্র অর্থায়নই নয়; এটি দাতা সংস্থা ও উন্নয়নশীল দেশসমূহকে এই লক্ষ্যে একসাথে কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত ও সহযোগিতা করছে যে, প্রত্যেকটি দেশের নিজস্ব কৌশলের আলোকে অধিকতর কার্যকর ও সমন্বিতভাবে শিক্ষায় সহায়তা করা সম্ভব।
- ২০১১ সালে ‘গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশন’ ২০১১-২০১৪ ব্যাপি একটি প্রচারাভিযান শুরু করেছে, যার মূল লক্ষ্য হলো দাতা-সহযোগিদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ এবং সুনির্দিষ্ট ফলাফল অর্জনে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, এবং উন্নয়নশীল সহযোগী দেশসমূহ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ করা।
- ‘গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশন’ ২০০৩ সাল থেকে অদ্যাবধি ১৯ মিলিয়নের বেশি শিশুক শিক্ষায় প্রবেশের সুযোগ নিশ্চিত করতে সহযোগিতা করেছে, ৩০,০০০ এরও বেশি শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করেছে এবং ৩,৩৭,০০০ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।
- ‘গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশন’ এর সহায়তায় সহযোগী দেশসমূহে ৬৮% কন্যাশিশু এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করতে পারছে এবং ১৮টি সদস্য দেশ শিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে জেন্ডার-সাম্যতা নিশ্চিত করতে পারছে; এবং কোথাও কোথাও কন্যা শিশুদের শিক্ষায় প্রবেশের হার ছেলে শিশুদের চেয়ে বেশি অর্জিত হয়েছে।
- এসব সাফল্য স্বত্ত্বেও, এখনও বিশ্বব্যাপী ৬৭ মিলিয়ন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে, যার প্রায় অর্ধেকের বসবাস হলো যুদ্ধ-বিধ্বস্ত এবং সংঘাতপূর্ণ দেশে।
- নিম্ন আয়ের দেশসমুহের সকল শিক্ষার্থী যদি ‘শুধুমাত্র পড়তে পারা’র দক্ষতা নিয়ে বিদ্যালয় ছাড়তে পারতো, তাহলে ১৭১ মিলিয়ন মানুষ দারিদ্রের বাইরে চলে আসতো। তাই ২০১১-২০১৪ পর্যন্ত ‘গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর

এডুকেশনে'র অগ্রাধিকার হলো–সংঘাতপূর্ণ দেশসমূহে সহায়তা, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত এবং কন্যা শিশুদেরকে সহযোগিতা করা।

কৌশল: ২০১১-২০১৪

'গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশন' এর ২০১১-২০১৪ সালব্যাপী ৩টি নতুন কৌশলগত দিক-নির্দেশনার মূল লক্ষ্য হলো– অধিকতর সংখ্যক শিশুর শিক্ষায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত এবং মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

উদ্দেশ্য–এর ৩ টি প্রধান উদ্দেশ্য হলো:

- যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশসমূহের জন্য সহযোগিতা বাড়ানো–কারণ, বিদ্যালয়ের বাইরে ৬৭ মিলিয়ন শিশুর মধ্যে ৪০% এরও বেশি শিশুর বসবাস হলো যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশসমুহে। ফলে এ সকল শিশু শিক্ষাব্যবস্থা থেকে পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।
- শিখন ফলাফল এবং মানসম্মত শিক্ষার উন্নয়ন–কারণ, ২০০ মিলিয়ন শিশু বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে থাকলেও শিক্ষার মান খুবই নিম্নতর।
- কন্যাশিশুর শিক্ষায় সহযোগিতা–কারণ, ৩৬ মিলিয়ন কন্যাশিশু এখনও বিদ্যালয়ের বাইরে; এবং অন্তর্ভুক্তদের শিক্ষা সমাপনীর হার এবং শিক্ষার মান খুবই নিম্ন মানের।

গ্লোবার পার্টনারশিপ ফর এডুকেশনের প্রধান কাজসমূহ:

১. শিক্ষা-কৌশল এবং বিভিন্ন কর্মসূচির উন্নয়ন–সকল শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় সম্পদ। 'গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশনে'র মুল কাজ হলো, শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত সকল অংশীজনের সমন্বয় এবং এ সংক্রান্ত শিক্ষা কৌশল ও কর্মসূচি প্রণয়ন। এ ক্ষেত্রে প্রধান কর্মকৌশল হলো–শিক্ষা ক্ষেত্রে কর্মরত সকল সহযোগীকে একত্রিত করা এবং এ কাজে সমন্বিত সহযোগিতার জন্য তহবিল সংগ্রহ এবং অন্যান্য বিষয়ে সহযোগিতা করা; এবং সকলে মিলে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন করা।

২. শিক্ষা ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী সমাধানের প্রবর্তন–বিভিন্ন সফল অনুশীলন এবং এ-সংক্রান্ত প্রাপ্ত জ্ঞান সকলের সাথে বিনিময় করা–'গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশনে'র আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ ক্ষেত্রে বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যাবলী (জিআরএ) বিভিন্ন অংশীজনের সমন্বয়ে করতে উৎসাহিত ও সহায়তা করা। এর ৩টি গুরুত্বপুর্ণ দিক হলো : শিখন ফলাফল অর্জন, বিদ্যালয়ের বাইরের শিশুকে অন্তর্ভুক্তিকরণে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্থায়ন।

৩. শিক্ষায় অর্থায়ন–এ ক্ষেত্রে 'গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশনে'র লক্ষ্য হলো–সকল উন্নয়নশীল দেশ শিক্ষা ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ও স্থায়ীত্বশীল বরাদ্দ নিশ্চিত করার মাধ্যমে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন করবে। এ ক্ষেত্রে উন্নয়শীল দেশসমূহকে মৌলিক শিক্ষার প্রসারে প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ বরাদ্দ প্রদানে উৎসাহিত করা হয়। যখন কোনো দেশে নিজেদের শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় বাজেট ঘাটতি দেখা দেয়, তখন 'গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশন' তিন বছর মেয়াদি নিজস্ব তহবিল থেকে বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে সহযোগিতা করে থাকে।

৪. অর্জিত ফলাফল পরিবীক্ষণ-অর্জিত লক্ষ্য ও এর প্রতিফলনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ ক্ষেত্রে 'গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশনে'র 'রেজাল্ট ফ্রেমওয়ার্ক' এবং 'জবাবদিহিতা ছক' নামে নিজস্ব পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন কৌশল রয়েছে।

পরিচ্ছেদ ৫.৮: সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যাবলী (এমডিজি)

লক্ষ্য ১: চরমদারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল

টার্গেট ১.ক: ১৯৯০ সালকে ভিত্তি বছর ধরে ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী (দৈনিক আয় ১ ডলারের কম) জনসংখ্যার হার অর্ধেকে কমিয়ে আনা;

টার্গেট ১.খ: যুব ও মহিলাসহ সকলের জন্য উৎপাদনশীল, মর্যাদাসম্পন্ন, পূর্ণ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা;

টার্গেট ১.গ: ১৯৯০ সালকে ভিত্তি বছর ধরে ২০১৫ সালের মধ্যে ক্ষুধার্ত মানুষের হার অর্ধেকে কমিয়ে আনা;

লক্ষ্য ২: সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ

টার্গেট ২.ক: ২০১৫ সালের মধ্যে সকল ছেলে-মেয়ের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তি নিশ্চিত করা;

লক্ষ্য ৩: জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন

টার্গেট ৩.ক: ২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে শিক্ষার সকল স্তরে জেন্ডার বৈষম্য দূর করা;

লক্ষ্য ৪: শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করা

টার্গেট ৪.ক: ১৯৯০ সালকে ভিত্তি বছর ধরে ২০১৫ সালের মধ্যে ৫ বছরের কম বয়সের শিশুদের মৃত্যুহার দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস করা;

লক্ষ্য ৫: মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন

টার্গেট ৫.ক: ১৯৯০ সালকে ভিত্তি বছর ধরে ২০১৫ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যুর হার তিন-চতুর্থাংশ হ্রাস করা;

টার্গেট ৫.খ: ২০১৫ সালের মধ্যে প্রজননস্বাস্থ্যে সর্বজনীন সহজগম্যতা নিশ্চিত করা;

লক্ষ্য ৬: এইচআইভি/এইড্স, ম্যালেরিয়া অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ

টার্গেট ৬.ক: ২০১৫ সালের মধ্যে এইচআইভ/এইড্স-এর বিস্তার রোধ করা;

টার্গেট ৬.খ: ২০১০ সালের মধ্যে এইচআইভি/এইড্স– আক্রান্ত সবার জন্য চিকিৎসা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;

টার্গেট ৬.গ: ২০১৫ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য মারাত্মক রোগের বিস্তার রোধ করা;

লক্ষ্য ৭: পরিবেশের স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিতকরণ

টার্গেট ৭.ক: জাতীয় নীতি ও কর্মসূচিতে স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করা এবং বিলুপ্তপ্রায় পরিবেশ সম্পদকে পুনরুদ্ধার করা;

টার্গেট ৭.খ: ২০১০ সালের মধ্যে জীব-বৈচিত্র্যের বিলুপ্তি করা;

টার্গেট ৭.গ: ২০১৫ সালের মধ্যে স্থায়ীভাবে অনিরাপদ খাবার পানি ও মৌলিক স্যানিটেশন সুবিধার আওতা বহির্ভুত জনসংখ্যার অনুপাত কমিয়ে আনা;

টার্গেট ৭.ঘ: ২০২০ সালের মধ্যে কমপক্ষে ১০০ মিলিয়ন বস্তিবাসীর জীবনে দৃশ্যমান উন্নয়ন সাধন করা;

লক্ষ্য ৮: উন্নয়নে বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব

টার্গেট ৮.ক: আইনসম্মত, উন্মুক্ত ও বৈষম্যহীন বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা;

টার্গেট ৮.খ: অনুন্নত দেশের বিশেষ প্রয়োজন চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

টার্গেট ৮.গ: দ্বীপদেশ এবং ভূ-বেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশসমূহের বিশেষ চাহিদা চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

টার্গেট ৮.ঘ: দীর্ঘমেয়াদে উন্নয়নশীল দেশসমূহের ঋণ সুবিধার স্থায়ীত্বশীলতা নিশ্চিতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

টার্গেট ৮.ঙ: ঔষধ কোম্পানীর সহযোগিতায় অত্যাবশ্যক ঔষধের সহজলভ্যতার ব্যবস্থা করা;

টার্গেট ৮.চ: নতুন প্রযুক্তি বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ সুবিধা বৃদ্ধিতে বেসরকারি খাতের সহায়তা বৃদ্ধি করা।

পরিচ্ছেদ ৬

প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নির্দেশনাসমূহের মূলকথা

বিষয় ১: বেসরকারি উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, পরিচালনা ও নিবন্ধন শর্ত ও নীতিমালা, ২০১০

স্থানীয় উদ্যোগে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও চালুর প্রাথমিক অনুমতি ও রেজিস্ট্রেশন প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার অনুমোদিত Bangladesh Registration of Private Schools Ordinance, 1962 (as amended by 2001) সংশোধিত নীতিমালার সারসংক্ষেপ নিচে দেয়া হলো:

ক. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক চিহ্নিত বিদ্যালয়বিহীন গ্রামসমূহে বিদ্যালয় স্থাপনকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। এ ক্ষেত্রে গ্রামটি বিদ্যালয়বিহীন এবং গ্রামের জনসংখ্যা কমপক্ষে ২০০০ জন হওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে।

খ. প্রস্তাবিত স্থানের দুই কিলোমিটারের মধ্যে অন্য কোনো প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকলে সেখানে নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যাবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই শর্ত শিথিলযোগ্য যেমন– যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক বাধা, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) জনের অধিক হলে।

গ. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত পরিপত্র অনুসারে গঠিত এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা শিক্ষা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি থাকতে হবে;

ঘ. বিদ্যালয়ে কমপক্ষে ৪ (চার) জন কাঙ্খিত শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক থাকতে হবে। যার মধ্যে অন্তত ২ (দুই) জন শিক্ষিকা হবেন। দুর্গম এলাকা যেমন– প্রত্যন্ত চরাঞ্চল, হাওড় অঞ্চল, চা-বাগান, আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় এই শর্ত শিথিলযোগ্য।

ঙ. বিদ্যালয়ে কমপক্ষে ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) জন ছাত্র-ছাত্রী থাকতে হবে। দুর্গম এলাকা, আদিবাসীঅধ্যুষিত এলাকার জন্য এই শর্ত শিথিলযোগ্য। তবে এক্ষেত্রে, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কমপক্ষে ৫০ (পঞ্চাশ) জন হতে হবে।

চ. আবেদনকারী বিদ্যালয়টিতে ১ম শ্রেণী হতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত এনসিটিবি নির্ধারিত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক ব্যবহৃত হতে হবে।

ছ. সরাসরি বিদ্যালয়ের নামে জমির দলিল ও নামজারি সংবলিত নির্ধারিত পরিমাণ জমি থাকতে হবে। তা ছাড়া, বিদ্যালয়ের নিজস্ব ঘর (দৈর্ঘ্য ৭০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট), ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেট, টিউবওয়েল ও খেলার মাঠ থাকতে হবে।

জ. উদ্যোক্তা কর্তৃক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা বিদ্যালয়ের স্থায়ী আমানত হিসাবে 'রিজার্ভ ফান্ডে' জমা রাখতে হবে।

ঝ. প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের সাধারণ সঞ্চয়ী আমানত হিসাবে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা এবং ৩ (তিন) বছর মেয়াদি স্থায়ী আমানত হিসেবে ১০,০০০/- (দশ হাজার)

টাকা থাকতে হবে। সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য পরিচালিত, পার্বত্য জেলাসমূহ এবং দুর্গম চর ও হাওড় অঞ্চলের বিদ্যালয়ের নামে সাধারণ সঞ্চয়ী আমানত হিসাবে ন্যূনতম ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা এবং ৩ বছর মেয়াদী স্থায়ী আমানত হিসাবে ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা থাকলে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দেয়া যাবে।

ঞ. বিভাগীয় উপ-পরিচালক কর্তৃপক্ষ হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রাথমিক অনুমতি/সিদ্ধান্ত অবহিত করবেন। প্রাথমিক অনুমতি প্রাপ্তির পরবর্তী ১ (এক) বছর সন্তোষজনকভাবে বিদ্যালয় পরিচালনার পর উদ্যোক্তাগণ রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে পারবেন। প্রাথমিক অনুমতিকে কোনক্রমেই স্থায়ী রেজিস্ট্রেশন হিসাবে গণ্য করা যাবে না।

ট. অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির ১ (এক) বছর পর অর্থাৎ ৩য় (তৃতীয়) বছরে স্থায়ী রেজিস্ট্রেশন প্রদান করার সময় বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী ও বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি ও ঝরে পড়ার হার, উপস্থিতি, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী চক্রের হার ইত্যাদি বিবেচনা করা হবে।

ঠ. অন্য সকল শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে ৫ (পাঁচ) বছর যাবৎ চালু বিদ্যালয়সমূহের ক্ষেত্রে, স্থায়ী রেজিস্ট্রেশন প্রদানের জন্য ১ (এক) বছর পর্যবেক্ষণের সময়সীমা শিথিলযোগ্য হবে।

ড. স্থায়ী রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পরবর্তীকালে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন প্রযোজ্য শর্তের ব্যত্যয় ঘটলে রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হবে।

বিষয় ২: শিক্ষক নিয়োগ

রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠরত দেশের প্রায় ৩৮ লক্ষ শিক্ষার্থীর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগপদ্ধতি পরিবর্তন করার জন্য সরকার ২০০৯ সালে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকার অনুমোদিত নিয়োগ পদ্ধতির পরিপত্রের সারসংক্ষেপ হলো:

পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি

রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে একটি নিয়োগ কমিটি গঠন করা হবে। গঠিত নিয়োগ কমিটি জেলার সকল রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণের জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সহায়তায় জেলার শূন্যপদের সংখ্যা নিরূপণ করবে। কমিটি প্রেরিত তালিকার উপর ভিত্তি করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে। দরখাস্ত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জমা প্রদান করতে হবে এবং সেখানে দরখাস্ত বাছাই করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারিত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখে কমিটি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। নিয়োগ কমিটির নিকট থেকে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ফলাফল পাওয়ার পর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর হতে নির্বাচিত প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে, যা সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সংরক্ষিত থাকবে। বিদ্যালয়সমূহের ইতোপূর্বে নিরূপিত সহকারী শিক্ষকের শূন্যপদে বা পরবর্তীতে কোনো বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য হলে উক্ত তালিকা হতে মেধাক্রম ও সংশ্লিষ্ট উপজেলার অধিবাসী হওয়ার ভিত্তিতে সরাসরি নিয়োগ দেয়া হবে। এ পরিপত্র জারির পরে ওই তালিকার বাইরে থেকে কোনো শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হলে তিনি এমপিওভুক্তির জন্য বিবেচিত হবেন না।

প্রার্থী নির্বাচন পদ্ধতি

১. চূড়ান্তভাবে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য ৮০ (আশি) নম্বরের নিখিত নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা এবং ২০ (বিশ) নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা, সর্বমোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত সময় ৮০ (আশি) মিনিট;

২. লিখিত পদ্ধতির পরীক্ষায় প্রশ্নের ধরন হবে মাল্টিপল চয়েস টাইপ। মোট প্রশ্নের সংখ্যা হবে ৮০ (আশি)টি। উত্তর দাতা প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ১ (এক) নম্বর পাবেন এবং প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ (দশমিক দুই পাঁচ) নম্বর কাটা যাবে। লিখিত পরীক্ষার পাশ নম্বর ৪০ নির্ধারিত থাকবে।

৩. লিখিত পরীক্ষায় বাংলা, অংক, ইংরেজী ও সাধারণ জ্ঞান প্রতি বিষয়ে ২০ নম্বর করে মোট ৮০ নম্বরের পরীক্ষা হবে।

৪. মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত ২০ (বিশ) নম্বরের মধ্যে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষার ফলাফলের উপর-৫, প্রকাশ ক্ষমতা/ব্যক্তিত্ব-৫, সাধারণ জ্ঞান-১০।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, প্রশ্নপত্র তৈরি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ ইত্যাদি কাজ কেন্দ্রীয়ভাবে সম্পাদন করবে। পরীক্ষার ব্যয় সাধারণভাবে পরীক্ষার্থীদের নিকট হতে গৃহীত পরীক্ষার ফি হতে নির্বাহ করা হবে। তবে, কোনো জেলায় অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে তা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর হতে প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এ পরিপত্র জারির পর এর আলোকে গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণ (সংশ্লিষ্ট উপজেলার স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্য হতে মেধাক্রম অনুসারে) ছাড়া অন্য কেউ রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকপদে নিয়োগ লাভের জন্য বিবেচিত হবেন না।

বিষয় ৩: স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি

১০/০৮/২০০৯ তারিখে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি গঠন ও এর পরিচালনা-সংক্রান্ত নীতিমালা জারি করা হয়। এর সারসংক্ষেপ হলো:

কমিটির গঠন–বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে সদস্য-সচিব করে, সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষক প্রতিনিধি ব্যতিরেকে অন্য সদস্যদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি এবং একজন সহ-সভাপতিসহ মোট ১২ সদস্যের ১টি কমিটি থাকবে। কমিটিতে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকের মধ্য থেকে ২জন মহিলা অভিভাবক থাকবেন। কমিটির মেয়াদ কাল ৩ (তিন) বৎসর। মেয়াদ শেষ হওয়ার ৬ মাস পূর্বে কমিটি ও উপজেলা/থানা সহকারী শিক্ষা অফিসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য:

১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও শিক্ষকদের দায়িত্ব পালনের উপর প্রতি বৎসর শিক্ষা অফিসার এর নিকট নির্ধারিত ছকে প্রধান শিক্ষক প্রতিবেদন (এসএমসি সভাপতির প্রতিস্বাক্ষরসহ) প্রেরণ করবেন;

২. বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকরণে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি স্থানীয়ভাবে সম্পদ সংগ্রহ ও সদ্ব্যবহারের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে। 'সম্পদ' বলতে জনসাধারণ কর্তৃক বিদ্যালয়ের উন্নয়নে স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বউদ্যোগে প্রদানকৃত জমি, ভবন, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, শিখন-শেখানো সামগ্রী, শিক্ষা উপকরণ, নগদ অর্থ ইত্যাদি বোঝাবে।

৩. বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি ও উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং বিদ্যালয়ত্যাগী শিশুদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ঝরে পড়া রোধে উদ্যোগ গ্রহণ;

৪. এসএমসি কর্তৃক বিদ্যালয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ : বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য-সচিব ও শিক্ষক প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য ৯ (নয়) জন সদস্য পর্যায়ক্রমে বিদ্যালয় চলাকালীন সার্বিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন। এ ক্ষেত্রে উক্ত ৯ (নয়) জন সদস্যের মধ্য থেকে পর্যায়ক্রমে ৪ (চার) জন সদস্য প্রতি মাসে ন্যূনতম ৬ (ছয়) দিন বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ করবেন।

৫. বিদ্যালয় ক্যাচমেন্ট এলাকার গমনোপযোগী বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর ভর্তিসহ অন্যান্য কাজে সহযোগিতা প্রদান;

৬. শিক্ষকদের মাসিক বেতন বিলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির প্রতিস্বাক্ষর গ্রহণ ও উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসে প্রেরণ;

৭. বিদ্যালয়গৃহ মেরামত, নতুন গৃহ নির্মাণ, আসবাবপত্র মেরামত এবং অন্যান্য সকল কাজের নিয়মিত তদারকি এবং রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;

৮. নির্ধারিত সময়ে পাঠ্যপুস্তক, শিখন-শেখানো সামগ্রী সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বিতরণ;

৯. বিদ্যালয়ে সহ শিক্ষা (co-curricular) কার্যক্রম যেমন, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ও পক্ষসহ বিভিন্ন দিবস পালন, স্কুলের বিভিন্ন কার্যক্রম সংগঠন ও সম্পাদনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান;

১০. বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় বিদ্যালয়ের সকল রেকর্ড ও রেজিস্টার পর্যালোচনা, সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ;

১১. ক্ষেত্রবিশেষে উপজাতীয় শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি ও নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে ৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট একাধিক পাড়া কমিটি গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ;

১২. বার্ষিক শিশু জরিপ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;

১৩. সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোনো দায়িত্ব পালন।

বিষয় ৪: উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি গঠন ১০/০৮/২০০৯

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি গঠন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গত ২৯/০৬/১৯৯৭ তারিখের প্রাগবি/প্রশা-৪/২চ-১/৯৭/৪৭০ নং প্রজ্ঞাপন এতদ্বারা বাতিল করে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি গঠন এবং এর পরিচালনা-সংক্রান্ত নীতিমালা জারি করা হয়। এর সারসংক্ষেপ নিচে দেয়া হলো:

কমিটির গঠন–এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্যকে উপদেষ্টা ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে কমিটির চেয়ারম্যান করে উপজেলার সরকারি-বেসরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং স্থানীয় শিক্ষানুরাগী নারী-পুরুষসহ মোট ১৮জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটির মেয়াদকাল হবে ৩ বছর।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হবে নিম্নরূপ:

১. উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক অবস্থা ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

২. সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসারগণ কর্তৃক প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শিত হচ্ছে কি না, তা পরিবীক্ষণ;

৩. উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ছাত্র/ছাত্রীর ভর্তির হার বৃদ্ধি, ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়া রোধ, ৬-১০ বছর বয়সী সকল শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, শিশু জরিপের সঠিকতা যাচাই ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা এবং এগুলো সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪. উপজেলার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী সুপারিশ প্রদান;

৫. প্রচলিত নীতিমালার আলোকে বিদ্যালয় এমপিওভুক্তি এবং শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়াদি যাচাই করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

৬. উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়নকল্পে বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও মেরামতের জন্য অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন;

৭. যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

বিষয় ৫: মহানগর প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি

১০/০৮/২০০৯

মহানগর প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি গঠন এবং কমিটির দায়িত্ব-কর্তব্য সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গত ১১/১২/২০০৭ তারিখের প্রাগম/বিদ্যা-১/দাবী দাওয়া/০৫(১)/৯৫নং প্রজ্ঞাপন এতদ্বারা বাতিল করে মহানগর প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি গঠন ও এর পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা জারি করা হয়। এর সারসংক্ষেপ হলো:

কমিটির গঠন–বিভাগীয় উপ-পরিচালককে (প্রাথমিক শিক্ষা) চেয়ারম্যান করে, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে ও মহানগরের সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিদের নিয়ে মোট ১৪জন সদস্য নিয়ে মহানগর প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি গঠন করতে হবে। এর কার্যকাল ৩ বছর।

মহানগর প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী নিম্নরূপ হবে:

ক. মহানগরের প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক অবস্থা ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

খ. প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শিত হচ্ছে কি না তা পরিবীক্ষণ;

গ. প্রয়োজনবোধে কমিটির সদস্যগণ একক অথবা যৌথভাবে মহানগর এলাকার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট দাখিল করবেন;

ঘ. ছাত্র/ছাত্রীর ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি, ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়া রোধ, ৬-১০ বৎসর বয়সী সকল শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান নিশ্চিতকরণ, শিশু জরিপের সঠিকতা যাচাই ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা এবং এগুলো সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ. প্রাথমিক বিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী সুপারিশ প্রদান;

চ. বিদ্যালয় এমপিওভুক্তি এবং শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়াদি যাচাই করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

ছ. মহানগর এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়নকল্পে বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও মেরামতের জন্য অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন;

জ. মহানগর এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়বিহীন এলাকা চিহ্নিত করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাহিদা নিরুপণ করতঃ বিদ্যালয় স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে স্থান নির্ধারণ এবং এ বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ।

বিষয় ৬: আঞ্চলিক পরিবেশ ও জলবায়ু, স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, জনগণের জীবন-জীবিকা ও কৃষ্টির সাথে সঙ্গতি রেখে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণী পাঠদানের বিদ্যমান সময়সূচি এবং বার্ষিক অবকাশকাল পুনর্নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

০৩/০৫/২০০৯

উল্লিখিত বিষয়ের আলোকে দেশের সরকারি, রেজিস্টার্ড বেসরকারি ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের জন্য শ্রেণী পাঠদান সময়সূচি সাধারণভাবে সকাল ৮.৩০ হতে ৩.১৫ নির্ধারণ করা হয়। এ বিষয়ে মহানগর ও ঢাকার বাইরের কোনো এলাকার বিদ্যালয়সমূহ গত ১৭ই এপ্রিল ২০০৮-এ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক জারিকৃত পরিপত্রের আলোকে যদি অন্য কোনো পাঠদান সময়সূচি অনুসরণ করতে আগ্রহী হয়, তবে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সম্মতিক্রমে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সে সংক্রান্ত আদেশ জারি করতে পারবেন। তবে, এ ক্ষেত্রে উক্ত শ্রেণী পাঠদানের সময়সূচি ন্যূনতম একটি সমগ্র উপজেলার জন্য প্রযোজ্য হতে হবে। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, দুই শিফটে পরিচালিত বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ১ম ও ২য় শিফটের জন্য নির্ধারিত বিদ্যমান সময়ের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করা যাবে না।

বিদ্যালয়সমূহের বার্ষিক অবকাশ সময়সূচি নির্ধারণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও সার্কুলারের ২ (গ) অনুচ্ছেদ-এর শর্তসাপেক্ষে জেলা প্রশাসকের সম্মতি নিয়ে এবং মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পূর্বানুমোদন নিয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আদেশ জারি করতে পারবেন।

বিষয় ৭: শিশু শিক্ষার্থীদের প্রতি যথাযথ আচরণ নিশ্চিতকরণ

২১/০৪/২০০৮

১. দেশের জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ ৫-১০ বৎসর বয়স সীমার অন্তর্গত। মূলত এ বয়সের শিশুরাই বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষায়তনের ছাত্র-ছাত্রী হিসাবে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

২. শিক্ষা মনোবিজ্ঞান অনুসারে প্রাক-জন্মাবস্থা থেকেই শিশুর বিকাশের ধারা শুরু হলেও সাধারণভাবে শৈশবকালকে মানুষের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আবেগিক বিকাশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এ সময়েই ব্যক্তি জীবনের সার্বিক বিকাশের ভিত্তি রচিত হয়। সুতরাং শিশুর সুষ্ঠু বিকাশে সহায়তা প্রদানের জন্য পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বিশেষ সচেতন প্রয়াস প্রয়োজন।

৩. অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক পর্যায়ে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের যথাক্রমে অভিভাবক ও শিক্ষক কর্তৃক শারীরিক ও মানসিকভাবে বিভিন্ন মাত্রায় লাঞ্ছিত করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এতে শিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় এবং এর ফলে শিশুদের উপর বিভিন্ন মনোদৈহিক বিরূপ ও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। উল্লেখ্য, দেশের প্রচলিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুযায়ী শিশুদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৪. বর্ণিত অবস্থায়, দেশে বিদ্যমান সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিশু শিক্ষার্থীদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, কঠোরতা ও তিরস্কারসহ সকল প্রকার অবাঞ্ছিত আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় এ বিষয়ে পারিবারিক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানানো হলো।

বিষয় ৮: প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র–ছাত্রীদের শারীরিক শাস্তি প্রদান

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি প্রদান কিংবা মানসিকভাবে লাঞ্চিত করার বিষয়টি অনতিবিলম্বে বন্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী বলে বিবেচিত হওয়ায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ২২ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে একটি পরিপত্র জারি করা হয়। পরিপত্রটির নির্দেশনার সারসংক্ষেপ হলো:

- প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শারীরিক শাস্তি প্রদান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হলো;
- শারীরিক শাস্তি প্রদান অসদাচরণ হিসেবে গণ্য করা হবে;
- মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর শারীরিক শাস্তি প্রদানকারীগণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এবং ১৯৭৪ সালের শিশু আইন অনুযায়ী ব্যাবস্থা নেবেন; এবং ক্ষেত্রমতে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে মাঠপর্যায়ে সংশ্লিষ্টগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন;
- প্রধান শিক্ষকগণ নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি প্রদান বন্ধের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি শারীরিক/মানসিক শাস্তি প্রদানকারী শিক্ষকগণকে চিহ্নিত করে বিধি মোতাবেক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
- পরিদর্শন কর্মকর্তাগণ পরিদর্শনকালে শারীরিক/মানসিক শাস্তি প্রদানের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং এ বিষয়ে পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করবেন।

বিষয় ৯: 'প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি (২য় পর্যায়)' প্রকল্পের উপবৃত্তি বিতরণ-সংক্রান্ত সংশোধিত নির্দেশাবলী-২০১০ এর সংশোধনী প্রসঙ্গে।

২৬/০৯/২০১০

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, 'প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি (২য় পর্যায়)' প্রকল্পের উপর গত ১১ আগষ্ট ২০১০ তারিখে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপবৃত্তি বিতরণ সংক্রান্ত সংশোধিত নির্দেশাবলী-২০১০ এর অনুচ্ছেদ ২, ৪.৩ এবং ৭.২.৩-এর বিষয়ে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত হয়:

ক্রমঃ	বিদ্যমান নীতিমালা	সংশোধিত নীতিমালা
১	উপবৃত্তি বিতরণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলীর ২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দরিদ্র পরিবার বলতে নিম্নোক্ত শ্রেণীভুক্ত পরিবারকে বুঝানো হয়েছে– ক) দুঃস্থ বিধবা মহিলার পরিবার; খ) দিনমজুর; গ) অস্বচ্ছল চাকুরিজীবী, অস্বচ্ছল পেশাজীবি যেমন- জেলে, কুমার, কামার, তাঁতী, মুচী ইত্যাদি;	১১/০৮/২০১০ তারিখের স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, দরিদ্র পরিবার বলতে নিম্নোক্ত শ্রেণীভুক্ত পরিবারকে বুঝায় - ক) দুঃস্থ বিধবা মহিলার পরিবার; খ) দিন মজুর; গ) অস্বচ্ছল চাকুরিজীবী, অস্বচ্ছল পেশাজীবী, যেমন- জেলে, কুমার, কামার, তাঁতী, মুচী ইত্যাদি;

ক্রমঃ	বিদ্যমান নীতিমালা	সংশোধিত নীতিমালা
	ঘ) ভূমিহীন/০.৫০ একর পর্যন্ত জমির মালিক; ঙ) অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীর পরিবার; চ) অস্বচ্ছল উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীর পরিবার। উপবৃত্তি বিতরণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলীর ৪.৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী–	ঘ) অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীর পরিবার; ঙ) অস্বচ্ছল উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীর পরিবার।
২	তালিকাভুক্ত (১ম শ্রেণী ব্যতীত) সকল শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীকে বার্ষিক পরীক্ষায় গড়ে কমপক্ষে ৪০% নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। তবে পাহাড়ী এলাকার শিক্ষার্থী এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা বার্ষিক পরীক্ষায় ৩৩% নম্বর পেলেও উপবৃত্তি পাবে। বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে উপবৃত্তি পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবে না।	১১/০৮/২০১০ তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল শ্রেণীর (১ম শ্রেণী ব্যতিত) ছাত্র-ছাত্রীকে বার্ষিক পরীক্ষায় ৩৩% নম্বর পেতে হবে। বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে কোনো ছাত্র/ছাত্রী উপবৃত্তি পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবে না।
৩	উপবৃত্তি বিতরণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলীর ৭.২.৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ছাত্রছাত্রীগণ যাতে বার্ষিক পরীক্ষায় গড়ে ৪০% নম্বর অর্জন করে সেজন্য ছাত্র/ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদেরকে উৎসাহিত ও সতর্ক করবে।	১১/০৮২০১০ তারিখের স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে বার্ষিক পরীক্ষায় ৩৩% নম্বর অর্জন করে সে জন্য ছাত্র/ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদেরকে উৎসাহিত ও সতর্ক করবে।

এমতাবস্থায়, গত ১৩ জানুয়ারী ২০১০ তারিখে প্রাগম/পরি-২/উপবৃত্তি-২য়/স্টিয়ারিং কমিটি/৭০/০৯/১১ নম্বর স্মারকে জারিকৃত উপবৃত্তি বিতরণ সংক্রান্ত সংশোধিত নির্দেশাবলী, ২০১০- এর অনুচ্ছেদ ২, ৪.৩ এবং ৭.২.৩ নং এর উপর্যুক্ত সংশোধনী অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হয়।

বিষয় ১০: প্রাথমিক বিদ্যালয় স্টুডেন্ট কাউন্সিল এর পরিচিতি

২০১০ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্টুডেন্ট কাউন্সিল গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষার মান বৃদ্ধি ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করা।

স্টুডেন্ট কাউন্সিল গঠন-প্রত্যেক স্টুডেন্ট কাউন্সিলে ৭ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকবে। ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা নির্বাচনে প্রার্থী হবে। প্রত্যেক শ্রেণী থেকে কমপক্ষে ২ জন প্রতিনিধি থাকবে। কাউন্সিলের প্রথম সভায় প্রতি শ্রেণী থেকে (১ম থেকে ৫ম) ২ জন করে সহযোগী সদস্য মনোনীত হবে। স্টুডেন্ট কাউন্সিলের মেয়াদ হবে ১ বছর। প্রতি বৎসর জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে স্টুডেন্ট কাউন্সিলের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রধান শিক্ষক নির্বাচনের ১০ দিন পূর্বে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করবেন। ৩য় শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা ভোটার হবে।

স্টুডেন্ট কাউন্সিলের সভা-স্টুডেন্ট কাউন্সিল নির্বাচনের ৭ দিনের মধ্যে প্রথম সভা করবে। এই সভায় স্টুডেন্ট কাউন্সিলের প্রধান প্রতিনিধি নির্বাচন করা হবে। প্রতি শ্রেণী থেকে (১ম থেকে ৫ম) ২ জন করে সহযোগী সদস্য মনোনীত করা হবে। এছাড়াও কর্মবন্টন করা হবে। বিশেষ জরুরি প্রয়োজনে বিশেষ সভা আহ্বান করতে পারবে। কোনো বিষয়ে সবাই একমত হতে না পারলে বেশির ভাগ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। প্রতি ৬ মাস পর সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে স্টুডেন্ট কাউন্সিলের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সকলে মতামত দেবে।

নিচের প্রধান ৭টি কার্যক্রমের দায়িত্বে নির্বাচিত ৭ জন প্রতিনিধি থাকবে। যেমন :

১. পরিবেশ;

২. পুস্তক এবং শিখন সামগ্রী;

৩. স্বাস্থ্য;

৪. ক্রিয়া ও সংস্কৃতি;

৫. পানি সম্পদ;

৬. বৃক্ষরোপণ ও বাগান তৈরি;

৭. অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন।

স্টুডেন্ট কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে সহযোগিতা নেয়া যাবে। এ ছাড়াও স্টুডেন্ট কাউন্সিল শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য নিচের কাজগুলি করবেঃ

১. শিখন-শিখানো কার্যক্রমে অর্থাৎ শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে শিক্ষকমন্ডলীকে সহায়তা করবে;

২. বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি ও ঝরে পড়া রোধে সহযোগিতা করবে;

৩. শিখন শিখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে অভিভাবকরদের সম্পৃক্ত করবে;

৪. বিদ্যালয়ে পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে; শিক্ষক ও অভিভাবকগণ যাতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য একে অপরকে সহযোগিতা করে–তা নিশ্চিত করার জন্য স্টুডেন্ট কাউন্সিল সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে।

(তথ্যসূত্রঃ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রণীত 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্টুডেন্ট কাউন্সিল ম্যানুয়াল')

পরিচ্ছেদ ৭

অধিকারভিত্তিক বিদ্যালয় এবং মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা : সম্ভাব্য করণীয়

শিক্ষা অধিকারের সাংবিধানিক, আইনগত ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সম্পর্কে আমরা অবহিত হয়েছি। এ দিকগুলো বিশ্লেষণ করতে যেয়ে এটাও জানতে পেরেছি যে, কীভাবে এই শিক্ষা-অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। আর তাই স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সামনে প্রশ্ন– শিক্ষা অধিকার লঙ্ঘন কাটিয়ে উঠতে কী করা যেতে পারে? কারণ, মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে আমরা যারা শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করছি, এটা তাদের জন্য একটা বড় সমস্যা। আমাদের জন্য সুবিধার দিক হলো, এ বিষয়ে কাজ করার পূর্ণ অধিকার আমাদের আছে, যার যৌক্তিক ও আইনগত ভিত্তি সম্পর্কে আমরা জেনেছি ও অন্যকে জানাতে পারছি।

মানসম্পন্ন মৌলিক শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আলোচনা-পর্যালোচনা, সেমিনার, কর্মশালা, মতবিনিময় ও বিতর্ক হয়েছে। একশনএইড বাংলাদেশ এবং এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো এরকম একাধিক কার্যক্রমে অংশ নিয়েছে, যার মধ্য থেকে করণীয় দিকগুলোর কিছু সম্ভাব্য পরামর্শমূলক নির্দেশনা বেরিয়ে এসেছে। আমরা সেসবের আলোকে এখানে কিছু বিষয় উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি, যা শুধু একশনএইড বাংলাদেশের সহযোগীদের নয়; বরং শিক্ষাবিষয়ে আগ্রহী প্রত্যেকের জন্য সহায়ক হবে। এ সম্পর্কিত যেকোনো মতামত বা পরামর্শ একশনএইড বাংলাদেশ সানন্দে গ্রহণ করবে।

পরিচ্ছেদ ৭.১: স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা-অধিকারের বুনিয়াদ তৈরি করা এবং এর বিশ্লেষণ-কাঠামো

যদিও শিক্ষা-অধিকারের কথা বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও আইনে পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে, তবে যাদের এ অধিকার ভোগ করার কোনো অভিজ্ঞতা হয় নাই; কিংবা যারা এমনকি জানেনইনা যে, আদৌ তাদের জন্য এ ধরনের কোনো অধিকার রয়েছে, তাদের কাছে অধিকার কথাটি মূল্যহীন। তাঁরা সংবিধান সম্পর্কে অসচেতন অথবা কীভাবে আইনসম্মতভাবে এটি বলবৎ করা যায় তা-ও জানে না। স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা অধিকারের বুনিয়াদ তৈরি করার অর্থ হলো, এই ধারণাটিকে বাস্তবে রূপ দান করা। অর্থাৎ বিদ্যমান শিক্ষা অধিকারগুলো চিহ্নিত করা এবং স্থানীয় জনসাধারণ যাতে করে তাদের শিক্ষা অধিকারকে বাস্তবায়িত করতে পারে, তার জন্য তাদের কী কী করা দরকার তা চিহ্নিত করা।

প্রস্তুতিমূলক কাজ

১. এই কাজের প্রথম পদক্ষেপ হলো, অধিকারবিষয়ক সচেতনতা তৈরি করা। জনসাধারণকে জানাতে হবে যে, তাঁদের অধিকার রয়েছে এবং তা লঙ্ঘন করা হচ্ছে– এই জানাটাই অধিকার আদায়ের প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হতে জনগণের আগ্রহ তৈরিতে সহায়তা করবে। 'আপনার অধিকার রয়েছে'– একথাটি তাঁদের জানানোর অর্থ হলো, তাঁদের ক্ষমতায়ন করা।

২. দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো, অধিকারকে স্থানীয় পর্যায়ে অর্থবহ করে তোলা। এর অর্থ হলো, সংবিধানে অধিকারবিষয়ে যা রয়েছে তা জানা এবং অধিকার আদায়ের জন্য সংবিধানে কী বলা হয়েছে এবং আরও কী কী থাকা প্রয়োজন তা চিহ্নিত করা।

৩. তৃতীয় পদক্ষেপ হলো, জনগণের দক্ষতা, জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা, যাতে তাঁরা সরকারকে তার দায় দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে দায়বদ্ধ করতে পারে; শিক্ষায় অধিকার নিশ্চিত করতে পারে।

আপনার এলাকার শিক্ষা অধিকারের স্ট্যাটাসের উপর নির্ভর করে নিচের আইডিয়াগুলোকে কাজে লাগানো ও তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাজানো প্রয়োজন।

'অধিকার প্রাপক' এর কাছে শিক্ষা অধিকার পরিচিত করানো

একটি ইস্যুতে সচেতনতা তৈরি করার অনেক পথ রয়েছে। কোন ইস্যুতে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত সেটি নির্ভর করবে এ বিষয়ে আপনার যোগাযোগ ক্ষমতা এবং ইস্যুভিত্তিক কর্মসূচির আকার ও প্রকৃতির উপর। ভারতের একটা উদাহরণ থেকে দেখা যায়, একটি চলমান ক্যারাভান পথনাটক ব্যাবহার করে ভারতের একটা প্রদেশে তারা শিক্ষা অধিকারের উপর সচেতনতা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। পথ নাটক ছাড়াও কমিউনিটি মিটিং পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন এবং এর মাধ্যমে স্কুল ও স্থানীয় দলের মধ্যে সর্ম্পক স্থাপন করা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ের এই কাজে পরিষ্কারভাবে জানাতে হবে যে, সবার শিক্ষায় অধিকার রয়েছে এবং সরকারের দায়িত্ব এই অধিকার প্রদান করা। জনগণের ক্ষমতায়ন ও তাঁদের দ্বারা অধিকার দাবি করার জন্য কী কী অধিকার আছে, সে সম্পর্কে সচেতন করা প্রয়োজন।

শিক্ষা অধিকার অর্থবহ করে তোলা এবং শিক্ষা অধিকার বিশ্লেষণ কাঠামো (4A):

শিক্ষা অধিকারকে বিভিন্ন আঙ্গিকে ও মাত্রায় বিচার করার জন্য জনগণকে সহায়তা করতে এই 4A কাঠামোটি তৈরি করা হয়েছে।[১] অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে এই কাঠামো শিক্ষা অধিকার বলতে জনগণ কী বুঝায় তাদেরকে তা বুঝতে ও চিন্তা করতে সহায়তা করবে। এর মাধ্যমে শিক্ষা অধিকারের সাথে বিদ্যমান বাস্তবতার ফারাক কতটুকু তাও চিহ্নিত করা সহজ হবে।

4A -কে সংক্ষেপে এভাবে ব্যখ্যা করা যায়:

- **Availability (সহজলভ্যতা)**–শিক্ষা সরকারি খরচে চলবে এবং এটি সকলের জন্য হবে অবৈতনিক। শিক্ষাসেবা প্রদান করার জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুযোগ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকবে।

- **Accessibility (সহজগম্যতা)**–এই শিক্ষাপ্রক্রিয়া হবে বৈষম্যহীন এবং সকলের জন্যে সহজগম্য। এতে সবচেয়ে অসুবিধাগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

- **Acceptability (গ্রহণযোগ্যতা)**–শিক্ষার সূচি হবে প্রাসঙ্গিক, বৈষম্যহীন এবং সংস্কৃতিগতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও মানসম্মত; স্কুলগুলো হবে শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ এবং শিক্ষকগণ হবেন পেশাগত দক্ষতায় পারদর্শী।

- **Adaptability (অভিযোজনক্ষমতা)**–পরিবর্তিত সামাজিক চাহিদার সাথে খাপ খাইয়ে শিক্ষা বিবর্তিত হবে; তা অসমতাকে চ্যালেঞ্জ ও মোকাবেলা করতে সহায়তা করবে, যেমন– জেন্ডার-বৈষম্য। অধিকন্তু তা স্থানীয় প্রেক্ষাপটে সুনির্দিষ্ট চাহিদা পূরণে রদবদল করা যাবে।

4A এর উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণ

নিচে প্রদত্ত শিক্ষা অধিকার ডায়াগ্রাম এর মাধ্যমে 4A ব্যবহার করে আপনি স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন এবং স্থানীয় গ্রুপের সাথে কাজ করে শিক্ষার অবস্থা মূল্যায়নের জন্যে সুনির্দিষ্ট প্রকার চিহ্নিত করতে পারবেন। এটি সদ্য প্রয়াত শিক্ষা অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের প্রাক্তন বিশেষ প্রতিবেদক Katarima Tomasevoski দ্বারা প্রণীত। নিচে প্রদত্ত এই ডায়াগ্রাম শিক্ষার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছে। প্রথম চক্রে দেখানো হয়েছে সে সকল ইস্যু,

---

[1] Developed by Katarina Tomasevski, former UN Special Rapporteur on the Right to Education

শিক্ষা অধিকারের আইনগত ভিত্তি জানা ও উপলব্ধি করা

স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা অধিকার নিয়ে কাজ করার পূর্বে কিছু প্রারম্ভিক গবেষণা করা গুরুত্বপূর্ণ। যদিও শিক্ষা অধিকার সর্বজনীন কিন্তু জাতীয় সংবিধান ও আইনে যেভাবে এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়, তাতে ভিন্নমাত্রা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এর ফলে অধিকারগুলো জাতীয়ভাবে বলবৎ করার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, রাষ্ট্র আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোনো কোনো চুক্তি দেশের জন্য অনুমোদন করতে পারে, আবার নাও করতে পারে। যেমনঃ জাতীয় সংবিধান শিক্ষা অধিকার বলবৎ করেনি। তাই অধিকার প্রাপ্তির বর্তমান অবস্থা এবং সংবিধান ও জাতীয় আইনের মধ্যে সে অধিকারের বিষয়গুলো কতটা বিস্তারিত বলা হয়েছে, তার উপর নির্ভর করে আপনাদের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়ন কীভাবে করতে হবে।

যার মাধ্যমে শিক্ষাকে ব্যক্তি অথবা দলের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায়। দ্বিতীয় চক্রে এমন সব উপাদান আছে, যার মাধ্যমে শিক্ষাকে সবার কাছে সহজপ্রাপ্য করা যায়। তৃতীয় চক্রের উপাদানসমূহ শিক্ষায় সকলের সহজগম্যতার বিষয়টি তুলে ধরেছে। চতুর্থ চক্রে অভিযোজন বা খাপ খাওয়ানোর বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে। 'শিক্ষাকে আমাদের কাছে সহজলভ্য করার জন্য কী করতে হবে?'–এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মধ্য দিয়ে শিক্ষা কর্মীদল এরকম আরও নতুন নতুন উপাদান এবং শিক্ষা অধিকারের পূর্বশর্ত চিহ্নিত করতে পারবেন। এরকমভাবে সহজগম্যতা, সহজলভ্যতা ও অভিযোজন ক্ষমতা বিষয়ে প্রশ্ন করে তাঁরা নতুন নতুন উপাদান চিহ্নিত করে নিতে পারবেন।

অভিযোজন ক্ষমতা বিবেচনা করে কর্মীদলকে বর্তমান বাস্তবতার আলোকে এমন ইস্যু বিবেচনা করতে হবে, যা শিক্ষার উপর প্রভাব ফেলতে পারবে (এ প্রভাব হতে পারে শিক্ষার উপর নেতিবাচক প্রভাব, এবং সেক্ষেত্রে শিক্ষা অধিকার অর্জনের জন্য কী করা দরকার তা ভেবে বের করতে হবে)। এ ডায়াগ্রাম ব্যবহার করলে শিক্ষাদল শিক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করে এমন বাস্তব অবস্থার সাথে আদর্শিক অবস্থার তুলনা করতে পারবেন। তখন বোঝা যাবে, কোন কোন বিষয়ে সামঞ্জস্য রয়েছে এবং কোন কোন বিষয়ে বৈসাদৃশ্য রয়েছে। তখন তারা বিশ্লেষণ করতে পারবেন, কেন এই বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। এ বৈসাদৃশ্য দূর করার জন্য কৌশল কী হবে তাও নির্ধারণ করতে পারবেন।

শিক্ষা-অধিকার ডায়াগ্রাম

Acceptability (গ্রহণযোগ্যতা)

- প্রাসঙ্গিক
- বহুমাত্রিক
- মানসম্মত শিক্ষা
- মানসম্মত পাঠদান বা শিখন -শেখানো প্রক্রিয়া

Availability (সহজলভ্যতা)

- নিরাপদ স্কুলভবন
- গ্রামভিত্তিক বিদ্যালয়
- পর্যাপ্ত শিক্ষক
- বিনামূল্যে পাঠ্যবই ও ইউনিফরম
- স্যানিটেশন সুবিধা -স্কুলে আসাযাওয়ার রাস্তা বা যুৎসই যানবাহন

Accessibility (সহজগম্যতা)

- শিশুশ্রম-মুক্ত পরিবেশ
- কেনো জেন্ডার-বৈষম্য নেই

- প্রতিবন্ধীদের প্রতি কোনো বৈষম্য নেই
- সবচেয়ে অসুবিধাগ্রস্তদের স্কুলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ইতিবাচক কর্মসূচি বিদ্যমান
- স্কুলের দূরত্ব নাগালের মধ্যে

Adaptability (অভিযোজনক্ষমতা)

- শিশুদের বিশেষ চাহিদার সাথে
- স্থানীয় প্রেক্ষিতের সাথে
- সমাজের পরিবর্তিত চাহিদার সাথে খাপ খাওয়াতে হবে
- জেন্ডারসমতা প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে সক্ষম হতে হবে।

4A নামক বিশ্লেষণ কাঠামোকে ঘিরে আরও বিস্তারিত দিক খুঁজে বের করা ছাড়াও স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষার অবস্থা কেমন তা বিশ্লেষণ করার জন্য মুক্ত আলোচনা পরিচালনা করা প্রয়োজন। এটি স্থানীয় জনগণকে শুধু বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে শিক্ষাকে দেখতে সাহায্য করবে তা-ই না; বরং শিক্ষা-অধিকার কেন জরুরি তা বুঝতে তাঁদেরকে সাহায্য করবে। শিক্ষার বর্তমান অবস্থা জানা ও কাঙ্খিত ভবিষ্যৎ নির্ধারণ ও শিক্ষা-অধিকার নিশ্চিত করতে তাঁদেরকে কাজের পরিকল্পনা করায় সাহায্য করবে।

মুক্ত আলোচনার জন্য প্রশ্নের ধরন নিচের মতো হতে পারে:

- শিক্ষা অধিকার ডায়াগ্রামে যে সকল উপাদান দেখানো হয়েছে, তার তুলনায় আমাদের এলাকার বর্তমান শিক্ষাচিত্র কেমন? এটি ছেলে ও মেয়ের মধ্যে কী ধরনের প্রভাব ফেলেছে; ছেলে-মেয়েতে কোনো পার্থক্য আছে কি? গ্যাপগুলো কী কী? এই গ্যাপগুলো কেন রয়েছে? উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হয়তো কোথাও স্কুল রয়েছে কিন্তু সেখানে কোনো উপযুক্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নেই। অথবা স্কুলের খরচের কারণে অনেকে স্কুলে যেতে পারে না। এ ক্ষেত্রে এটি জানা জরুরি যে, খরচগুলো কে নির্ধারণ করছে, স্যানিটেশন সম্পর্কে কে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, ইত্যাদি।
- সময়ের আবর্তে এলাকার শিক্ষা-পরিস্থিতির কী পরিবর্তন হয়েছে? উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শিক্ষা হয়তো অবৈতনিক কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার অন্যান্য খরচ বেড়ে গেছে। কীভাবে শিক্ষার মান বেড়েছে বা কমেছে? কেন এগুলো ঘটেছে বা ঘটছে?
- আমরা কি আমাদের ছেলে ও মেয়ে শিশুদের স্কুলে পাঠাই? কেন পাঠাই বা পাঠাইনা? এখানে কি নির্দিষ্ট কোনো জনগোষ্ঠী রয়েছে যাদেরকে শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি?
- কারা শিক্ষা অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে? কীভাবে? তাঁদের কাছে শিক্ষাকে সহজলভ্য করতে হলে কী করতে হবে? বিশেষ দলের জন্য কি বিশেষ কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে? উদাহরণস্বরূপ, পাঠদান কি একটি মাত্র ভাষায় পরিচালিত হয়, যার কারণে সংখ্যালঘুরা বঞ্চিত হচ্ছে?
- শিক্ষা আমাদের এবং আমাদের কমিউনিটিতে কীভাবে উপকারে আসে? এটি কি নারী-পুরুষ বা ছেলে-মেয়েদের জন্য আলাদা উপকার বয়ে আনে, কীভাবে? কেন শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ? শিক্ষার মাধ্যমে আমরা কী অর্জন করতে চাই?
- শিক্ষা-অধিকার বাস্তবায়নের জন্য আমরা কী করতে পারি? সকল শিশুর জন্য কী ধরনের জেন্ডার-সমতা ও ক্ষমতা-সম্পর্কের বিষয়ে আমাদের সচেতন থাকতে হবে?

এই শেষ প্রশ্নের উত্তরে নানা ধরনের কাজ হাতে নিতে হবে; যা স্থানীয় পর্যায়ে প্রযোজ্য হতে পারে অথবা জাতীয় পর্যায়েও প্রযোজ্য হতে পারে। শিক্ষা-অধিকার বিস্তৃত করার জন্য শিক্ষাদলকে স্থানীয় পর্যায়ে আরও গবেষণা করতে হতে পারে অথবা তথ্য-অধিকার বিষয়ে অফিসিয়াল তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন হতে পারে। এটি তাঁদের বিশ্লেষণকে নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক করতে সহায়ক হবে এবং কোথায় ও কীভাবে অধিকার হরণ হচ্ছে তাঁদেরকে তা বুঝতে সহায়তা করবে। নিচের বক্সে যে প্রশ্ন রয়েছে তা এ প্রক্রিয়াকে গাইড করতে সহায়তা করবে। উপরন্তু শিক্ষার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে যেসব উপাদান নির্ধারণ করা হয়েছে, তার সাথে জাতীয়ভাবে যে উপাদানের কথা বলা আছে তার তুলনা

করতে সহায়তা করবে। এটি করার মাধ্যমে শিক্ষাদল এই গ্যাপ বের করতে পারবে যে, আইনে কী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং বাস্তবে কী দেয়া হচ্ছে অথবা নিকট-বর্তমানে কী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং শিক্ষা-অধিকার বাস্তবে রূপ দিতে ভবিষ্যতে কী করা প্রয়োজন হবে?

প্রশ্ন

নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে স্থানীয় কর্মীদল শিক্ষা বিষয়ে স্থানীয় বাস্তবতা কী তা বুঝতে পারবেন। তাঁরা প্রয়োজনে 'A'-এর নানা প্রশ্ন বা নির্দেশক স্থানীয় প্রেক্ষিতে সাজিয়ে নিতে এবং স্থানীয় জরিপ কাজে তা ব্যবহার করতে পারবেন। এর মাধ্যমে শিক্ষা-অধিকার পাওয়ার আকাঙ্খা বাস্তবে পরিণত করা যাবে।

শিক্ষায় Availability ও Accessibility'র অবস্থা পর্যালোচনা করা

Availability (সহজলভ্যতা)

- প্রাথমিক শিক্ষা কি অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক?
- যদি না হয়, তাহলে সরকারের কি একটি যৌক্তিক সময় ও বাজেটের মধ্যে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পরিকল্পনা রয়েছে?
- সকল শিশুর জন্য কি পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ রয়েছে, যাতে করে সবাই প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করতে পারবে?
- মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা অবৈতনিক করার জন্য রাষ্ট্র কি সুনির্দিষ্ট কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে?
- শিক্ষকগণ কি ভালোভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, তাঁরা কি স্থানীয়পর্যায়ের চাহিদামতো বেতন পাচ্ছে, তাঁদের কী কাজের যথাযথ পরিবেশ রয়েছে, শিক্ষণ-উপকরণ আছে? তাঁদের কি সংগঠিত হওয়ার অধিকার আছে?
- স্কুল বিল্ডিং কি নিরাপদ? তাতে কি স্যানিটেশন সুবিধা রয়েছে? এখানে কি নিরাপদ পানিয় জলের ব্যবস্থা আছে? পাঠাগার, আইসিটি উপকরণ আছে?

Accessibility (সহজগম্যতা)

- কোনো জনগোষ্ঠির প্রতি বৈষম্য ব্যতিরেকে শিক্ষায় কি সকল শিশুর সহজগম্যতা রয়েছে? উদাহরণ স্বরূপঃ নৃতাত্তিক ভিন্নতা, গায়ের রঙ, জাতীয়তা, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, অর্থনৈতিক অথবা সামাজিক অবস্থান বিবেচনায় কেউ বঞ্চিত হচ্ছে কি না? সবচেয়ে অসুবিধাগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কি? এমন কোনো আইন রয়েছে কি যেমন: শিশুশ্রম নিষিদ্ধ আইন, যা সহজগম্যতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন?
- শিক্ষাকেন্দ্র বা স্কুল কি নিরাপদ দুরত্বের মধ্যে? তাদের জন্যে কি পর্যাপ্ত উপযুক্ত রাস্তা ও যানসুবিধা রয়েছে?
- শিক্ষার সকল খরচ যোগান দেয়া কি সকল শিশুর পক্ষে সম্ভব (এর মধ্যে রয়েছে পরোক্ষ খরচ যেমন–পাঠ্যবই ও ইউনিফরম)?
- এখানে কি সকল আইনগত ও প্রশাসনিক বাধা দূর করা হয়েছে যেমনঃ জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেট ইত্যাদি?

শিক্ষায় Acceptability ও Adaptability'র অবস্থা পর্যালোচনা

Acceptability (গ্রহণযোগ্যতা)

- শিক্ষা কি বহুমাত্রিক? এটি কি ধর্মীয় বা অন্য কোনো নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত? কারিকুলাম ও পাঠ্যবই কি মুক্ত, নমনীয় ও বিভিন্ন বিশ্বাস (ধর্মীয়, রাজনৈতিক ইত্যাদি) ও ব্যবস্থার ব্যাপারে সহনশীল।
- শিক্ষা কি বৈষম্যমুক্ত? পাঠ্যবই ও কারিকুলাম কি পক্ষপাতহীন, উদ্দেশ্যভিত্তিক ও বাস্তবধর্মী? শিক্ষা কি প্রাসঙ্গিক এবং সংস্কৃতিগতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ?
- শিক্ষার জন্য কি ন্যুনতম মান-নির্ধারণ (পাঠ্যবইয়ের সংখ্যা, শিখন-প্রক্রিয়া) করা আছে এবং তা কি সরকার

কর্তৃক পরিবীক্ষণ ও নিশ্চিত করা হয় (সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থায়)?

- স্কুল কি নিরাপদ? এখানে সহিংসতার কি বিচার করা হয়? ন্যূনতম স্বাস্থ্যমান কি এখানে রয়েছে?
- এখানে কি পর্যাপ্ত শিক্ষক রয়েছে? তাঁরা কি নির্দিষ্ট মানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত? তাঁদের কি সঠিকভাবে কারিগরি সহায়তা দেয়া হয়, সুপারভাইস করা হয়?

Adaptability (অভিযোজনক্ষমতা)

- শিক্ষার্থী ও এলাকার শিশুদের নির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা কি স্কুলের রয়েছে? যেমন, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ছুটিগুলো মানা হয় কি না, প্রতিবন্ধী শিশুদের চাহিদা পূরণ করা হয় কিনা?
- এসব স্কুল সমাজ ও কমিউনিটির পরিবর্তিত চাহিদাকে কি শিক্ষার সাথে সংযুক্ত করতে পারে? যেমন ভাষা ও সাংস্কৃতিকভাবে সংখ্যালঘুদের নিজেদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষা প্রদানের সুযোগ কি রয়েছে? শিক্ষায় কি এইচআইভি বিষয়ে পড়ানো হয়?
- স্কুল শেষ করার বয়সের সাথে চাকুরি, বিয়ে, মিলিটারিতে অংশগ্রহণের বয়সের কোনো অগ্র-পশ্চাৎ সম্পর্ক আছে কি?
- যদি তরুণদের বয়সের সাথে এগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তাহলে তাদের পরিণতি কী?
- স্কুল কি শিশু-অধিকার নিশ্চিত ও বাস্তবায়ন করতে পারে? যেমন এটি কি শিশুশ্রম ও বাধ্যতামূলক বিয়ে থেকে তাদেরকে বাঁচাতে পারে? এটি কি তাদের চাকুরির নিশ্চয়তা দিতে পারে? জেন্ডার- সাম্যতা বৃদ্ধি করতে পারে? ইত্যাদি।

পরিচ্ছেদ ৭.২: অধিকারভিত্তিক বিদ্যালয় এবং তা প্রতিষ্ঠায় করণীয় (পিআরএস)

একশনএইড ও রাইট টু এডুকেশন প্রকল্প যৌথভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগঠিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য 'Promoting Rights in School' নামে একটি হ্যান্ডবুক প্রকাশ করেছে। মনে করা হচ্ছে, এতে বর্ণিত ১০টি অধিকার প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমেই একটি আর্দশ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং তাতে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব। এর মূল লক্ষ্য হলো, সরকারি বিদ্যালয়ে সবার জন্য বিনামূল্যে, বাধ্যতামূলক ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা। শিক্ষা-অধিকারের স্বীকৃতি, নিশ্চিতকরণ ও বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব রাষ্ট্রের। বিদ্যালয় ও এর ব্যবস্থাপনা কাঠামো (অর্থাৎ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি) এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রের মূল প্রতিষ্ঠান, যারা শিক্ষা-অধিকারের এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে বিদ্যালয়ের অর্থায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করে অর্থ মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী, বিদেশি আর্থিক প্রতিষ্ঠান (বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ) এবং কিছু বেসরকারি আর্থিক সংস্থা। এ প্রেক্ষিতে Promoting Rights in School বা পিআরএস অ্যাপ্রোচের মূল ফোকাস হচ্ছে, বিদ্যালয় পর্যায়ে পরিচালিত কর্মসূচির সাথে যোগসূত্র তৈরি করা, এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফোরামে বিষয়টি নিয়ে অ্যাডভোকেসির উদ্যোগ নেয়া। এবং শিশু, শিক্ষার্থী, কমিউনিটি, স্থানীয় সিভিল সমাজের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বিষয়ে অ্যাডভোকেসি করা; দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে ঐকমত্য সৃষ্টি করা।

শিক্ষা ও মানবাধিকার ফ্রেমওয়ার্ক এবং ইউনিসেফ এর 'শিশুবান্ধব বিদ্যালয়' এর ধারণা দ্বারা পিআরএস অনুপ্রাণিত। এখানে বর্ণিত ১০টি অধিকার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি বা কনভেনশনসমূহ থেকে উদ্ভূত, এবং ক্যাটরিনা টমাসভস্কি দ্বারা সংজ্ঞায়িত 4A এর ধারণার উপর ভিত্তি করে রূপায়িত। 4A-এর ধারণা সম্পর্কে পূর্ব পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে তার মূল কথা পুনর্ব্যক্ত হলোঃ

- সহজলভ্যতা: শিক্ষা অবশ্যই হতে হবে বিনামূল্যে, সরকারি অর্থায়নে, যথাযথ অবকাঠামো ও শিক্ষকমন্ডলীর মাধ্যমে;

- সহজগম্যতা: সামগ্রিক ব্যবস্থায় কোনো ধরনের অসমতা থাকবে না, এবং সবচেয়ে প্রান্তিক গোষ্ঠীর জন্য ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;
- গ্রহণযোগ্যতা: পাঠ্যক্রম হতে হবে জীবনঘনিষ্ঠ, সংস্কৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ ও মানসম্মত;
- সমন্বয়যোগ্যতা: সমাজের পরিবর্তন ও বিভিন্ন পরিস্থিতির সাথে সংগতি রেখে শিক্ষাকে যুগোপযোগী করা হবে।

(পড়ুন পরিচ্ছেদ ৭.১: স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা অধিকারের বুনিয়াদ তৈরি করা এবং এর বিশ্লেষণ-কাঠামো (4As)

উদ্দেশ্য:

বিদ্যালয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ (Promoting Rights in Schools) গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের জন্য সর্বস্তরের নাগরিকদের সম্পৃক্ত করা। এতে বর্ণিত ১০টি অধিকারবিষয়ক সনদ স্থানীয়, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষা-অধিকার এর সামগ্রিক অবস্থা কেমন সে সম্পর্কে নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করবে। আমাদের এই কর্ম-গবেষণা দৃষ্টান্তভিত্তিক অ্যাডভোকেসি (evidence-based advocacy) এবং প্রচারাভিযানকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমরা আশা করি, এর ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি টেকসই পরিবর্তন ঘটবে।

লক্ষ্য:

- অভিভাবক, শিশু ও শিক্ষকদের সাথে একটি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া গড়ে তোলা, যা কিনা ১০টি মূলনীতির একটি অথবা একাধিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করবে।
- বিদ্যালয়পর্যায়ে প্রতিবেদন তৈরি করা, যা কি না শিক্ষা অধিকার বাস্তবায়নে ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা নির্ধারণে সহায়ক হবে।
- জনগণভিত্তিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জেলা ও জাতীয় পর্যায়ের প্রতিবেদনগুলোকে সমন্বয় করা।
- একই সাথে শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তনগুলোকে এবং সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা।
- এতে বর্ণিত ১০টি অধিকারকে জনপ্রিয় করা। এর ভিত্তি যে আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ বা চুক্তি, জাতীয় সংবিধান ও আইন–তা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা।

অধিকার ১: অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার

(প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষার্থী বা অভিভাবকদেরকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো খরচ বহন করতে হবেনা; পর্যায়ক্রমে সকল স্তরের শিক্ষাই হবে অবৈতনিক)

অধিকার আদায়ে যা করা যেতে পারে-

- অবৈতনিক শিক্ষার জন্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রচারাভিযান/অ্যাডভোকেসি/লবিং/স্মারকলিপি প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ অথবা সহায়তা করা। (অবৈতনিক অর্থ, পরিবার বা শিশুর পক্ষ থেকে কোনো খরচ বহন করতে হবে না; তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয় অবশ্যই দূর করতে হবে। বেতনসহ অন্যান্য বাধ্যতামূলক খরচ (পরীক্ষা ফি, পোশাক, শিক্ষা-উপকরণ, দুপুরের খাবার ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি) বহন করতে হবে না। মোট কথা, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পরিবার বা শিশুর পক্ষ থেকে কোনো ধরনের খরচ বহন করতে হবে না; এবং পর্যায়ক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাও হবে অবৈতনিক)। বিরাজমান বাধ্যতামূলক শিক্ষা-সম্পর্কিত জাতীয় আইনসমূহ পর্যালোচনা করতে হবে। উল্লেখ্য, স্কুলে গমনোপযোগী শিশুদের বয়সসীমা এবং শিক্ষা সমাপ্তকারীর বয়সসীমা একেক দেশে একেক রকম সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।
- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন বলতে দুটি বিষয়কে বুঝায়। অভিভাবকগণ শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠানোসহ তারা যেন নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায়, সে ব্যবস্থা করবে এবং রাষ্ট্র শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ নিবে।

- প্রতিটি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ (শিক্ষক, এসএমসি সদস্য) তার এলাকার মধ্যে যদি কোনো শিশু বিদ্যালয়ে না আসে, তাহলে বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে ঐ শিশুর বিদ্যালয়ে নিয়মিত আসা নিশ্চিত করবে।
- সকল প্রকার শিশুশ্রম দূর করার জন্য প্রচারাভিযান পরিচালনায় সহায়তা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, এদের জন্য শ্রেষ্ঠ স্থান হলো–বিদ্যালয়। 'পরিবার ও সমাজ' শিশু শ্রমের উপর নির্ভরশীল নয়–এটা নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে রাষ্ট্রপক্ষের।
- বাধ্যতামূলক বা স্বেচ্ছায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ধারণকৃত ব্যয় কোনো ধরনের বিভাজন সৃষ্টি করে কি না অথবা সামঞ্জস্যতা নষ্ট করে কি না, সেটা বিশ্লেষণ এবং তা নথিভুক্ত করতে হবে।
- যদি শিশুকে পূর্ণসময় স্কুলে রাখা নিশ্চিত করতে হয়, তবে অবশ্যই শিশুকে দুপুরে খাওয়াতে হবে। খাবারগুলো স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ বা ব্যবস্থা করলে এ সংক্রান্ত খরচ কমতে পারে।
- ইতোমধ্যে দেশে মৌলিক বা প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এখন আবশ্যক–বিনাবেতনে মাধ্যমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য স্বচ্ছ একটি বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রচারাভিযান চালানো।

অধিকার ২: বৈষম্যহীনতার অধিকার

লিঙ্গ, ভাষা, বর্ণ, ধর্ম, রাজনৈতিক মতবাদ, আদিবাসী, জাতীয়তা, প্রতিবন্ধীত্ব অথবা অন্য কোনো মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিদ্যালয়গুলো শিক্ষা গ্রহণে বৈষম্য তৈরি করবে না।

সম্ভাব্য পদক্ষেপ

- বৈষম্যের কারণে স্থানীয়ভাবে যে সকল বাধা আছে, সেগুলোর উপাত্ত (যেমন সংখ্যালঘু, মেয়ে শিশু, এতিম, HIV-আক্রান্ত উদ্বাস্তু, প্রতিবন্ধী শিশু, গ্রাম্য শিশু, শহুরের শিশু, বস্তির শিশু ইত্যাদি) সংগ্রহ করতে হবে।
- স্কুলের পাঠ্যবই পর্যালোচনা করে দেখতে হবে–তার মধ্যে কোনো ধরনের সীমাবদ্ধতা বা গৎবাধা ধারণা আছে কি না।
- বৈষম্যের শিকার এমন কোনো দলের সাথে কাজ করতে হলে, স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থার কী কী বাধা আছে এবং তার সঠিক সমাধান কী হতে পারে, এগুলোকে শনাক্ত ও সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হবে।
- এলাকা ও সমাজ পর্যায়ে শিক্ষা অধিকার প্রসারে নারী সংঘ, পুরুষ সংঘ, মানবাধিকার শিক্ষাসংঘের সাথে মতবিনিময় করতে হবে।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিদ্যালয়ে মূল স্রোত ধারায় নিয়ে আসার উদ্যোগ নিতে হবে।
- বৈষম্যের স্বীকার–এমন কোনো দলের সাথে কাজ করলে ইস্যুভিত্তিক এমন প্রচারাভিযান রূপরেখা তৈরি করতে হবে, যার মাধ্যমে শক্তিশালী জনসংগঠন গড়ে তোলা এবং তা জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়।
- শিক্ষক-প্রশিক্ষণে বৈষম্য, মানবাধিকার, একীভূত শিক্ষা পদ্ধতি এবং প্রয়াসকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শিক্ষক সংগঠনের মাধ্যমে লবিং ও অ্যাডভোকেসির কাজ করতে হবে।
- ইতিবাচক বৈষম্য আনয়নের জন্য যেকোনো ধরনের ন্যায়ভিত্তিক নীতিমালা নিশ্চিত করতে হবে।
- স্কুল পর্যায়ে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে স্থানীয় প্রচারমাধ্যম ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করতে হবে।
- সাংগঠনিক বৈষম্য প্রতিকারের জন্য আইনি সহায়তার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

অধিকার ৩: পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত অধিকার

বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক ক্লাসরুম এবং ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথক স্যানিটেশন সুবিধা থাকতে হবে। এসব স্থানীয় উপকরণ দিয়ে তৈরি হবে; এবং তা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ঝুঁকি মোকাবিলায় সক্ষম হতে হবে।

সম্ভাব্য পদক্ষেপ/করণীয়:

১. বিদ্যালয়ের বর্তমান অবকাঠামো পর্যবেক্ষণ ও তার অবস্থা ডকুমেন্ট করতে হবে; এতে দেখতে হবে কোনো কোনো বিদ্যালয়ে নিরাপদ ও সুন্দর অবকাঠামোর ন্যূনতম মান বজায় আছে।

২. স্কুল ক্যাচমেন্ট এলাকায় অংশগ্রহণমূলক ম্যাপিং বা জরিপ করতে হবে; দেখতে হবে বৈষম্যের শিকার কোনো জনগোষ্ঠীর জন্য এ এলাকায় তেমন কোনো বিশেষ স্কুল দরকার আছে কি না;

৩. প্রত্যেকের অধিকার নিশ্চিত করার কথা বিবেচনায় রেখে বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নত করতে হবে। এ কাজটি করতে গিয়ে জনসাধারণের অধিকার সচেতনতা বাড়াতে হবে, জনদাবি গঠন করতে হবে এবং সরকারি পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে হবে।

৪. স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও স্থানীয়/জেলা/জাতীয় সরকারের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

৫. বাইরের ঠিকাদার দিয়ে কাজ করানোর বদলে স্থানীয় লোকবল বা জনসম্পদ কাজে লাগাতে হবে; এতে কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হবে।

৬. ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক স্যানিটেশন ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য এ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এতে ভর্তি ও টিকে থাকার হার বৃদ্ধি পাবে।

৭. স্থানীয় পর্যায়ে সংঘটিত যেকোনো দুর্যোগ মোকাবিলার উপযোগী করে স্কুল তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনে স্কুল বিল্ডিং কোড যথোপযুক্ত করার জন্য অ্যাডভোকেসি করতে হবে।

৮. প্রতিবন্ধী শিশুদের উপযোগী করে সকল বিদ্যালয় গড়ে তুলতে হবে; শুধু সহজগম্যতা নয়, শিখন পদ্ধতি, কৌশল ও ভাষাগত দিকটাও বিবেচনায় নিতে হবে।

অধিকার ৪: প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানসম্পন্ন নিয়মানুবর্তী শিক্ষক

প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পর্যাপ্তসংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকবেন; এরমধ্যে নারী শিক্ষকের সংখ্যা হবে বেশি। শিক্ষকেরা চাকুরীপূর্ব ও চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ পাবেন। এসব প্রশিক্ষণে জেন্ডার-সংবেদনশীলতা, বৈষম্যহীনতা ও মানবাধিকার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রতিটি শিক্ষকই দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় সম্মানজনক ও যথোপযুক্ত বেতন পাবেন।

সম্ভাব্য পদক্ষেপ/করণীয়:

- কর্মরত শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পারদর্শীতার মান কেমন সে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে; শিখনফল অর্জনে তা কেমন প্রভাব ফেলছে তাও জানতে হবে।
- জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায়ে সক্রিয় শিক্ষক সমিতিসমূহের সাথে সম্পর্ক ও পার্টনারশিপ শক্তিশালী করতে হবে।
- কম যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকসহ সকল শিক্ষকদের চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণে সহায়তা করতে হবে।
- মানসম্পন্ন শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন–এমন শিক্ষখমন্ডলী দ্বারা সকল শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রচারাভিযান পরিচালনা করতে হবে।
- শিক্ষকমন্ডলী যাতে জাতীয়ভাবে স্বীকৃত ন্যূনতম যোগ্যতা ও মানসম্পন্ন হন, এবং তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া যাতে স্বচ্ছ ও পেশাগত প্রক্রিয়ায় হয়, সে জন্য শিক্ষক সমিতি ও মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে কাজ করতে হবে।
- অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকেরাও যাতে সমিতিভুক্ত হতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে।
- অপ্রশিক্ষিত শিক্ষকেরা যাতে দূরশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন, সেজন্য শিক্ষক সমিতির সাথে কাজ করতে হবে।
- বিদ্যমান শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ পর্যালোচনা করতে হবে। দেখতে হবে, এসব কোর্স যথাযথ কি না–বিশেষ করে, এইচআইভি, জেন্ডার, মানবাধিকার, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এবং অংশগ্রহণমূলক শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া শাক্তিশালী, কার্যকর, মানসম্পন্ন কি না, তা পর্যালোচনা ও নিশ্চিত করতে হবে।

- ২০১৫ সালের মধ্যে অ-প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ করতে হবে।
- শুধুমাত্র শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত নয়, প্রশিক্ষিত শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত নিশ্চিত করতে প্রচারাভিযান চালাতে হবে।

অধিকার ৫: নিরাপদ ও নির্যাতনমুক্ত পরিবেশ

শিক্ষার্থীরা নিরাপদে স্কুলে যাতায়াত করতে পারবে এবং বিদ্যালয় ও ক্লাসে নিপীড়নমুক্ত থাকবে। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা পুরোপুরি বন্ধ হবে এবং যে কেউ যেকোনো নিপীড়নমূলক আচরণ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারে—তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

সম্ভাব্য পদক্ষেপ/করণীয়:

- প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি করে অভিযোগ বক্স রাখতে হবে, শিক্ষার্থীরা নির্যাতিত হলে যেখানে তার তথ্য জানাবে।
- এসএমসি, পিটিএ ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি করে নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তুলতে হবে।
- বিদ্যালয় সম্পৃক্ত করা নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে নির্যাতন-প্রতিরোধে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। পিটিআই ও উপজেলা রিসোর্স সেন্টার প্রশিক্ষণ কারিকুলামে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধমূলক বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- শিক্ষার্থীরা আসা-যাওয়ার পথে যাতে নির্যাতনের শিকার না হয়, সে জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সচেতন করে তুলতে হবে।
- এসএমসি ও পিটিএ-কে এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- শিক্ষকেরা যাতে আচরণবিধি মেনে চলেন, সে জন্য শিক্ষক সমিতির সাথে যৌথভাবে কাজ করতে হবে।
- শারীরিক শাস্তি না দিয়েও শিক্ষার্থীদেরকে কীভাবে ম্যানেজ করা যায়, শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায়, সে ব্যাপারে শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

অধিকার ৬: প্রাসঙ্গিক শিক্ষাবিষয়ক অধিকার

শিখনক্রম বা কারিকুলাম অবশ্যই শিক্ষার্থীদের জীবনের সাথে প্রাসঙ্গিক হতে হবে; শিক্ষার্থীদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পরিবেশগত, অর্থনৈতিক ও ভাষাগত দিক বিবেচনায় তা বৈষম্যমুক্ত হতে হবে।

সম্ভাব্য পদক্ষেপ/করণীয়:

১) আদিবাসী, পাহাড়ি ও অন্য ভাষার সমস্ত শিশুদের জন্য তাদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
২) পাঠ্যসূচিতে শিক্ষাকে জীবনমুখী, যুগোপযোগী ও কর্মপোযোগী করে তুলতে হবে।
৩) বর্তমান প্রজন্মের উপযোগী আধুনিক শিক্ষা-উপকরণ শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
৪) বিদ্যালয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের উপর শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শিক্ষা প্রদান এবং পাঠ্যপুস্তকে তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
৫) স্থানীয়পর্যায়ে যাতে সহজেই শিক্ষা-উপকরণ তৈরি ও ক্রয় করা যায়, এ জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত বরাদ্দ দিতে হবে।
৬) বিদ্যালয়ে কোনো শিক্ষক ছুটিতে গেলে অথবা অনুপস্থিত থাকলে, সেই বিদ্যালয়ে দ্রুত শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে করে শ্রেণী কক্ষের কার্যক্রম সচল থাকবে।
৭) স্থানীয় প্রাসঙ্গিক ইস্যুসমূহ শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করতে স্থানীয় পর্যায়ে প্রচারণা চালাতে হবে।

অধিকার ৭: নিজের অধিকার সম্পর্কে জানার অধিকার

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদেরকে শিশুর মানবিক অধিকার, শিশু অধিকার ও শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে জানানো হবে। শিক্ষা অবশ্যই বয়সভিত্তিক হতে হবে, এবং যৌন ও প্রজনন-অধিকার সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য দেয়া হবে।

সম্ভাব্য পদক্ষেপ/করণীয়

১) শিশুদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানবাধিকার ও অন্যান্য শিশু অধিকার বিষয়ে শিশুবান্ধব উপকরণ তৈরির জন্য কর্মশালা করতে হবে।

২) শিক্ষক ও অভিভাবকদেরকে মানবাধিকার ও শিশু অধিকার বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন দিতে হবে।

৩) কম্যুনিটিকে এসব শিশুবান্ধব মূল্যবোধগুলো জানাতে হবে।

৪) পরমত সহিষ্ণুতা ও গণতন্ত্র সম্পর্কে শিশুদের শিক্ষা দিতে হবে।

৫) শিশু ও মানবাধিকারবিষয় সম্পর্কে সংযোজন করতে বিদ্যমান কারিকুলাম পর্যালোচনা করতে হবে।

৬) বয়সের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে।

অধিকার ৮: অংশগ্রহণের অধিকার

বিদ্যালয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়ায় সকল ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণের অধিকার আছে। এ জন্য যথোপযুক্ত প্রক্রিয়া ও কৌশল অবলম্বন করা হবে।

সম্ভাব্য পদক্ষেপ

১) অভিভাবকদের সচেতন করতে হবে।

২) শিশুদের অংশগ্রহণ বিষয়ে শিক্ষক, এসমসি ও পিটিএ'র জন্য ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩) শিখন-শেখানো কার্যাবলী অংশগ্রহণমূলক ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করতে হবে–যাতে তারা নির্ভয়ে নিজেদের কথা বলতে ও লিখতে পারে।

৪) পিয়ার এডুকেশন বা সহপাঠী-শিখন চালু করতে হবে।

৫) বিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রমে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় শিশুদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

৬) শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে উদ্দীপনা তৈরি করার জন্য আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষা-উপকরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭) বিদ্যালয়ে সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে।

অধিকার ৯: স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক বিদ্যালয়

প্রতিটি বিদ্যালয়ে কার্যকর ও স্বচ্ছ মনিটরিং ব্যবস্থা থাকবে। জবাবদিহিমূলক কমিটিগুলো (এসএমসি, পিটিএ) তে কমিউনিটি ও শিক্ষার্থীদের কার্যকর ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত থাকবে।

সম্ভাব্য পদক্ষেপ/করণীয়

- যাতে প্রতিটি বিদ্যালয়ে কার্যকর বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ থাকে এবং তাদের দায়-দায়িত্ব স্পষ্ট ও জনমুখী হয়, সে লক্ষে জাতীয় পর্যায়ের নীতিসমূহ পর্যালোচনা করতে হবে।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে যাতে ন্যূনতম মান বজায় থাকে, তা নিশ্চিত করতে সরকারি পরিদর্শন নিশ্চিত করতে হবে।
- এসএমসি'র পরিকল্পনা, মনিটরিং ও অডিটিং জোরদার করতে কারিগরি সহায়তা দিতে হবে।
- কমিউনিটি পর্যায়ে, ব্যবহারবান্ধব বাজেট পর্যবেক্ষণ কৌশল চিহ্নিত করতে হবে।
- কমিউনিটি, এসএমসি, পিটিএ, প্রাধান শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের জন্য বাজেট ট্র্যাকিং বা পর্যবেক্ষণ কর্মশালা করতে হবে।
- বিভিন্ন কমিটিতে বঞ্চিত জনগোষ্ঠি ও নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে।

- ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে এসএমসি ফেডারেশন গড়ে তুলতে হবে; এতে করে তারা তাদের কথা/সমস্যা/প্রস্তাব সব পর্যায়ে তুলে ধরতে সক্ষম হবে।
- এসএমসি, পিটিএ ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করতে হবে (স্থানীয়, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে)।

অধিকার ১০: মানসম্মত শিখনের অধিকার

প্রত্যেকটি শিশুর অধিকার থাকবে–মানসম্মত শিক্ষা পরিবেশ ও কার্যকর শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে তাদের মেধা, ব্যক্তিত্ব, শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটানোর অনুকূল পরিবেশ পাওয়ার।

সম্ভাব্য পদক্ষেপ/করণীয়

- জাতীয় শিক্ষানীতি পর্যালোচনা করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে (১শিক্ষক=৩০ জন শিক্ষার্থী)।
- শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ও পরীক্ষার ফলাফল একীভূত করে স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (স্কুল, কমিউনিটি, অভিভাবক ইত্যাদি পর্যায়ে)
- অংশগ্রহণমূলক শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকদের দক্ষতা অর্জনের জন্য উপজেলা রিসোর্স সেন্টারকে সক্রিয় করতে হবে।
- সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।
- শিখনপ্রক্রিয়ায় অভিভাবক, কমিউনিটি, শিক্ষার্থী ও স্কুল কর্তৃপক্ষকে সম্পৃক্ত করতে হবে।
- খারাপ ফলাফলগুলোকে বিশ্লেষণ করে উন্নয়নের জন্য করণীয় নির্ধারণ করতে হবে।
- অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিশুর সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে বিদ্যালয় ও বাড়িতে শিক্ষার্থী যাতে নিয়মিত তার কাজ করে সে ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- স্কুলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

আরও যা করা যেতে পারে

মৌলিক শিক্ষা-অধিকার বাস্তবায়নে সফলতা নিয়ে আসার জন্য স্থানীয় ও জাতীয়–এ দুই পর্যায়ে-ই কাজ করা জরুরি; এবং তা এমনভাবে হতে হবে, যেন একটি অপরটির পরিপূরক হতে সহায়তা দেয়। উভয়পর্যায়ের কাজই হতে হবে অংশগ্রহণমূলক।

স্থানীয় পর্যায়ে–মৌলিক শিক্ষা অধিকার বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হলে তৃণমূল বা স্থানীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। কেন্দ্র বা ওপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে এটার সুফল পাওয়া সম্ভব হবে না। যে কাজগুলো এখানে করার প্রয়োজন এবং করার সুযোগ রয়েছে সেগুলো হলো:

১. শিক্ষার সমস্যা নিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় জনগণ ও নেতৃবৃন্দকে সচেতন করে তোলা–কোনো গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সময়মতো নতুন বই পাচ্ছে না। তাহলে এলাকার জনগণ গ্রামের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সঙ্গে আলোচনা করে পুরনো বই জোগাড় করে পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিতে পারেন। বই সংগ্রহের জন্য অবশ্যই স্কুলের শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

২. স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সক্রিয় রাখা–স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়মিত সভা করা এবং স্কুলের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তাদের সদা সক্রিয় রাখার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

৩. স্থানীয় পর্যায়ে জবাবদিহিতা ও নমনীয়তার ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি–স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসন শিক্ষাবিষয়ক কর্মকাণ্ডগুলো ঠিকমতো পরিচালনা করছে কি না এবং তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করছে কি না তা পর্যবেক্ষনের জন্য জনসাধারণের ভেতর আগ্রহ তৈরি করা যেতে পারে। প্রশাসনের সঙ্গে জনসাধারণের মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৪. সঠিক সহ-শিক্ষাউপকরণ প্রবর্তন– ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার পাশাপশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত করতে তাদের জন্য সঠিক সহ-শিক্ষা উপকরণ দিতে হবে।
৫. অধিকারবোধ নিয়ে প্রচারণা–শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি প্রক্রিয়াসহ শিক্ষার অধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে নিয়মিত ভিত্তিতে প্রচারণা চালাতে হবে। এ জন্য স্থানীয় পর্যায়ের জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে।
৬. শিক্ষার্থীদের মত প্রকাশ– স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আলোচনা ও মতবিনিময়ের একটি প্রক্রিয়া চালু করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীরা তাদের সমস্যা ও প্রয়োজনগুলো যেন তুলে ধরতে পারে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। এতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া অধিকতর অংশগ্রহণমূলক হবে এবং স্কুল কমিটির জবাবদিহিতাও সম্পন্ন হবে।
৭. বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসহ সমাজের চরম প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকতে হবে।
৮. পাঠ্যসূচিতে স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
৯. স্থানীয় ভিত্তিতে একটি অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার চালুর ব্যাপারে প্রচারণা চালাতে হবে।

জাতীয় পর্যায়ে–জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষাবিষয়ক প্রচারণা চালিয়ে যাওয়াসহ একাধিক কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে, যার মাধ্যমে মানসম্পন্ন শিক্ষার অধিকার বাস্তবায়ন কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

- **শিক্ষাবিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম**–দেশের ৬টি বিভাগের সামগ্রিক শিক্ষাবিষয়ে গবেষণাপত্র প্রস্তুত করা যেতে পারে। স্থানীয় পর্যায় থেকে পাওয়া বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জাতীয় পর্যায়ের গবেষণাপত্র প্রণয়নে কাজে লাগানো যেতে পারে। এ কাজে শিক্ষা নিয়ে কাজ করছে এমন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্পৃক্ত করা।
- **বার্ষিক নাগরিক প্রতিবেদন**–শিক্ষাবিষয়ে নাগরিকদের চিন্তা-ভাবনা ও পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে বার্ষিকভিত্তিতে নাগরিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে। নাগরিক প্রতিবেদনের সুপারিশগুলোর আলোকে শিক্ষা সমস্যা সমাধানে জাতীয় পর্যায়ে প্রচারণা চালানো যেতে পারে।
- **অর্থায়ন প্রচারণা**–সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে অধিক পরিমাণে এবং সঠিক মাত্রায় অর্থায়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে সরকারের সঙ্গে সুশীল সমাজ ও অধিকার প্রাপকদের মত বিনিময়ের আয়োজন এবং সুপারিশ প্রদান করতে হবে।
- **প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রচারণা**–শারিরীক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু ও বয়স্কদের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে।
- শিক্ষা পরিচালনা কাঠামোর বিকেন্দ্রীকরণ করতে প্রচারণা চালাতে হবে।
- কিশোর শিক্ষা নীতি প্রণয়নের জন্য প্রচারণা চালাতে হবে।
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ পাঠ্যসূচির অংশগ্রহণমূলক পর্যালোচনা করতে হবে।

বিশেষ প্রস্তাবনা–আমাদের দেশে যেহেতু তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক প্রচারণা ও সম্পৃক্ততা আছে, সেহেতু এ ধরনের কাজে রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ একটা বড় গুরুত্ব বহন করে। আর সে কারণেই রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদেরকে শিক্ষা সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ে বিশেষভাবে আগ্রহী করে তোলা জরুরি। এগুলো হলো:

- শিক্ষা-অধিকার আইন প্রণয়ন
- শিক্ষায় দীর্ঘমেয়াদী সেক্টর পরিকল্পনা প্রণয়ন
- স্থায়ী শিক্ষা কমিশন প্রতিষ্ঠা করা
- পর্যাপ্ত রাষ্ট্রীয় অর্থায়ন নিশ্চিতকরণ
- শিক্ষক সমিতি সমন্বিত ও সক্রিয়করণ
- জনগণের প্রয়োজনভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ
- জনগণের অংশগ্রহণে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

পরিচ্ছেদ ৮

সংযোজনী

এই হ্যান্ডবুকে বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশের সংবিধান, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক আইন ও বিভিন্ন আইনকানুন এবং আন্তর্জাতিক সনদের কথা বলা হয়েছে। এসব আইনকানুন ও ঘোষণায় প্রদত্ত শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত ও সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহ এ অধ্যায়ে তুলে ধরা হলো।

সংযোজনী–১: সংবিধান এর প্রাসঙ্গিক অংশসমূহ

(বাংলাদেশের সংবিধানের প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহ অনুচ্ছেদ নম্বরসহ এখানে তুলে ধরা হলো)

জাতীয় জীবনে নারীদের অংশগ্রহণ

১০. জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারনের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা

১৪. রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনের ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাতে নাগকিদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়ঃ

ক. অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারার মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা।

অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা

১৭. রাষ্ট্র

ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য;

খ) সমাজের প্রয়োজনের সাথে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা-প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য;

গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

সুযোগের সমতা

১৯. (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবেন;

(২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চত করার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বাংলাদেশের সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহ

বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক মানবাধিকারগুলোর আলোকে এদেশের সকল নাগরিকের জন্য কতগুলো মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়েছে। এগুলো আমাদের সংবিধানে ২৭ থেকে ৪৪ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে। আমরা জানি, সংবিধানের ৩য় ভাগে 'মৌলিক অধিকার' পরিচ্ছেদে যেসব অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, শুধু সেগুলোই মৌলিক অধিকার। যেমন: প্রত্যেক নাগরিকের যেকোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন ও প্রচারের অধিকার রয়েছে। নিচে সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের অনুচ্ছেদ/ধারাসহ এগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেয়া হলো:

১. অনুচ্ছেদ ২৭: সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

আইনের দৃষ্টিতে সমতা (Equality before law): আইনের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের সকল নাগরিকই সমান এবং সকলেই সমভাবে আইনের আশ্রয়গ্রহণের অধিকারী। রাষ্ট্রীয় আইন সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র বা গোষ্ঠী বা জন্মস্থানের কারণে কারও প্রতি কোনোরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে না। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি এবং একজন সাধারণ নাগরিকের মধ্যে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বৈষম্য বা পার্থক্য করা হবে না।

২. অনুচ্ছেদ ২৮(১): কেবল বর্ণ, ধর্ম, গোষ্ঠী, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

অনুচেছদ ২৮(২): রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

অনুচেছদ ২৮(৩): কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য (Discrimination on grounds of religion etc.): ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। এসব কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশ বা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে কেউ বাধার সম্মুখীন হবে না। রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত থাকবে। তবে নারী ও শিশুদের কিংবা নাগরিকদের যেকোন অনগ্রসর এলাকার উন্নতির জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৩. অনুচেছদ ২৯(২): কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য করা যাবে না।

সরকারি নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা (Equality of opportunity in public employment): প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের ব্যাপারে ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থান নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে। তবে কোনো অনগ্রসর এলাকার উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের জন্য কোনো ধর্মীয় বা উপসম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে তাদের যথার্থ নিয়োগ সংরক্ষণের জন্য অথবা কোনো বিশেষ প্রকৃতির কাজের জন্য নারী বা পুরুষের পক্ষে তা অনুপযোগী হলে রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৪. অনুচ্ছেদ ৩১: আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার ***(Right to protection of law):*** আইনের আশ্রয়লাভ এবং কেবল আইনানুযায়ী যেকোনো স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষত: আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাতে কোনো ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

৫. অনুচ্ছেদ ৩২: আইনানুযায়ী ব্যতিত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার রক্ষা (Protection of right to life and personal liberty): আইনানুযায়ী ব্যতিত জীবন ও ব্যক্তির স্বাধীনতা থেকে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না।

৬. অনুচ্ছেদ ৩৪: সকল প্রকার জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধ এবং এই বিধান কোনোভাবে লজ্মিত হইলে তাহা আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ (Prohibition of Forced Labour): বাংলাদেশের সকল প্রকার জবরদস্তি শ্রম এবং বেগার খাটানো নিষিদ্ধ ও আইনগত দণ্ডনীয়। তবে ফৌজদারী অপরাধের জন্য দণ্ডভোগী ব্যক্তির ক্ষেত্রে এবং জনগণের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আইনসাপেক্ষ, আবশ্যকীয় এ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে না।

৭. অনুচেছদ ৩৫ (৫): কোনো ব্যাক্তিকে যন্ত্রণা দেয়া যাইবে না, কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্চনাকর দণ্ড দেয়া যাইবে না কিংবা কাহারো সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না।

বিচার দণ্ডদান রক্ষণ (Protection in respect of trial and punishment):

১. অপরাধের দায়যুক্ত কার্য সংঘটনকালে বলবৎ ছিল, এরূপ প্রকৃতির আইন ভঙ্গ করার অপরাধ ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না এবং অপরাধ সংঘটনকালে বলবৎ সেই আইনবলে যে দণ্ড দেয়া যেতে পারত, তাকে তার অধিক বা তা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির দণ্ড দেয়া যাবে না।

২. এক অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারীতে সোর্পদ ও দণ্ডিত করা যাবে না।

৩. ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারলাভের অধিকারী হবে।

৪. কোনো অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না।

৮. অনুচেছদ ৩৬: জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধানিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যেকোনো স্থানে বসবাস ও বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃ প্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

৯. অনুচেছদ ৩৮: জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধসাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

সংগঠনের স্বাধীনতা (Freedom of association): জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত ব নিয়ন্ত্রিত যুক্তিসঙ্গত বিধি-নিষেধসাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সমিতি, সংঘ বা সংগঠন প্রতিষ্ঠান অধিকার স্বাধীনতা থাকবে।

১০. অনুচ্ছেদ ৩৯(১): চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল।

অনুচ্ছেদ ৩৯ (২) (ক): প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হইল।

অনুচ্ছেদ ৩৯ (২) (খ): সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

চিন্তা ও বিবেকের অধিকার ও বাকস্বাধীনতা (Freedom of thought, conscience and speech): শাসনতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিকের চিন্তাভাবনা, বিবেকবিবেচনা এবং বাকস্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। তবে এ সকল স্বাধীনতা অবাধ বা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন নহে। এরূপ স্বাধীনতা বা অধিকার, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনাদান সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত বিধিনিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রণহীন নহে এবং অনুরূপভাবেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে।

১১. অনুচ্ছেদ ৪০: আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ সাপেক্ষে কোনো পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসা পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোনো যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতেক নাগরিকের যেকোনো আইনসংগত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের এবং যেকোনো আইনসংগত কারবার বা ব্যবসা পরিচালনার অধিকার থাকিবে।

পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা (Freedom of profession or occupation): আইনের দ্বারা আরোপিত বিধিনিষেধসাপেক্ষে রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক যেকোনো পেশা বা বৃত্তিগ্রহণ করতে পারবে। তাছাড়া, কোনো আইনের দ্বারা কোনো বিশেষ যোগ্যতা নির্ধারিত হয়ে থাকলে, অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিক যেকোনো আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তিগ্রহণ এবং যে কোনো ধরনের আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনা করার অধিকার থাকবে।

১২. অনুচ্ছেদ ৪১(১) (ক): প্রত্যেক নাগরিকের যেকোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে।

অনুচ্ছেদ ৪১(১)(খ): প্রত্যেক ধর্মীয় সমপ্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে।

ধর্মীয় স্বাধীনতা (Freedom of Religion): আইন শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের যেকোন ধর্মগ্রহণ, ধর্মপালন এবং ধর্মপ্রচারের সমান অধিকার বা স্বাধীনতা থাকবে। তা ছাড়া প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের পক্ষে নিজ নিজ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার পূর্ণ অধিকার থাকবে। ধর্মীয় কারণে নাগরিকগণের মধ্যে কোনোরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে না।

১৩. অনুচ্ছেদ ৪৪: শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের অধিকার ***(Enforcement of fundamental rights):*** সংবিধানে লিপিবদ্ধ কোনো মৌলিক অধিকার কোনো কারণে ক্ষুণ্ন হলে, এতে যেকোনো ব্যক্তি সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের দফা অনুযায়ী সুপ্রীমকোর্টের নিকট কিংবা আইনসঙ্গতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো আদালতেও আবেদন বা মামলা করতে পারে।

সংযোজনী ২: মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিশ্বজনীন মানবাধিকারের একটি সাধারণ ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। ওই ঘোষণাটিতে একটি মুখবন্ধ ও ৩০টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। নিচে অনুচ্ছেদগুলো দেয়া হলো:

১) সকল মানুষই স্বাধীনভাবে, সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিয়েই পৃথিবীতে জন্মলাভ করে। তারা বিবেকসম্পন্ন এবং চিন্তাশক্তির অধিকারী। সেজন্য একে অপরের প্রতি তাদের আচরণ হওয়া উচিত ভ্রাতৃসুলভ। –১দফা

২) জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, রাজনৈতিক অন্যান্য মতাদর্শ, ধনীগরিব ও জন্মসূত্র নির্বিশেষে সকলেই এ ঘোষণাপত্রে বর্ণিত অধিকার এবং স্বাধীনতার সমঅংশীদার। যেকোনো স্বাধীন কিংবা স্বায়ত্বশাসিত বা সীমিত সার্বভৌম দেশের রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক বিশেষত্বের কারণে ওই দেশের কোনো অধিবাসীর প্রতি কোনো প্রকার ভিন্ন আচরণ করা যাবে না। –২ দফা

৩) প্রত্যেক ব্যক্তিরই জীবনের নিরাপত্তা ও মুক্ত জীবন যাপনের অধিকার রয়েছে। – ৩ দফা

৪) কোনো মানুষকেই অত্যাচার বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দাসত্বে সমপর্যায়ের আনা যাবে না। যেকোন প্রকারের দাস প্রথা ও দাস ব্যবসায় নিষিদ্ধ করতে হবে। –৪ দফা

৫) কাউকে নির্যাতন করা যাবে না এবং অমানবিক যন্ত্রণা বা সাজা দেয়া যাবে না, অথবা কারও ওপর মানবেতর অবস্থা চাপিয়ে দেয়া যাবে না। –৫ দফা

৬) আইনের সামনে প্রত্যেকেরই ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার আছে। – ৬দফা

৭) আইনের চোখে সবাই সমান এবং শ্রেণী-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই সমানভাবে আইনের আশ্রয় নিতে পারবে। এ ঘোষণাপত্রে বর্ণিত অধিকারের প্রয়োগ না হলে বা প্রয়োগে বাধা পড়লে প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে আইনের আশ্রয়ে সেই অধিকারকে কার্যকর করার। – ৭ দফা।

৮) শাসনতন্ত্র বা আইনে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই যথাযথ আদালতের শরণাপন্ন হবার অধিকার রয়েছে। – ৮ দফা

৯) কোনো ব্যক্তিকেই সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া বন্দী, আটক বা অন্তরীণ রাখা যাবে না। –৯ দফা

১০) কেউ অপরাধী বলে অভিযুক্ত হলে সে তার অধিকার এবং দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করার জন্য স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালতে প্রকাশ্যে বিচারের দাবি করতে পারবে। –১০ দফা

১১) (ক) কেউ দোষী বলে অভিযুক্ত হলে দোষী সাব্যস্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশ্য আদালতে আইনের আওতায় নিজেকে নির্দোষ দাবি করতে পারবে। –১১ (ক) দফা

(খ) কেউ যদি কখনও এমন কাজ করে যা রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক আইনে দোষণীয় নয়, তাহলে পরবর্তী পর্যায়ে অন্য কোনো আইনের আওতায় ওই কাজের জন্য তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। যদি কেউ ঐ সময় দোষণীয় কিছু করেও থাকে, তবে পরবর্তীকালে ওই দোষের জন্য তাকে পূর্বের অবস্থায় প্রাপ্য সাজার চাইতে অধিকতর গুরুতর সাজা দেয়া যাবে না। –১১ (খ) দফা

১২) কোনো ব্যক্তির পরিবারের, বাসস্থানের, চিঠি আদান প্রদানের ওপর কিংবা অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমের ওপর অথবা গোপনীয়তার ওপর কোনো ধরনের বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাবে না, বা তার ব্যক্তিগত সম্মান ও সুনাম ক্ষুণ্ন হতে পারে–এমন কিছু করা যাবে না। যারা এসব বিঘ্নের শিকার হবে তারা প্রচলিত আইনে প্রতিকার ও বিচার দাবি করতে পারবে। –১২ দফা

১৩) (ক) প্রত্যেকেরই নিজ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যেকোনো স্থানে অবাধে চলাফেরা এবং বসবাস করার অধিকার রয়েছে। –১৩ (ক) দফা

(খ) প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে স্বেচ্ছায় নিজ দেশ ত্যাগ করার এবং নিজের দেশে ফিরে আসার। –১৩ (খ) দফা

১৪) (ক) প্রত্যেকেরই অপরের যেকোনো শত্রুতামূলক আচরণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য অন্য কোনো দেশে আশ্রয় চাওয়া এবং ঐরূপ আশ্রয়ে বাস করার অধিকার রয়েছে। –১৪ (ক) দফা

(খ) তবে যদি কেউ রাজনৈতিক কারণ ছাড়া অন্য কোনো অপরাধে অপরাধী গণ্য হয়, তিনি অন্যদেশে রাজনৈতিক আশ্রয় পাবার অধিকার ভোগ করতে পারবেন না। – ১৪(খ) দফা

১৫) (ক) পূর্ণ বয়স্ক মানুষ মাত্রই একটি রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের দাবিদার। –১৫(ক) দফা

(খ) কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় পরিচয়কে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে কেড়ে নেয়া যাবে না বা সে যদি রাষ্ট্রের পরিচয় পাল্টাতে ইচ্ছুক হয়, তবে তা থেকে বিরত করা যাবে না। –১৫(খ) দফা

১৬) (ক) পূর্ণবয়স্ক নারী-পুরুষ ধর্ম, বর্ণ, জাতীয়তা নির্বিশেষে একে অপরকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে সংসারী হতে পারবে। দাম্পত্যজীবনে ও বিবাহবিচ্ছেদের পরও প্রতিটি নারী-পুরুষ সমঅধিকারের অধিকারী বা অধিকারিনী হবে। –১৬(ক) দফা

(খ) কেবলমাত্র বর ও কনে উভয়ের পূর্ণ সম্মতিক্রমেই বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে পারবে। –১৬(খ) দফা

(গ) যেহেতু পরিবার সমাজের একটি মৌলিক ও স্বাভাবিক অঙ্গ, সেহেতু প্রতিটি পরিবারই সমাজের এবং রাষ্ট্রের কাছে নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকারী হবে। –১৬(গ) দফা

১৭) (ক) প্রত্যেকেরই একা অথবা অন্যের সাথে মিলিতভাবে সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার আছে। –১৭ (ক)দফা

(খ) কাউকেই যথেচ্ছভাবে তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। –১৭(খ) দফা

১৮) মানুষমাত্রই আদর্শের, মুক্তবুদ্ধির ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারী বটে। এ অধিকারের আওতায় রয়েছে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে ধর্মান্তরিত হওয়া বা বিশ্বাস পরিবর্তন করার স্বাধীনতা। এ ছাড়াও রয়েছে ব্যক্তিগতভাবে বা গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে প্রকাশ্যে সামাজিকভাবে বা নিজ গৃহাভ্যন্তরে ধর্মাচার বিশ্বাস, প্রচার ও পালন করার স্বাধীনতা। –১৮ দফা

১৯) প্রত্যেক মানুষেরই স্বাধীনভাবে মতামত পোষণ ও ব্যক্ত করার অধিকার রয়েছে। এ অধিকারের মধ্যে রয়েছে নির্বিঘ্নে স্বীয় মতামত তুলে ধরা এবং রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি সংগ্রহ এবং গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করার অধিকার। –১৯ দফা

২০) (ক) প্রতিটি মানুষের শান্তিপূর্ণভাবে সভাসমিতি করার এবং সমাবেশ অনুষ্ঠান করার লক্ষ্যে একত্রিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। –২০ (ক) দফা

(খ) কাউকে জোরপূর্বক কোনও সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। –২০(খ) দফা

২১) (ক) সরাসরি ব্যক্তিগতভাবে বা নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের স্বদেশের সরকার গঠনে অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। -২১ (ক) দফা

(খ) প্রত্যেকেই নিজদেশের পাবলিক সার্ভিসে অংশগ্রহণ করার অধিকার আছে। –২১(খ) দফা

(গ) সংশ্লিষ্ট দেশের জনগণের মতামতের ভিত্তিতে দেশের সরকার পরিচালিত হবে। একটি বিশেষ সময়কাল পর পর নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণকর্তৃক সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগে গোপন ব্যালট বা অনুরূপ ব্যবস্থার দ্বারা সরকার পরিবর্তনের সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। –২১ (গ) দফা

২২) সমাজের একজন সদস্য হিসেবে প্রতিটি মানুষের সামাজিক নিরাপত্তালাভের অধিকার আছে। প্রত্যেকেরই নিজের মর্যাদা ও স্বাধীনভাবে ব্যক্তিত্ব বিকাশের লক্ষ্যে সমাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার আছে। – ২২ দফা

২৩) (ক) প্রত্যেকেই কাজ করার, স্বাধীনভাবে কাজ বেছে নেবার ও কাজের জন্য যথাযথ অনুকূল পরিবেশ পাবার অধিকার আছে; অধিকার রয়েছে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করার।–২৩ (ক) দফা

(খ) প্রত্যেক চাকুরিজীবী তার কাজের জন্য উপযুক্ত বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাবার অধিকার সংরক্ষণ করে। –২৩ (খ) দফা

(গ) প্রত্যেক শ্রমজীবী-ই তার স্বার্থ রক্ষার তাগিদে যেকোনো ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংগঠনের সদস্য হওয়ার বা যেকোনো শ্রমিক সংগঠন করার অধিকার রাখে। –২৩(গ) দফা

২৪) প্রত্যেকেরই বিশ্রাম ও অবসর নেয়ার অধিকার আছে; বেতনসহ ছুটির সুবিধা এবং সপ্তাহে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজ করার অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে। –২৪ দফা

২৫) (ক) প্রতিটি কর্মজীবী নারী-পুরুষের পরিবারের সদস্যবর্গের খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, চিকিৎসা খরচ এবং অন্যান্য সামাজিক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে মিটিয়ে যথোপযুক্ত জীবনমান বজায় রাখতে পারার সঙ্গত অধিকার রয়েছে। এ ছাড়া বেকারত্ব, অসুখ-বিসুখ, দৈহিক অক্ষমতায়, বিধবাকালীন অবস্থায়, বৃদ্ধবয়স ও মানুষের নিয়ন্ত্রণবর্হির্ভূত বিভিন্ন উপার্জন কাজে অক্ষম অবস্থায় তারা নিরাপত্তা লাভের অধিকারী। –২৫ (ক) দফা

(খ) গর্ভধারণকালে ও শৈশবাবস্থায় প্রতিটি মা-শিশু বিশেষ যত্ন এবং সাহায্য লাভের অধিকারী। বৈধ দম্পত্তির মাধ্যমে বা অন্য যেকোনো সম্পর্কের ভিত্তিতে সন্তান জন্মলাভ করুক না কেন, প্রতিটি শিশুই সমানভাবে সামাজিক স্বীকৃতি এবং নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকারী। ২৫(খ) দফা

২৬) (ক) প্রত্যেকেই শিক্ষার আলো লাভের অধিকারী। বিনা খরচে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা থাকতে হবে। সবকটি না হলেও অন্তত মৌলিক এবং প্রাথমিক শিক্ষাটুকু যাতে সবাই বিনা খরচে পেতে পারে ঐ ব্যবস্থা থাকতে হবে। বিশেষত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সাধারণভাবে সবার গ্রহণের আওতায় আনতে হবে এবং উচ্চশিক্ষার দ্বারা মেধার ভিত্তিতে সবার জন্য উন্মুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। –২৬(ক) দফা

(খ) মানুষের মানবিক গুণাবলীর ক্রমউন্নতি সাধনে শিক্ষাকে প্রবাহিত করতে হবে। এর সাথে স্বাধীনতার মৌলিক নীতিমালা ও মানবাধিকারের প্রতি সম্মানবোধকে উচ্চকিত করার লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থাকে কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার মাঝে সমঝোতা, সহিষ্ণুতা ও সৌহার্দ্যের সেতুবন্ধন তৈরিকে আরও সম্প্রসারিত করবে। –২৬(খ) দফা।

(গ) সন্তানরা কী ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত হবে তা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাদের বাবা-মা-ই ঠিক করবে। –২৬ (গ) দফা

২৭) (ক) প্রত্যেকেরই তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক আচার ও অনুষ্ঠান যথারীতি পালন, শিল্পকলা উপভোগ করা এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও তার সুফল ভোগ করার অধিকার রয়েছে। –২৭(ক) দফা

(খ) শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে যারা মৌলিক অবদান রেখেছে, তাদের অধিকার আছে সংশ্লিষ্ট অবদানের স্বত্ব ও বৈষয়িক স্বার্থ সংরক্ষণ করার। –২৭(খ) দফা

২৮) প্রত্যেকেই মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রে বর্ণিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতাকে যথাযথ বাস্তবায়িত করার জন্য সামাজিক ও আন্তর্জাতিকপর্যায়ে অংশগ্রহণের দাবিদার। – ২৮ দফা

২৯) (ক) সে সমাজের প্রতি একজন মানুষের একনিষ্ঠ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, যেখানে সে তার নিজের ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণভাবে এবং নির্বিঘ্নে গড়ে তুলতে সক্ষম। –২৯ (ক) দফা

(খ) একটি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় একজন মানুষের স্বাধীনতা এবং অধিকারকে আইনের সীমাবদ্ধ পরিমন্ডলে কেবলমাত্র অপরের অধিকার, স্বাধীনতার মর্যাদা ও স্বীকৃতির জন্য মানবিক মূল্যবোধের প্রয়োজনে, জনজীবনের শৃঙ্খলা রক্ষার্থে এবং সাধারণ কল্যাণমুখী কাজের জন্য সুচারুভাবে ব্যবহার করতে পারবে। –২৯(খ) দফা

৩০) অত্র ঘোষণাপত্রের বর্ণিত কোনো ধারাকে বিশেষ কোনো রাষ্ট্র, গোষ্ঠী বা ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে চিহ্নিত করা যাবে না বা কোনো ধারাকে এমন কোনো কাজের উদ্দেশ্যে অবাধে ব্যবহার করা যাবে না বা ব্যাখ্যা করা চলবে না, যা দ্বারা এ ঘোষণায় বর্ণিত অন্য যেকোনো অধিকার ও স্বাধীনতাকে খর্ব করা যাবে। –৩০ দফা

মানবাধিকারের ঘোষণা: মূলকথা

১. সমমর্যাদা, সমতা, সমঅধিকার, এবং ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ পাওয়ার অধিকার;
২. বৈষম্য থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকার;
৩. জীবন, স্বাধীনতা ও দৈহিক নিরাপত্তার অধিকার;
৪. দাসত্ব থেকে মুক্তির অধিকার;
৫. নির্যাতন ও অবমূল্যায়ন থেকে মুক্তির অধিকার;
৬. আইনের চোখে একজন ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার;
৭. আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান– এই অধিকার পাওয়ার অধিকার;
৮. উপযুক্ত আদালত থেকে বিচার পাওয়ার অধিকার;
৯. বেআইনী আটক ও বন্দিদশা থেকে মুক্তি লাভের অধিকার;
১০. নিরপেক্ষ ও প্রকাশ্য শুনানীর অধিকার;
১১. অপরাধ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ ব্যক্তির মতো আচরণ পাওয়ার অধিকার;
১২. পরিবারে, বাড়িতে এবং পত্র যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার;
১৩. নিজ দেশে স্বাধীনভাবে চলাফেরা এবং অন্য কোনো দেশে যাওয়া ও আসার অধিকার;
১৪. নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্য দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়ার অধিকার;
১৫. জাতীয়তা পাওয়া এবং পরিবর্তন করার অধিকার;
১৬. বিয়ে করা পরিবার গঠন করার এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার;
১৭. সম্পত্তির মালিক হবার অধিকার;
১৮. নিজস্ব বিশ্বাস লালন ও ধর্ম পালনের স্বাধীনতার অধিকার;
১৯. মতামত দেয়া ও তথ্য পাওয়ার স্বাধীনতার অধিকার;
২০. শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ ও সংগঠন করার অধিকার;

২১. মুক্ত নির্বাচন ও সরকার গঠনে অংশগ্রহণের অধিকার;
২২. সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার;
২৩. কাঙ্ক্ষিত কাজ ও ন্যায্য মজুরি পাওয়ার এবং ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার;
২৪. অবসর ও বিশ্রাম পাওয়ার অধিকার;
২৫. স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন যাপনের অধিকার;
২৬. অবৈতনিক প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা লাভের অধিকার;
২৭. সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণের অধিকার;
২৮. অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের অধিকার;
২৯. মানবাধিকার রক্ষাকল্পে সমাজের কর্তব্য পালন এবং নিজ ব্যক্তিত্বে পূর্ণ বিকাশ লাভের অধিকার; এবং
৩০.উপর্যুক্ত অধিকারগুলোর ব্যাপারে রাষ্ট্র ও ব্যক্তির হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার।

সংযোজনী ৩: মানসম্মত মৌলিক/প্রাথমিক শিক্ষার মাপকাঠি

মাপকাঠি ১: মানসম্পন্ন শিক্ষার্থীসংক্রান্ত

- সাক্ষরতায় দক্ষ বা পারদর্শী
- স্ব-নির্ভর পাঠক
- লেখার ক্ষেত্রে স্ব-নির্ভর ও সৃজনশীল (অর্থাৎ, মনের ভাব প্রকাশ করে নিজের মতো লিখতে পারে)
- পাঠাভ্যাস তৈরি হয়েছে
- গাণিতিক সমস্যা সমাধানে সক্ষম
- বিজ্ঞান মনস্ক ও সমাজ-সচেতন
- শিল্পকলা অর্থাৎ চিত্রাঙ্কন, সংগীত ও অভিনয়ে পারদর্শী

মাপকাঠি ২: মানসম্পন্ন শিক্ষকের মাপকাঠি

- নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
- শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক শ্রেণীপাঠনায় পারদর্শী
- জেন্ডার-সচেতন ও অনুভূতিপ্রবণ
- বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানসম্পন্ন
- যোগাযোগ দক্ষতাসম্পন্ন
- শিক্ষকতা পেশা ও শিশুদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন

মাপকাঠি ৩: শ্রেণী ব্যবস্থাপনা

- দলগত শিখন এবং সক্রিয় শিখন-প্রক্রিয়া প্রয়োগের পরিবেশ বিদ্যমান
- শিক্ষক শিক্ষার্থী অনুপাত (১:৩০)
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক উদার এবং যুগপোযোগী ও জীবন-ঘনিষ্ঠ শিক্ষাক্রম
- সময়ের সদ্ব্যবহার
- সহজগম্য ও সহজলভ্য আকর্ষণীয় পাঠোপকরণ

মাপকাঠি ৪: শিক্ষা উপকরণ

- আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক
- জীবনঘনিষ্ঠ
- বিষয়ভিত্তিক
- মাঠপর্যায়ে যাচাইয়ের পর প্রকাশিত

মাপকাঠি ৫: যা অর্জন করতে হবে

- পূর্বনির্ধারিত প্রান্তিক যোগ্যতা
- বিষয়ভিত্তিক সক্ষমতা
- পাক্ষিক, মাসিক ও বার্ষিক মূল্যায়ন
- প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা

মাপকাঠি ৬: কারিকুলাম

- শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক
- শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা কেন্দ্রিক ও কর্মমুখী
- সমাজ ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
- জাতীয় চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
- জীবন দক্ষতাসমৃদ্ধ
- জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সমৃদ্ধ
- সমন্বিত, সহ-পাঠক্রমিক এবং বিষয়ভিত্তিক কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ

মাপকাঠি ৮: মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মাপকাঠি

বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থাপনা আলোচনা করা যেতে পারে। এখানে স্কুলপর্যায়ের কিছু মাপকাঠি তুলে ধরা হলো:

- অবকাঠামোগত সুবিধা নিশ্চিত করা
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (পুনঃপুন ও সম্পূরক) ফলপ্রসূ করা
- শিক্ষা-উপকরণ নিয়মিত সরবরাহ করা
- কার্যকর অ্যাকাডেমিক সুপারভিশন নিশ্চিত করা
- পিটিএ ও এসএমসি'র কার্যকর তৎপরতা নিশ্চিত করা
- শিক্ষার্থীদের নিয়মিত মূল্যায়ন করা
- শিক্ষক-অভিভাবক সভায় ফলপ্রসূ ও বাস্তব মতামত বিনিময় নিশ্চিত করা

সংযোজনী ৪: বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক ধারা (টাইম লাইন)

শিক্ষাসম্পর্কিত আলোচনা ও নীতিমালাসংক্রান্ত কালপঞ্জি: ১৮৫৪- ২০১১

১৮৫৪ 'ব্রিটিশ হাউজ অফ কমন্স' উড'স-এর শিক্ষা রিপোর্ট, ১৮৫৪ অনুমোদন করে। এটি বাংলায় আধুনিক সাধারণ শিক্ষার আইনগত ভিত্তি প্রদান করে।

১৮৫৯ লর্ড স্ট্যানলি এ-মর্মে সুপারিশ করেন যে, সরকারের সরাসরিভাবে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। ১৮৫৯-এর রিপোর্টে আরও সুপারিশ করা হয় যে, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় মেটানোর জন্য প্রয়োজনবোধে স্থানীয়ভাবে করারোপ করা উচিত।

১৮৭১ লর্ড মেয়ো শিক্ষাবিভাগ থেকে অর্জিত আয় শিক্ষাপ্রকল্পে ব্যয়ের জন্য প্রাদেশিক সরকারকে কর্তৃত্ব প্রদান করেন।

১৮৭৭ বিকেন্দ্রীকরণ নীতির আওতায় লর্ড লিটন পঞ্চ-বার্ষিকী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করেন, যার ফলে শিক্ষা পাঁচ বছরের জন্য প্রাদেশিক সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আসে। তদুপরি আইন ও আবগারী বিভাগ থেকে অর্জিত আয়ের একাংশ শিক্ষাসম্পর্কিত বিষয়ের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার দেশব্যাপী শিক্ষানীতি নির্ধারণের ক্ষমতা নিজ হাতে সংরক্ষণ করে। এ ব্যবস্থা ১৮৮২ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকে।

১৮৮২ লর্ড হান্টারকে চেয়ারপার্সন করে লর্ড রিপন ১৮৮২-র ৩ ফেব্রুয়ারিতে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন।

১৯০১ সিমলায় সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯০৪ ১৯০৪ সালের ১১ মার্চ লর্ড কার্জন সরকারি সিদ্ধান্তের আকারে তার শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন।

১৯০৫ স্বদেশী আন্দোলনের অংশ হিসেবে জাতীয় শিক্ষাপর্ষদ গঠিত হয়। এর উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন স্যার গুরুদাস ব্যানার্জী, রাসবিহারী ঘোষ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯০৬ কলকাতা থেকে ১৯০৬ সনে জাপানী শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর একটা সরকারি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

১৯১০ ১৯১০ সালের আগে শিক্ষা ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের আওতাধীন ছিল। ১৯১০ সাল থেকে ভূমি ও স্বাস্থ্য এ দুটি বিভাগও নবগঠিত শিক্ষা বিভাগের সাথে যুক্ত করা হয়।

১৯১২ ১৯১২ সালে বিনাবেতনে মৌলিক শিক্ষা চালু হয়।

১৯১৩ ১৯১৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি, তারিখে ভারত সরকার শিক্ষানীতির প্রস্তাব পাশ করে।

১৯৩০ ১৯৩০ সালের 'বেঙ্গল এডুকেশন বোর্ড' আইন পাশ হওয়া একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা; এর আওতায় দেশে স্কুল বোর্ড গঠিত হয়। আর এটিই হয় প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসনিক দপ্তর।

১৯৩৫ ১৯২৭ সালের হার্টজ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়, যার ওপর শিক্ষার সকল বিষয় সমন্বয় করার দায়িত্ব অর্পিত হয়।

১৯৩৭ এগারোটি প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন চালু হয়। মহাত্মা গান্ধী শিক্ষার জন্য বাস্তবসম্মত ও উপযোগী Wardhar Scheme -এর ধারণা উপস্থাপনা করেন। জনগণের জন্য নিখরচা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত ছিল এতে। এ প্রকল্পের অন্যতম চিন্তা ছিল কুটির শিল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান।

১৯৪৫ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একটি পৃথক শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এর দায়িত্ব দেয়া হয় কেন্দ্রীয় প্রশাসকের একজন সদস্যকে।

১৯৪৭ ব্রিটিশ ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন দেশ জন্ম লাভ করে। ১৯৪৭ সালে ২৭ নভেম্বর হতে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে করাচিতে প্রথম শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৪৯ মওলানা আকরাম খান শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়।

১৯৫১ ১৯৫১ সালের ৪-৬ ডিসেম্বর করাচীতে দ্বিতীয় শিক্ষা কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৫২ প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী প্রকল্প তৈরি হয় এবং এতে শিক্ষা খাত অগ্রাধিকার পায়।

১৯৫৮ সামরিক শাসন জারি হয় এবং শিক্ষার জন্য শরিফ কমিশন গঠিত হয়।

১৯৬১ মাধ্যমিক স্কুলসমূহের ব্যবস্থাপনার জন্য গঠিত 'দি ইস্ট পাকিস্তান ইন্টারমিডিয়েট এ্যান্ড সেকেন্ডারি এডুকেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৬১'তে আইনগত বিধান সন্নিবেশ করা হয়।

১৯৬২-৬৪ শরিফ কমিশনের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়; ছাত্ররা গণমুখী শিক্ষানীতি দাবি করে। ফলে ১৯৬৪ সালে নতুন বিচারপতি হামিদুর রহমানের নেতৃত্বে নতুন শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। কমিশন একই বছর তার রিপোর্ট পেশ করে।

১৯৬৯ আইয়ুব খানের রাজত্ব শেষে এয়ার মার্শাল নুর খানের নেতৃত্বে নতুন শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। কমিশন একই বছরে রিপোর্ট প্রদান করে।

১৯৭১ স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভব হয়।

১৯৭২ ডঃ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। কমিশন পরের বছর রিপোর্ট প্রদান করে।

১৯৭৪ প্রাথমিক বিদ্যালয় (অধিগ্রহণ) আইন পাশ হয়। এতে বিনাবেতনে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। আইন করে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা জেলা বোর্ড থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বদল করা হয়। এ বছরে কুদরত-ই-খুদা কমিশন চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে।

১৯৭৮-৭৯ একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয় যা ১৯৭৯ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট পেশ করে। মাদ্রাসা শিক্ষা অধ্যাদেশ (১৯৭৮) জারি করা হয়।

১৯৮০ মাদ্রাসা শিক্ষা অধ্যাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই দশক থেকে মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপক প্রসার আরম্ভ হয়।

১৯৮১ প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৮১ ডিক্রী আকারে জারি হয়; এর আওতায় মহকুমা পর্যায়ে (যা পরবর্তীতে জেলা হয়) স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের সংস্থান রাখা হয়। তবে এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

১৯৮৭ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বিরোধিতার মুখে প্রাক-বিদ্যালয় (শিশু শ্রেণী) কার্যত বন্ধ করা হয়।

১৯৮৯ এক সার্কুলারের মাধ্যমে, প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজী ভাষা চালু করা হয়। পূর্বে তা তৃতীয় শ্রেণী থেকে পড়ানো হতো। ১৯৯০ সংবিধানের বাধ্যবাধকতা অনুসারে অবৈতনিক, সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন (The Compulsory Primary Education Act: CPE) প্রণীত হয়।

১৯৯১ বেসরকারি শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন পাশ হয়। সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম (পরবর্তীতে DNFE) চালু হয়।

১৯৯২ দেশের ৬৪ জেলার ৬৮ থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা হয়।

সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের আওতায় ১৯৯২-৯৪ সালে একটি জাতীয় প্রকল্পের অধীনে ৪-৫ বছর বয়সী ৬৭,৫০০ শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদানের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

১৯৯৩ পুরো দেশকে CPE কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা হয়। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কার্যক্রম চালু হয়।

১৯৯৪ মাদ্রাসাসমূহ পুনঃনির্মাণের লক্ষ্যে ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক সহায়তা করে।

১৯৯৫ সরকারের আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটা সমগ্রিক কার্যক্রম হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রম (PEDP) চালু হয়।

১৯৯৭ শামসুল হক শিক্ষা কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বছরেই এর রিপোর্ট পেশ করা হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহকে এ, বি, সি, ও ডি গ্রেডে বিন্যাসকরণের বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়।

১৯৯৯ প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা-১ (National Plan of Action-1) অনুমোদিত হয়।

এনজিও পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এনসিটিবির বই প্রদানের সিদ্ধাত গৃহীত হয়।

বেসরকারি ইংরেজী স্কুল নিবন্ধকরণ বিধিমালা তৈরি করা হয়।

২০০০ ‘সবার জন্য শিক্ষা’ নীতি গ্রহণ করা হয়।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার একত্রিভূতকরণের সুপারিশ করে।

প্রাথমিক শিক্ষা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন প্রণয়ন করা হয়।

২০০১ মনিরুজ্জামান মিয়া শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়।

২০০২ বৃত্তি কার্যক্রম ও শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কার্যক্রমকে সমন্বিত করে প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম প্রতিষ্ঠিত হয়; এর আওতায় ৪০% প্রাথমিক ছাত্রকে আর্থিক বৃত্তি প্রদানের সংস্থান রাখা হয়।

২০০৩ DNFE রহিত করা হয়।

বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ ট্রাষ্ট প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়।

২০০৪ মনিরুজ্জামান মিয়া কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করে।

চারশত কোটি টাকার ব্যয়বরাদ্দসমৃদ্ধ Reaching Out of School Children (রস্ক প্রকল্প) বিশ্বব্যাংকের অর্থ সহায়তায় কাজ শুরু করে। পাশাপাশি ৫৫০০ কোটি টাকার ব্যয়বরাদ্দ সম্বলিত পিইডিপি-২ চালু হয়; এই প্রকল্পের মেয়াদকাল ছিল ২০০৫-২০০৯।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে নাগরিকদের উদ্যোগে সুশিক্ষা আন্দোলন গঠিত হয়।

২০০৫ পিআরএসপি-র চূড়ান্ত রির্পোট প্রকাশ করা হয়।

প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর বিবিএস-খানা পর্যয়ের আয়-ব্যয় জরিপ এইচআইইএস (HIES) জরিপ জাতীয়ভাবে প্রতিনিধিত্বশীল ও গ্রহণযোগ্য খানার নমুনা নিয়ে পরিচালনা করে থাকে। এই জরিপের মাধ্যমে খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভুত ব্যয়, খানার আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহ যেমন শিক্ষাবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

২০০৬ বিবিএস/ইউনিসেফ-মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্ল্যাস্টার জরিপ (MICS) আর্ন্তজাতিক কার্যক্রমের একটি অংশ। এই জরিপের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নারী ও শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরার জন্য মূলত: সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ২০০৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বশীল ৬২,০০০ খানার নমুনা নিয়ে এ জরিপ পরিচালিত হয়েছে (জেলাভিত্তিক প্রতিনিধিত্বশীল নমুনা চয়ন ও এই তথ্য সংগ্রহ করা হয়)।

২০০৭ প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ক জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা ২০০৩-২০১৫ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনণালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

২০০৮ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ক কর্ম-কাঠামো (Frame-work) গৃহীত হয়। ১৫০০ গ্রামের তালিকা তৈরি করা হয়, যেখানে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই।

২০০৯ প্রফেসর কবির চৌধুরী নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়।

পঞ্চম শ্রেণীতে প্রথম সমাপনী পরীক্ষা আরম্ভ হয়।

প্রথম প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) কর্তৃক বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০১১ (ASPR) তৈরি হয়।

এডুকেশন ওয়াচ গণসাক্ষরতা অভিযানের (CAMPE) নিয়মিত গবেষণা কর্মসূচির একটি অংশ। এ কাজে CAMPE ৪৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ২৪,০০০ খানার উপর এই জরিপ পরিচালনা করেছে। এ প্রতিবেদনটি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ প্রতিবেদনের সাথে CAMPE প্রকাশিতব্য পূর্ববর্তী প্রতিবেদনের যোগসূত্র আছে। এতে ১৯৯৮-২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার কিছু সূচকের অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, CAMPE এ প্রতিদেনটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে যাচ্ছে।

২০১০ ২০১০ সালের HIES জরিপের ফলাফল প্রক্রিয়াধীন।

বিবিএস/ইউনিসেফ-মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার জরিপ (MICS) আন্তর্জাতিক কার্যক্রমের একটি অংশ। এই জরিপের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নারী ও শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরার জন্য মূলত: সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

প্রফেসর কবির চৌধুরী কমিশন রির্পোট ‘শিক্ষা নীতি ২০১০’ হিসেবে সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০১১ (ASPR) প্রকাশিত হয়।

২০১১ ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (PEDP-III) গৃহীত ও কার্যক্রম শুরু হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০১১ (ASPR) প্রকাশিত হয়।

(তথ্য সূত্রঃ খন্দকার সাখাওয়াত আলী, সম্পাদক, হালখাতা ১৪১৫/২০০৮)

সংযোজনী ৫: প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক) আইন ১৯৯০

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনগুলি ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০ (১লা ফল্গুন, ১৩৯৬) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনসমূহ সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়েছে।

১৯৯০ সালের আইন (প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করণকল্পে আইন)

যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম। এই আইন প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলককরণ) আইন, ১৯৯০ নামে অভিহিত হইবে।

২. সংজ্ঞা। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই আইনে -

(ক) “অভিভাবক” অর্থ শিশুর পিতা বা মাতার অবর্তমানে মাতা বা উভয়ের অবর্তমানে শিশুর তত্ত্বাবধানে রহিয়াছেন এমন কোনো ব্যক্তি;

(খ) “কমিটি ” অর্থ ধারা ৪ এর অধীন গঠিত বাধ্যতামূলক শিক্ষা কমিটি;

(গ) “প্রাথমিক শিক্ষা” অর্থ শিশুদের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বা অনুমোদিত শিক্ষা;

(ঘ) “প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান” অর্থ যেকোনো সরকারি বা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

(ঙ) “শিশু” অর্থ ছয় বৎসরের অধিক নহে এইরূপ বয়সের যেকোন বালক বা বালিকা।

৩. প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলককরণ:

(১) সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, দেশের যেকোনো এলাকার যেকোন তারিখ হইতে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে পারবে।

(২) যে এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইবে, সেই এলাকায় বসবাসরত প্রত্যেক শিশুর অভিভাবক তাহার শিশুকে, যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকিলে, প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে উক্ত এলাকায় অবস্থিত তাহার বাসস্থানের নিকটস্থ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাইবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লেখিত “যুক্তিসঙ্গত কারণ” বলিতে নিম্নলিখিত কারণগুলি বুঝাইবে, যথা:

(ক) অসুস্থতা বা অন্য কোনো অনিবার্য কারণে কোনো প্রাথমিক শিক্ষা প্রতষ্ঠানে ভর্তি করা সম্ভব না হওয়া;

(খ) শিশুর আবাসস্থল হইতে দুই কিলোমিটারের মধ্যে কোনো প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকা;

(গ) আবেদন করা সত্ত্বেও শিশুকে কোনোপ্রাথমিক প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাইতে না পারা;

(ঘ) প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের বিবেচনায় শিশুর মানসিক অক্ষমতার কারণে তাহাকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানো বাঞ্ছনীয় না হওয়া।

(৪) যে এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইবে, সেই এলাকায় কোনো ব্যক্তি কোনো শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণের জন্য হাজির হওয়ার ব্যাপারে বিঘ্নের সৃষ্টি করিতে পারে, এমন কোনো কাজকর্মে ব্যাপৃত রাখিতে পারিবেন না।

৪. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ওয়ার্ড কমিটি

(১) যে এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইবে, সেই এলাকায় ইউনিয়ন বা পৌর এলাকাসমূহের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ওয়ার্ড কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে।

(২) কোনো ইউনিয়নের ওয়ার্ডের জন্য কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য-সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:

ক. উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন ওয়ার্ড মেম্বার, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

খ. ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সহিত আলোচনাক্রমে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত দুইজন বিদ্যোৎসাহী পুরুষ;

গ. ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সহিত আলোচা ক্রমে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত দুইজন বিদ্যোৎসাহী মহিলা;

ঘ. প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী, যিনি উহার সচিবও হইবেন;

(৩) কোনো পৌর এলাকার ওয়ার্ডের জন্য কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য-সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:

ক. পৌর কর্পোরেশনের মেয়র বা পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন ওয়ার্ড কমিশনার, যিনি উহার চেয়ারম্যান হইবেন;

খ. ওয়ার্ড কমিশনারের সহিত আলোচনাক্রমে উক্ত মেয়র বা চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত দুইজন বিদ্যোৎসাহী পুরুষ;

গ. ওয়ার্ড কমিশনারের সহিত আলোচনাক্রমে উক্ত মেয়র বা চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত দুইজন বিদ্যোৎসাহী মহিলা;

ঘ. প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী, যিনি উহার সচিবও হইবেন।

(৫) যদি কোনো ওয়ার্ডে একাধিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকে, তাহা হইলে উহাদের প্রত্যেকটির প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী কমিটির সদস্য হইবেন এবং উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বা ক্ষেত্রমত, পৌর কর্পোরেশনের মেয়র বা পৌরসভার চেয়ারম্যান তাহাদের মধ্য হইতে কে কমিটির সচিব হইবেন তাহা নির্ধারণ করিবেন

৫. কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক. কমিটি উহার এলাকায় বসবাসরত প্রত্যেক শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া এবং রীতিমত হাজির হওয়া নিশ্চিত করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কমিটি উহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় বা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

খ. কমিটি উহার এলাকায় বসবাসরত সকল শিশুর একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে এবং উহাতে প্রত্যেক শিশুর নাম, অভিভাবকের নাম ও শিশুর বয়স উল্লেখ থাকিবে এবং উহাতে এই আইনের অধীন যাহারা প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হহেতে বাধ্য এবং যাহারা এই ভর্তি হইতে অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য তাহাদের নাম স্বতন্ত্রভাবে প্রদর্শিত হইবে।

গ. উপধারা-খ-এর অধীন প্রণীত তালিকা প্রত্যেক বৎসর ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে সংশোধিত হইবে এবং এই সংশোধিত তালিকা হইতে যাহারা নববর্ষের শুরুতে শিশু থাকিবে না তাহাদের নাম বাদ পড়িবে এবং যাহারা শিশু হইবে তাহাদের নাম উহাতে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ঘ. উপধারা-খ এ উল্লিখিত তালিকা এবং উপধারা-গ এ উল্লিখিত সংশোধিত তালিকার একটি করিয়া অনুলিপি প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড হইতে দুই কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত এলাকার প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

ঙ. প্রত্যেক বৎসর জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে প্রত্যেক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী তাহার প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার শিশুদের নামের একটি তালিকা সংশ্লিষ্ট কমিটি এবং প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

চ. প্রত্যেক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে তাহার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পূর্ববর্তী মাসে অন্ততঃ সাত দিন অনুপস্থিত ছিল, এইরূপ শিশুদের একটি তালিকা সংশ্লিষ্ট কমিটি এবং প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

ছ. যেক্ষেত্রে কমিটি দেখিতে পায় যে, উপরের তালিকাভুক্ত কোনো শিশু যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয় নাই; বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষীয়ত্রীর বিনা অনুমতিতে মাসের মধ্যে অন্তত সাত দিন অনুপস্থিত রহিয়াছে ,সেক্ষেত্রে কমিটি শিশুর অভিভাবকের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া এবং প্রয়োজনবোধে বিষয়টি তদন্ত করিয়া উক্ত অভিভাবককে ভর্তি না হওয়ার ক্ষেত্রে, ওই শিশুকে কমিটি কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাইবার জন্য এবং অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাহার যথারীতি উপস্থিতি নিশ্চিত করিবার জন্য লিখিভাবে নির্দেশ দিতে পারিবে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ওয়ার্ড কমিটি

কমিটির গঠন

ওয়ার্ড সদস্য	চেয়ারম্যান
শিক্ষানুরাগী পুরুষ ২ জন	সদস্য
শিক্ষানুরাগী নারী ২ জন	সদস্য
সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক	সদস্য
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (মনোনীত)	সদস্য-সচিব

কমিটির দায়িত্ব:

- ৬-১০ বছরের সকল শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ও হাজিরা নিশ্চিত করা।
- ওয়ার্ডে বসবাসরত সকল শিশুর তালিকা তৈরি করা।
- প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসে সংশোধিত তালিকা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের দু'কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠানো।
- কোনো শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি না হলে অভিভাবকের বক্তব্য শোনা ও তদন্ত করা। বিদ্যালয়ে ৭ দিন অনুপস্থিত থাকলে, অনুপস্থিতির জন্যে অভিভাবককে লিখিতভাবে জানানো।

৬. দণ্ড

ক. যদি কোনো কমিটি এই আইনের অধীন উহার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে, উহার প্রত্যেক সদস্য অনধিক দুইশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

খ. যদি কোনো অভিভাবক ধারা-৫(ছ)-এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পালনে পরপর তিনবার ব্যর্থ হন, তাহা হইলে, তিনি অনধিক দুইশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৭. অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ

কমিটির চেয়ারম্যানের লিখিত অভিযোগ ছাড়া কোনো আদালত এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৮. বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় কমিটি– ওয়ার্ড কমিটি ছাড়াও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়ের জন্য নিম্নরূপ ইউনিয়ন কমিটিও গঠনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে:

ইউনিয়ন কমিটি:

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	সভাপতি
ইউনিয়ন পরিষদ এর সকল সদস্য	সদস্য
ইউনয়নে কর্মরত সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ওয়ার্ড কমিটির সকল সদস্য সচিব	সদস্য
শিক্ষানুরাগী একজন পুরুষ	সদস্য
শিক্ষানুরাগী একজন মহিলা	সদস্য
কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য	সদস্য সচিব

কমিটির দায়িত্ব

ওয়ার্ড কমিটিগুলোর কাজ তদারক ও সমন্বয়। কমিটিগুলোকে প্রয়োজনীয় সাহায্য, সহযোগিতা, নির্দেশনা দেওয়া। প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হওয়া এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে থানা কমিটিকে অবহিত করা।

সংযোজনী ৬: বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও কাঠামো

সরকার কর্তৃক গৃহীত আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের। দেশজুড়ে প্রাথমিক শিক্ষার বিশাল কর্মকাণ্ড পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে আরও একটি সংস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। এটি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট। উল্লিখিত দুটি প্রতিষ্ঠানই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এ মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আরও একটি অধিদপ্তর রয়েছে। এটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর নামে পরিচিত। এটি বিভিন্ন ধরনের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

মাঠপর্যায়ে ৬৪টি জেলা অফিস, ৪৮১টি উপজেলা/থানা অফিস, ৫৪টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট ও একটি প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়াও, ৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত প্রকল্পের আওতায় অধিকাংশ উপজেলায় একটি করে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। যে সমস্ত বিদ্যালয়কে ঘিরে এসব দপ্তর তাদের ক্রিয়াকর্ম চালাচ্ছে তাদের মধ্যে ৩৭,৬৭১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫৩টি এক্সপেরিমেন্টাল বিদ্যালয়, ১৯,৪২৮টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৩,২৬৮টি কমিউনিটি বিদ্যালয় রয়েছে। ১০ ধরনের মধ্যে ৪ ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শনের দায়িত্ব প্রধানত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের। বাকি ৬ ধরনের প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয়ের উপর এখনও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিশেষ কোনো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠনিক স্তরবিন্যাস–বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠনিক স্তরবিন্যাস নিচে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:

ক. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশে মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় প্রশাসনিক ও অন্যান্য যাবতীয় দিকগুলো সম্পন্ন করে থাকে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয়পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ও দায়িত্ব এই মন্ত্রণালয়ের। থানাপর্যায়ে শিক্ষা কর্মকর্তা হলেন এ মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী কর্মকর্তা। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতের জন্য যাবতীয় কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন
২. প্রাথমিক ও গণশিক্ষার জন্য উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন
৩. অনানুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমসহ গণশিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা

৪. প্রাথমিক ও গণশিক্ষার জন্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন
৫. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ
৬. সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রচারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ
৭. প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় সংস্কারমূলক নীতি প্রণয়ন
৮. প্রাথমিক ও গণশিক্ষার জন্য কারিকুলাম উন্নয়ন
৯. প্রাথমিক ও গণশিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণ
১০. সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে, যেমন–জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতের উন্নয়নসংক্রান্ত প্রকল্প উপস্থাপন ও প্রক্রিয়াকরণ এবং মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।
১১. গণশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার বিষয়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সমন্বয় করা
১২. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ক্ষেত্রে জড়িত সংস্থাগুলোকে সমর্থন দেয়া; গণশিক্ষা গবেষণা কাজে অর্থায়ন করা
১৩. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ক্ষেত্রে বিদেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছ থেকে তহবিল ব্যবস্থাপনা
১৪. সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পেশাগত উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও গবেষণা করা
১৫. বিভাগের সচিবালয় প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা তদারকিসহ বিভাগের অধিনস্থ দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ
১৬. বিভাগের যেকোনো অনুসন্ধান ও পরিসংখ্যান নিশ্চিত করা

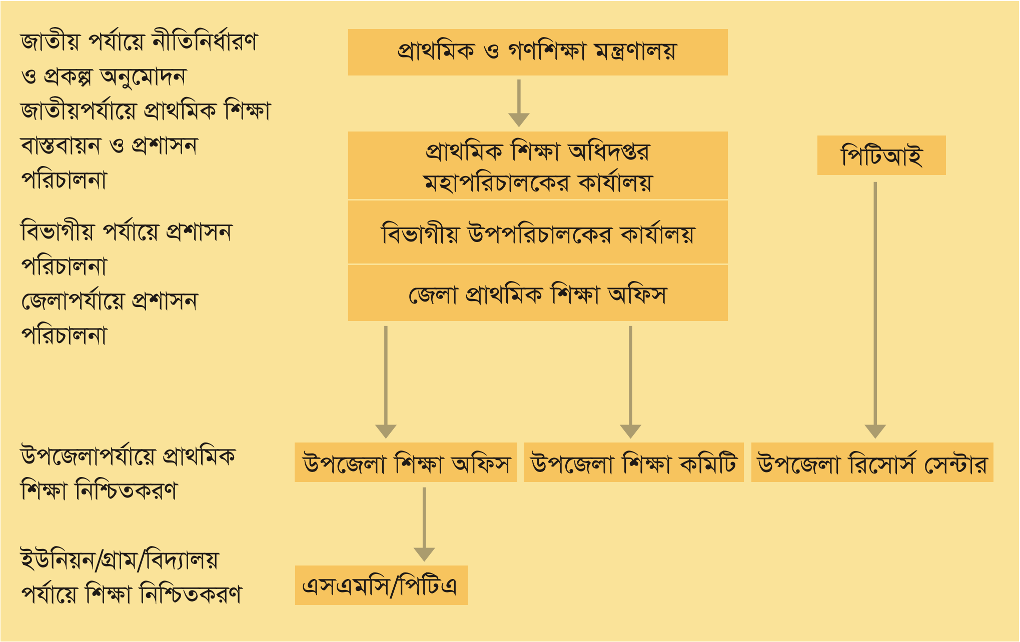

খ. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর– প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহির দায়িত্বে আছেন একজন মহাপরিচালক। তাকে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সহায়তা করার জন্য আছেন ৫ জন পরিচালক: পরিচালক (প্রশাসন), পরিচালক (পরিকল্পনা), পরিচালক (প্রশিক্ষণ), পরিচালক (পরিবীক্ষণ) ও পরিচালক (অর্থ)। প্রতি পরিচালকের সাথে উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক, শিক্ষা অফিসার, গবেষণা অফিসার যুক্ত থেকে তার কাজে সাহায্য করছেন। এ ছাড়াও এম.আই.এস. কোষে একজন সিস্টেম এনালিস্ট ও প্রোগ্রামার অধিদপ্তরের তথ্য সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সরবরাহের দায়িত্ব পালন করছেন। বিষয়ভিত্তিক প্রতিটি ডেস্কের দায়িত্ব পালন করে থাকেন একজন সহকারি পরিচালক। কেন্দ্রীয়পর্যায়ে এ কার্যালয়টি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত 'পলিসি' বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

এছাড়াও রয়েছে ৭টি বিভাগে ৭জন উপ-পরিচালক ও পাঁচজন সহকারি পরিচালক। প্রশাসনিক স্তর-বিন্যাস অনুযায়ী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং সহকারি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা রয়েছে। স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) গঠিত হয়েছে। এর প্রধান হলেন মহাপরিচালক।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ক্ষমতা ও কার্যাবলী- প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নির্বাহী স্তর হিসেবে অধিদপ্তরের প্রধান প্রশাসনিক ও তত্ত্বাবধায়নিক কার্যাবলী হচ্ছে:

১। বিভাগীয় ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর, উপজেলা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকসম্পর্কিত প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান

২। প্রাথমিক শিক্ষাসম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ দান

৩। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

৪। অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন স্তরের অফিস ও প্রতিষ্ঠানের প্রশাসক, পরিদর্শক, অন্যান্য কর্মচারী এবং শিক্ষকগণের পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

৫। পিটিআই বা প্রাইমারী ট্রেনিং ইন্সটিটিউট-এর উন্নয়ন

৬। প্রাথমিক শিক্ষার বাজেট প্রণয়ন এবং বরাদ্দকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

৭। অধিদপ্তরের অধীন নন-ক্যাডার, কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি

৮। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ (অধিদপ্তরের এসব প্রধান প্রধান দায়িত্ব বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের ওপর বণ্টন করা আছে)।

গ. বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়– বর্তমানে প্রশাসনিক প্রতিটি বিভাগে একটি করে মোট ৭টি বিভাগীয় উপ-পরিচালকের কার্যালয় রয়েছে। এ কার্যালয়ের প্রধান নির্বাহী বিভাগীয় উপ-পরিচালক। এ ছাড়াও ১জন সহকারি পরিচালক ও ১জন শিক্ষা অফিসার রয়েছেন। উপ-পরিচালক, সহকারি পরিচালক ও শিক্ষা অফিসারকে অফিসের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও নিয়মিত নির্দিষ্টসংখ্যক বিদ্যালয় ও অধঃস্তন কার্যালয় পরিদর্শন করতে হয়। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় এ কার্যালয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন এ কার্যালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও চালুর জন্য এ কার্যালয় থেকে অনুমতিপত্র জারি করা হয়। অস্থায়ী ও স্থায়ী রেজিস্ট্রেশনের দায়িত্ব এ কার্যালয়ের। অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সাথে সাথে এ অফিস থেকেও আওতাধীন পিটিআইগুলো নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। বিভাগের মধ্যে শিক্ষক ও কর্মচারীদের আন্তঃজেলা বদলীর দায়িত্বও এ কার্যালয়ের।

ঘ. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস– দেশের ৬৪টি জেলা সদরে একটি করে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস নিজস্ব ভবনে প্রতিষ্ঠিত। মহাপরিচালকের জেলা প্রতিনিধি হিসেবে জেলাস্থ প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত সব কর্মকাণ্ডে এ দপ্তরটি জড়িত রয়েছে। এর প্রধান নির্বাহি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (ডিপিইও)। তার অধীনে একাধিক সহকারি জেলা শিক্ষা অফিসার, একজন সহকারি মনিটরিং অফিসার ছাড়াও উচ্চমান সহকারি, ক্যাশিয়ার, অফিস সহকারি কাম টাইপিস্ট, একজন ড্রাইভার, নৈশ প্রহরী ও এমএলএসএস রয়েছে।

জেলা কার্যালয়ের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও ডিপিইও-কে প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্টসংখ্যক বিদ্যালয় ও অধীনস্থ উপজেলা শিক্ষা অফিস পরিদর্শন করতে হয়। জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে গঠিত বিভিন্ন বিভাগবহির্ভূত

কমিটির সদস্য হিসেবে ডিপিইও-কে দায়িত্ব পালন করতে হয়। বিদ্যালয়সহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন ও মনিটরিং করা ও নবনির্মিত বিদ্যালয়ভবন বুঝে নেয়ার দায়িত্বও এ কর্মকর্তাকে পালন করতে হয়।

২০০৪ সালের এপ্রিলে জারিকৃত সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (ডিপিইও)–এর প্রধান দায়িত্ব হলো:

১. জেলার প্রাথমিক শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নেতৃত্ব দেয়া;
২. বার্ষিক পরিকল্পনা করা;
৩. উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের পারফরমেন্স বা পারদর্শিতা পরিবীক্ষণ করা;
৪. এই উদ্দেশ্যে মাসে ৩টি উপজেলা শিক্ষা অফিস পরিদর্শন করা;
৫. এ ছাড়াও মাসে ৩টি স্কুল সরেজমিনে পরিদর্শন করা;
৬. উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের নিয়ে মাসে একটি সভা করা;
৭. শিক্ষকদের নিয়োগকর্তা হিসেবে নিয়োগ-পরীক্ষা কমিটির সদস্য-সচিব হিসেব দায়িত্ব পালন করা;
৮. উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের এসিআর বা বার্ষিক গোপন রিপোর্ট লেখা;
৯. উপজেলায় নির্ধারিত সময়ে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ নিশ্চিত করা;
১০. উপজেলাপর্যায়ে উপবৃত্তি কার্যক্রম তদারক করা;
১১. ইউআরসি পরিচালনায় পিটিআই সুপারকে সহায়তা করা।

এ ছাড়াও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত যেকোনো দায়িত্ব পালন করা।

ঙ. উপজেলা শিক্ষা অফিস– এটি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক দপ্তর। এ দপ্তরের দায়িত্বে থাকেন একজন উপজেলা শিক্ষা অফিসার (UEO)। সংশ্লিষ্ট উপজেলায় অবস্থিত সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং এর প্রশাসনিক বিষয়গুলো এ দপ্তর থেকে পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রতিটি উপজেলা শিক্ষা অফিসে বেশ কয়েকজন সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার (এইউইও) থাকেন। এ পদের সংখ্যা নির্ধারিত হয় বিদ্যালয়ের সংখ্যার ওপর। সাধারণত ১৫-২০টি বিদ্যালয় নিয়ে একটি ক্লাস্টার গঠন করা হয়। প্রতিটি ক্লাস্টারের দায়িত্বে থাকেন একজন করে এইউইও।

চ. উপজেলা শিক্ষা অফিসারের দায়িত্বসমূহ– ২০০৪ সালের এপ্রিলে জারিকৃত সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে প্রাথমিক শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে যেসব প্রশাসনিক ও তত্ত্বাবধানিক দায়িত্ব পালন করার কথা। তার প্রধান প্রধানগুলো নিম্নরূপ:

১. উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে বার্ষিক ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন;
২. এসএমসি ও পিটিএ গঠনে এবং তাদের দায়িত্ব যথাযথ পালনে উদ্বুদ্ধ করবেন;
৩. সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের জন্যে ক্লাস্টার বরাদ্দ করবেন;
৪. প্রতিমাসে কমপক্ষে ৫টি স্কুল ভিজিট করবেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন;
৫. নির্ধারিত সময়ে সকল স্কুলে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ নিশ্চিত করবেন;
৬. সহকারি অফিসারগণের নিয়মিত অ্যাকাডেমিক সুপারভিশন নিশ্চিত করবেন;
৭. উপজেলা পর্যায়ে চলমান সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন;
৮. প্রতিমাসে অন্তত একটি সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ পর্যবেক্ষণ করবেন;
৯. বছরে ৩বার (এপ্রিল, আগস্ট ও ডিসেম্বরে মাসের ১১ তারিখ) উপজেলার প্রধান শিক্ষকদের সমন্বয় সভার আয়োজন করবেন;
১০. উপজেলার প্রধান শিক্ষকদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রতিস্বাক্ষর করবেন;

১১. নীতিমালা মোতাবেক উপবৃত্তি বণ্টন তদারক করবেন এবং অর্থ বন্টনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবেন;

১২. উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবেন;

১৩. বার্ষিক সমাপনী পরীক্ষা পরিচালনা করবেন;

১৪. বিদ্যালয়বিষয়ক তথ্যসমূহ প্রদর্শন করে উপজেলার একটি মানচিত্র নিজ কক্ষে টাঙ্গিয়ে রাখবেন;

১৫. উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্বসমূহ পালন করবেন;

১৯৯৩ সালে জারিকৃত প্রজ্ঞাপণ মোতাবেক– রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় অবস্থিত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসসমূহ (অফিস, জনবল, আসবাবপত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র) জেলাগুলোর স্থানীয় সরকার পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এর ফলে এসব জেলার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতাও জেলাগুলোর স্থানীয় সরকার পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ছাড়াও তারা প্রেষণে বা ডেপুটেশনে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের বেতন, ভাতা, নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুরি ও বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন প্রদান ও শৃঙ্খলাজনিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ছ. সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য– উপজেলা শিক্ষা অফিসারের ব্যাপক দায়িত্ব পালনে তাঁকে সহায়তা করার জন্যে রয়েছে ক্লাস্টারভিত্তিতে সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার। ২০০৪ সালে ২১ এপ্রিল, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশিত সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার– এর দায়িত্বগুলো নিচে দেয়া হলো:

১. উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সহযোগে বার্ষিক ও মাসিক কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করবেন; এ পরিকল্পনায় প্রতিমাসে ১০টি বিদ্যালয়ের একাডেমিক তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা থাকবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে একাডেমিক তত্ত্বাবধানের জন্য একদিন ব্যয় করতে হবে, যাতে সকল বিদ্যালয়ের একাডেমিক বিষয় পর্যায়ক্রমে তত্ত্বাবধান করা যায়;

২. শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে শ্রেণীকক্ষের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন;

৩. বিদ্যালয়ে একাডেমিক তত্ত্বাবধান শেষে বিদ্যালয় উন্নয়নের স্বার্থে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে মত-বিনিময় করবেন;

৪. একাডেমিক তত্ত্বাবধান সমাপান্তে নির্ধারিত ছকে একটি সার-সংক্ষেপ তৈরি করে তা পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার নিকট অবশ্যই প্রেরণ করবেন;

৫. প্রতি বিদ্যালয়ে একাডেমিক তত্ত্বাবধান শেষে প্রধান শিক্ষককে সংক্ষিপ্ত ফলাবর্তন (ফিডব্যাক) প্রদান করবেন;

৬. সাবক্লাস্টার প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি দু'মাস অন্তর সাবক্লাস্টার প্রশিক্ষণ পরিচালনায় নেতৃত্ব প্রদান করবেন;

৭. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ চাহিদা উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে (ইউআরসি) প্রদান করবেন;

৮. সুষ্ঠু কার্যব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও পেশাগত আলোচনার অগ্রগতিসাধনে সহায়তা করার জন্যে ক্লাস্টারের প্রধান শিক্ষকদের জন্যে মাসে একটি সভার আয়োজন করবেন;

৯. বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষক অভিভাবক সমিতি গঠন ও তাদের সাথে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করবেন;

১০. বিদ্যালয় একাডেমিক তত্ত্বাবধানের সময় এসএমসির সদস্যদের সাথে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোচনা করবেন;

১১. বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মাসিক 'হোম ভিজিট' নিশ্চিত করবেন। তিনি নিজেও মাসে মোট তিনজন শিশুর বাড়ি ভিজিট করবেন। ভিজিটের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ছক পূরণ করে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট তা দাখিল করবেন;

১২. প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিচালনা করবেন;

১৩. ক্লাস্টারের প্রধান শিক্ষকদের নৈমিত্তিক ছুটি অনুমোদন করবেন এবং শিক্ষকদের অন্যান্য ছুটির বিস্তারিত বিবরণ মতামতসহ উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন;

১৪. বিদ্যালয় এলাকার বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুর জরিপ যাতে নিয়মিতভাবে সম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করবেন;

১৫. উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করবেন।

জ. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব-কর্তব্য

১৯৮৬ সালের সরকারি সার্কুলার অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

১. স্কুলের যাবতীয় রেকর্ড, রেজিস্টার ও ফাইল সংরক্ষণ করবেন।

২. স্কুল এলাকায় স্কুল গমনোপযোগী শিশুদের বাৎসরিক জরিপের কাজ শিক্ষকমন্ডলী ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের সহযোগিতায় সম্পন্ন করিবেন এবং শিশু জরিপের স্থায়ী রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন।

৩. শিক্ষকমন্ডলী, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং অভিভাবকদের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ে শিশুদের দৈনিক ও নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন।

৪. বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবেন এবং এর আলোকে সাপ্তাহিক রুটিন প্রণয়ন করবেন।

৫. প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীকে স্কুলে যতজন শিক্ষক ততভাগে ভাগ করে বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষককে এক একটি শাখার বাৎসরিক পূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত করে শাখা শিক্ষককে তার শাখার শিশুদের পাঠোন্নতির দায়িত্ব দেয়ার জন্য দায়বদ্ধ করবেন।

৬. সহকারি শিক্ষকগণ যাতে শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট পাঠটিকা ও প্রয়োজনীয় উপকরণসহ পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করেন তা নিশ্চিত করবেন।

৭. প্রয়োজনীয় রিপোর্ট ও রিটার্ন নিয়মিত প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট যথানিয়মে প্রেরণ করবেন।

৮. পাঠোন্নতির লক্ষ্যমাত্রা পর্যালোচনার নিমিত্তে সহকারি শিক্ষকদের সঙ্গে প্রতিমাসে অন্ততঃপক্ষে ২টি অধিবেশনের ব্যবস্থা করবেন এবং সিদ্ধান্তসমূহ খাতায় লিপিবদ্ধ করবেন।

৯. মাসে অন্ততঃপক্ষে একবার ম্যানেজিং কমিটির অধিবেশনের ব্যবস্থা করিবেন এবং অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তবলী বাস্তবায়ন করবেন।

১০. সহকারি শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের নিয়মিত স্কুলে উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন।

১১. শ্রেণী পাঠদানে শিক্ষকদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণপূর্বক সফলতা অর্জনে সাহায্য করবেন।

১২. সরকার ও স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অর্থ, আসবাবপত্র, শিক্ষাপোকরণ ও অন্যান্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য ক্যাশবুক ও স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন।

১৩. ক্লাস্টার ট্রেনিং-এর দিন তারিখ ও বিষয় শিক্ষকদেরকে যথাসময়ে জানিয়ে দিবেন। ক্লাস্টার ট্রেনিং অনুষ্ঠানের জন্য সবরকম আয়োজন সম্পন্ন করবেন। যেমন: বসার জায়গা, শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি।

ঝ. প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই)– পৃথিবীর সকল দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় 'শিক্ষক প্রশিক্ষণ'কে একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশেরও শিক্ষকদের পেশাগত প্রস্তুতি, দক্ষতা, শ্রেণীকক্ষের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার উৎকর্ষ সাধন এবং শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার লক্ষ্যে দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশে বর্তমানে ৫৪টি সরকারি (বাকীগুলো নির্মাণাধীন) এবং ১টি বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই) রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের মূল দায়িত্ব দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মানসম্পন্ন শিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়া। বর্তমানে এক বছর মেয়াদী সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) ও সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ ও কর্মশিবিরের ব্যবস্থা করা এ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব।

প্রতিটি পিটিআই-এ সুপার ও সহকারি সুপারসহ ১৪ জন প্রশিক্ষক এবং ৬ জন কর্মচারী আছে। উল্লিখিত ১৪ জনের মধ্যে ১২টি ইন্সট্রাক্টর পদ। এই ১২ টির মধ্যে ৪টি বিষয়সংশ্লিষ্ট (subject attached)। এই ৪টির ১টি বিজ্ঞান, ১টি কৃষি, ১টি শরীরচর্চা ও ১টি চারু ও কারুকলার। অবশিষ্ট ৮টি বিষয়সংশ্লিষ্ট নয়। বিএডসহ স্নাতকোত্তর পাশ যেকোনো লোকই এই ৮টি পদে ইন্সট্রাক্টর হিসেবে নিয়োগ পেতে পারে। বাংলা, ইংরেজি ও গণিত প্রাথমিক পর্যায়ে তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য বিষয়। অথচ এই তিনটি বিষয়ে সি-ইন-এড প্রশিক্ষণদানের জন্য বিষয় সংশ্লিষ্ট ইন্সট্রাক্টর নেই।

পিটিআইগুলোতে এক বছর মেয়াদী সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সি-ইন-এড প্রশিক্ষণের জন্য একটি জাতীয় শিক্ষাক্রমও আছে। শিক্ষাক্রম অনুসারে প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে একটি সনদপত্র প্রদান করা হয়। দর্শন ও তত্ত্বগত দিক থেকে সি-ইন-এড একটি চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ। বিরাজমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে এই প্রশিক্ষণ বর্তমানে চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণে রূপান্তরিত হয়েছে।

প্রশিক্ষণার্থীদের ক্যাম্পাসের মধ্যেই থাকার জন্য পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল আছে। সুপারিনটেনডেন্ট ও সহকারি সুপারিনটেনডেন্টের জন্য আবাসিক ভবন রয়েছে। প্রতিটি পিটিআই-এ একজন সুপারিনটেনডেন্ট প্রধান নির্বাহির দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সাধারণত একজন সুপার, একজন অ্যাসিস্টেন্ট সুপার ও ১২ জন ইন্সট্রাক্টর নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কাউন্সিল গঠিত হয়। একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ শ্রেণী পাঠদান করা ছাড়াও কিছু কিছু বিদ্যালয়ে শিক্ষা তত্ত্বাবধান করে থাকেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অতীতে এই একটি সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ নিয়েই সারাজীবন শিক্ষকতা জীবন সমাপ্ত করতে হতো। সমকালীন জ্ঞান এবং প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সৃষ্ট নবতর ভাবধারার সঙ্গে শিক্ষকগণকে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিচিত হবার কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা বাংলাদেশে ছিল না। বিভিন্ন সময়ে প্রাথমিক শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কতিপয় উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকল্প শেষে এই প্রশিক্ষণগুলোকে অনেক ক্ষেত্রেই কোনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের স্বল্পমেয়াদি চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের জন্য দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি) প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। তা ছাড়া সাব-ক্লাস্টার পর্যায়েও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রকল্পনির্ভর ও স্থানীয়ভাবে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ গত দুই দশক ধরে চালু আছে।

পিটিআই প্রশিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ– পিটিআই-এ প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মরত ইন্সট্রাক্টরগণের নূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ বিএড প্রশিক্ষণ। কিন্তু এই বিএড প্রশিক্ষণ ‘মাধ্যমিক শিক্ষাভিত্তিক’। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাভিত্তিক বিএড প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই। বর্তমানের ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ১৯৪৮ সালে প্রাথমিক শিক্ষাভিত্তিক বিএড প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অধ্যাপক শামসুল হক সাহেবের প্রচেষ্টায় ‘প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ’ হিসেবে স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৮০ সালের পর বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপুল সম্প্রসারণ ঘটেছে। পিটিআইসমূহের ইন্সট্রাক্টর ছাড়াও, বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বিভাগীয় উপ-পরিচালক, জেলা, উপজেলা ও ক্লাস্টারপর্যায়ে অগণিত কর্মকর্তা রয়েছে। যাদের অনেকেরই মৌলিক প্রশিক্ষণ নেই এবং থাকলেও তা মাধ্যমিক শিক্ষাভিত্তিক। প্রশিক্ষণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাভিত্তিক বিএড প্রশিক্ষণ চালু করা একান্ত প্রয়োজন। ইতোমধ্যে প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে বা হচ্ছে। ইউআরসি'র কর্মকর্তার জন্য প্রাথমিক শিক্ষাভিত্তিক বিএড কোর্স চালুর কথা বলা হচ্ছে। ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আহছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন ইন্সস্টিটিউট অব প্রাইমারি এন্ড ননফরমাল এডুকেশন ১৯৯৭ সাল থেকে বিএড কার্যক্রম শুরু করেছে।

সি-ইন-এড শিক্ষাক্রম– প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের একবছর মেয়াদি সি ইন-এড প্রশিক্ষণের জন্য সুনির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম রয়েছে। সি-ইন-এড শিক্ষাক্রমের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, শ্রেণীকক্ষের জন্য দক্ষ শিক্ষক তৈরি করা। সি-ইন-এড শিক্ষাক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি অংশ হচ্ছে– পাঠদান-অনুশীলনী (Practice-Teaching) প্রতিটি পাঠের জন্য পাঠ-পরিকল্পনা তৈরি এবং শ্রেণীকক্ষে পরিকল্পনা মোতাবেক পাঠদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে দক্ষ শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য। প্রতিটি অনুশীলনী পাঠ পিটিআই-এর প্রশিক্ষক কর্তৃক পর্যবেক্ষণ করার কথা, যাতে তিনি প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়ে প্রশিক্ষণার্থীর শ্রেণীপাঠদানে উৎকর্ষ সাধন করতে পারেন।

ঞ. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) বা ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্রাইমারি এডুকেশন (NAPE)–দ্বিবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার (১৯৭৮-৮০) আওতায় ময়মনসিংহে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী স্থাপন করা হয়। এটি ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরুতে এর নাম ছিল একাডেমি ফর ফান্ডামেন্টাল এডুকেশন বা AFEI ১৯৮২ সালে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় নেপ (NAPE)। ২০০৪ সালে এটিকে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা হয়। এর প্রধান

হলেন মহাপরিচালক। একাডেমী জাতীয় শিক্ষা উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। এটির ওপর অর্পিত দায়িত্বের মধ্যে সি-ইন-এড-এর শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, প্রাথমিক শিক্ষা ইন্সট্রাকটরদের প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত গবেষণা, কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন করা ইত্যাদি প্রধান।

নেপ'র লক্ষ্য: বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত সংখ্যাগত উন্নতি সাধন করা এবং একে সর্বজনীন রূপ দান করা।

কার্যক্রম:

১. প্রাথমিক শিক্ষা পরিদর্শক, প্রশাসক ও শিক্ষক/প্রশিক্ষকবৃন্দের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ইনসার্ভিস প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

২. গবেষণালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন করা।

৩. শিক্ষণ-উপকরণ তৈরি, মডিউল তৈরি ও উন্নয়ন এবং শিক্ষণপদ্ধতির মান উন্নয়ন করা।

৪. পিটিআই– এর প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৫. প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগকে প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেয়া।

৬. সি-ইন-এড পরীক্ষার আয়োজন করা এবং প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের অন্যান্য পরীক্ষাসমূহ তদারকি করা।

৭. প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটসমূহের মাঝে সমন্বয় সাধন করা।

৮. মাঠপর্যায়ের শিক্ষা কার্যালয় ও প্রাথমিক স্কুলসমূহ মনিটরিং ও ফলোআপ করা।

ট. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড–১৯৮৪ সালে সরকারি অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র ও বাংলাদেশ স্কুল টেকস্টবুক বোর্ড একীভুত হয়ে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB) গঠিত হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে থাকে। নিচে এনসিটিবি'র সাম্প্রতিক কিছু কার্যক্রম তুলে ধরা হলো:

১. ২০০০ সাল নাগাদ সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও নবায়ন করেছে।

২. প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের আলোকে নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে আসছে।

৩. এ সকল পাঠ্যপুস্তকের উপর ভিত্তি করে সকল ক্লাসের সব বিষয়ের জন্যে শিক্ষক সংস্করণ প্রণয়ন করে আসছে। এই শিক্ষক সংস্করণ শ্রেণীকক্ষে শিখনের মান উন্নয়নে শিক্ষকগণকে সাহায্য করে থাকে।

৪. এছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যে সকল বিষয়ের জন্যে পাঠ্যপুস্তক নেই, সে সকল বিষয়ের জন্যে সংস্করণ প্রণয়ন করেছে।

৫. শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে মানসম্মত শিক্ষা কতটুকু নিশ্চিত হচ্ছে, তা দেখার জন্যে এনসিটিবি একটি একাডেমিক পর্যালোচনা প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে: যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের আলোকে রচিত পাঠ্যপুস্তকের শ্রেণীকক্ষে পাঠদান পর্যবেক্ষণ।

ঠ. উপজেলা রিসোর্স সেন্টার– প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি) স্থাপনের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণও দেয়া হচ্ছে। উপজেলা রিসোর্স সেন্টার প্রাথমিক শিক্ষার অবকাঠামোতে একটি নবতর সংযোজন। এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রস্তাবিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যা শিক্ষকসহ প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সকলের সেবা প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে বিবেচিত হবে। উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষক ও প্রাথমিক শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, বিভিন্ন কমিটির কর্মকর্তাদের পেশাগত ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সরাসরি প্রশিক্ষণ, ওরিয়েন্টেশন প্রদান, সেমিনার আয়োজন, কারিগরি সমর্থন প্রদান, তথ্য সরবরাহ, গ্রন্থাগার/ইকুইপমেন্ট সংক্রান্ত সুবিধা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্যই এই রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। (পড়ুন সংযোজনী ১১ঃ উপজেলা রিসোর্স সেন্টার)

ড. স্থানীয় পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা– প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা বাস্তবায়নে (operation) সর্বশেষ

ইউনিট হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার প্রধান হলেন প্রধান শিক্ষক। তিনি অন্যান্য শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটি এবং শিক্ষক অভিভাবক সমিতির পরামর্শ ও সহায়তায় বিদ্যালয় পরিচালনা করে থাকেন। জেলা শিক্ষা অফিস, উপজেলা ও সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসারের দায়িত্ব ও কার্যাবলী পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। নিচে স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন কাঠামো দেখানো হলো।

ঢ. স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনের কাঠামো

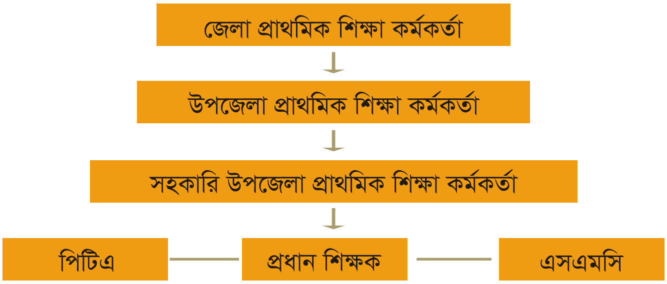

(সূত্র: ২০১১ এর ৮ সেপ্টেম্বর বিএনএফই প্রকাশিত অঙ্গীকার, ২০১১ থেকে সংকলিত)

সংযোজনী–৭: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো (BNFE)

২০০৫ সালে সরকারের রাজস্ব খাতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতির উদ্দেশ্য ও কৌশলগত লক্ষ্যসমূহের বাস্তবায়ন করার জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কাজ করছে। এ ছাড়াও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়নকারী বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয় সাধন এর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ তৈরিতে উপনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব প্রদানকারী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় বর্তমানে ২টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। নির্বাচিত বেসরকারি সংস্থাসমূহের (এনজিও) মাধ্যমে এ প্রকল্প দু'টি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্প দুটির ওপর নিম্নে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো:

১. মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২ঃ (ক) প্রকল্প বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০০২ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত; (খ) কর্ম-এলাকা : ২৯টি জেলার ২১০টি উপজেলা, (গ) লক্ষ্য-দল : ১১-৪৫ বছর বয়সী মোট ১৬.০০ লক্ষ নব্যস্বাক্ষর, (ঘ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য : (১) সাক্ষরতা-উত্তর শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে ১৬.০০ লক্ষ নব্যস্বাক্ষরের দক্ষতা সুসংহত, শাণিত ও বর্ধন করা, (২) অব্যাহত শিক্ষার আওতায় আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাঁদেরকে কর্মক্ষম ও আত্মনির্ভরশীল নাগরিকে পরিণত করা এবং তাদের আর্থ–সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো এবং (৩) সমাজে জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রচলন ঘটানো।

২. শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প-(২য় পর্যায়): (ক) প্রকল্প বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০০৪-এপ্রিল ২০১২ পর্যন্ত, (খ) কর্মএলাকা: ৬টি বিভাগীয় শহর, (গ) প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য : (১) শহরে ১০-১৪ বছর বয়সী ১,৬৬,১৫০ কর্মজীবী শিশুকে (৬০% মেয়ে শিশু) মানসম্মত ও জীবন দক্ষতাভিত্তিক মৌলিক শিক্ষা প্রদান করা, (২) এদের মধ্য থেকে ১৩+বয়সী ১০,০০০ কিশোর-কিশোরীকে জীবিকায়ন দক্ষতার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা ও আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা। (পড়ুন সংযোজনী–৮: শহরের কর্মজীবী শিশুদর জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প-(২য় পর্যায়)

৩. তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি: বিদ্যালয় গমনোপযোগী শতভাগ শিশুকে শ্রেণী কক্ষে মানসম্মত শিক্ষা দান, অনগ্রসর ও সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষার সুযোগ প্রদানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ, বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত কমানোর জন্য বিদ্যালয়সমূহের ক্লাসরুম বৃদ্ধিকরণ, শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ প্রদান ইত্যাদি বহুমুখী উদ্দেশ্য সরকার ইতোমধ্যে 'তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মচসূচি' নামক একটি বৃহৎ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে (পড়ুন পরিচ্ছেদ–৪.৮ : তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন

কর্মসূচি)। এ ছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় ঝরে পড়া ও বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প (রস্ক) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। (পড়ুন–সংযোজনী–৯: অভিজ্ঞতার আলোকে সাজানো–রস্ক)

সংযোজনী–৮: শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)

প্রকল্পের সাধারণ উদ্দেশ্য

শহরের কম সুবিধাভোগী কর্মজীবী দরিদ্র শিশু-কিশোরদের শিক্ষার অধিকার বাস্তবায়ন, সুরক্ষা এবং উন্নততর জীবনের জন্য প্রস্তুত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষা, নিরাপত্তা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- শহরের ১০-১৪ বছর বয়সী ১,৬৬,১৫০ জন কর্মজীবী শিশু ও কিশোর-কিশোরীকে (যাদের মধ্যে কমপক্ষে ৬০% মেয়ে শিশু) জীবন দক্ষতাভিত্তিক মানসম্মত উপানুষ্ঠানিক মৌলিক শিক্ষা প্রদান।
- এদরে মধ্যে ১৩+ বয়সী ১০,০০০ (৫০০০ সরাসরি এবং ৫০০০ লিংকেজের মাধ্যমে) কিশোর-কিশোরীদের জীবিকায়ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা।
- কর্মজীবী কিশোর-কিশোরী এবং তাদের পরিবারের অনুকূলে শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন এবং ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপরিবেশ থেকে শিশুদের রক্ষা করার লক্ষ্যে শহর ও জাতীয় পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি।
- পর্যায়ক্রমে সকল ধরনের শিশুশ্রম দূরীকরণে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পের মেয়াদ

মূল প্রকল্প: জুলাই ২০০৪ থেকে জুন ২০০৯, সংশোধিত প্রকল্পঃ জুলাই ২০০৪ থেকে এপ্রিল ২০১২।

কর্ম এলাকা: ৬টি বিভাগীয় শহর

উন্নয়ন সহযোগী: সুইডিস-সিডা, কানাডিয়ান সিডা এবং ইউনিসেফ।

বাস্তবায়ন কৌশল: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো (বিএনএফই) ২০টি জাতীয়পর্যায়ের বেসরকারি সংস্থার সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ৬টি বিভাগীয় শহরে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বিএনএফই–র অধীনে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) ৯টি মাঠ পর্যায়ের অফিসসহ সার্বিকভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সমন্বয় করেছে।

প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য

১. জীবন দক্ষতাভিত্তিক মৌলিক শিক্ষা:

- ১ম সাইকেল থেকে ৫ম সাইকেল পর্যন্ত কারিকুলাম তৈরি করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী শিক্ষা উপকরণ সব কেন্দ্রে বিতরণ করা হয়েছে।
- ৬,৫৬৩ জন শিক্ষক এবং ৬৫৭ জন সুপারভাইজারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং তারা তাদের দক্ষতা শিখন কেন্দ্রে ব্যবহার করছে।
- সমাপ্ত স্টেজ-১ এবং স্টেজ-২ এর মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা গ্রহণকারী ৭৬,৫২১ জন শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে ১১,৯৭১ জন শিক্ষার্থী আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছে।
- ৬টি বিভাগীয় শহরের ৪টি স্টেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১,৪৬,৫২৭টি স্কুলব্যাগ (মগ, রং, পেন্সিল, সার্পনারসহ) বিতরণ করা হয়েছে।
- কো-কারিকুলার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কমিউনিটি পর্যায়ে স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে।
- ৯৯% শিক্ষার্থী জন্মনিবন্ধন সনদ গ্রহণ করেছে।

- জানুয়ারী ২০১১ থেকে ৩য় ও ৪র্থ স্টেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে টিফিন বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং বর্তমানে ৪র্থ স্টেজের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।
- প্রকল্পের ১ম ও ২য় স্টেজের ১,৭৭৭ জন শিক্ষক ও সুপারভাইজারকে ইনসেনটিভ প্রদান করা হয়েছে।

২. জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ:

১. অনুমোদিত আরডিপিপিতে ৫,০০০ জন প্রশিক্ষাণার্থীকে সরাসরি জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের বিধান রয়েছে।

২. জানুয়ারী ২০১১ থেকে ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে ১ম স্টেজের ১০০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান ২০১১ এর জুলাই মাসে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে দুই মাসের ফলো আপ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

৩. নির্বাচিত ৫টি সংস্থার আরও সংস্থা নির্বাচনের মাধ্যমে বাকী ৪,০০০ শিক্ষার্থীকে জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান আছে।

৩. অ্যাডভোকেসি, সোস্যাল মবিলাইজেশন ও প্রোগ্রাম কম্যুনিকেশন:

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সাথে ২০০৯ এর মার্চ এবং মে মাসে প্রকল্পের ৪জন কর্মজীবী শিশু জাতীয় টেলিভিশন আয়োজিত উচ্চ পর্যায়ের একটি সভায় অংশগ্রহণ করেছে। সেখানে তারা শহরের কর্মজীবী শিশুদের সমস্যাসমূহ নিয়ে আলোচনা করেছে।

২. ২০১০ ও ২০১১ সালে প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জাতীয় শিশু দিবস ও বঙ্গবন্ধুর জন্ম দিবস কেন্দ্রীয়ভাবে উদ্‌যাপন করা হয়েছে। বিভিন্নপর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, অভিভাবক, পিতা-মাতা, নিয়োগকর্তা ও সিএমসি সদস্যগণ এতে অংশগ্রহণ করেছেন।

৩. পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস, সবার জন্য শিক্ষা সপ্তাহ, সিআরসি সপ্তাহ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ও মীনা দিবস জাতীয় এবং কমিউনিটি পর্যায়ে উদ্‌যাপিত হয়েছে। সকল স্টেজের শিক্ষার্থীগণ, শিক্ষক, সুপারভাইজার, স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক, নিয়োগকর্তা, সিএমসি সদস্যবৃন্দ, পিআইইউ, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এবং মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও দাতা সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিগণ এতে যথারীতি অংশগ্রহণ করেছেন।

৪. ৬,৭৯,২০০ জন দর্শক ১,১৩২টি পথ নাটক প্রত্যক্ষ করেছেন। পথনাটকগুলোতে মেয়েশিশু, মৌলিক শিক্ষা ও শিশুশ্রম- সংক্রান্ত বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

৫. প্রকল্পের তথ্য সংবলিত ২২৮টি বিলবোর্ড, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল বিভাগীয় শহরে বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা হয়েছে।

৬. ৬৬৪৬টি কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি সক্রিয়ভাবে কেন্দ্রে পরিচালনার সাথে জড়িত। বর্তমানে স্টেজ-৪ এর ১২৬৫ টি কেন্দ্রে ব্যবস্থাপনা কমিটি কাজ করছে।

৭. ৬টি বিভাগীয় শহরে চাইল্ড রাইটস অ্যাডভোকেটরদের নিয়ে ১৬ টি জোনাল কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংযোজনী–৯: অভিজ্ঞতার আলোকে সাজানো– রস্ক

প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করার আগেই ঝরে পড়া এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাবঞ্চিত শিশুদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ সৃষ্টি, সর্বোপরি ২০১৪ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে নিরক্ষর মুক্ত করার অঙ্গিকার বাস্তবায়নে ‘রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন’ সংক্ষেপে ‘রস্ক’ প্রকল্প কাজ করে যাচ্ছে। রস্ক-এর আওতায় পরিচালিত এসব কেন্দ্রগুলোকে আনন্দ স্কুল বলা হয়ে থাকে। সরকারি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের মধ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ২০০৫ সাল থেকে এ পকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় জনসমাজের উদ্যোগে ২৫-৩৫ জন শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়। বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য স্থানীয় উদ্যোগে অবকাঠামোর ব্যবস্থা করা হয়। উপজেলা শিক্ষা কমিটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষকের তালিকা প্রস্তুত করে। আনন্দ স্কুলসমূহের সিএমসি প্রয়োজন অনুযায়ী উক্ত শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। আনন্দ স্কুল

প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটিকে একটি নির্দিষ্ট ফি এর বিনিময়ে স্থানীয় এনজিওসমূহ সহায়তা প্রদান করে থাকে। উপজেলা শিক্ষা কমিটি উক্ত সেবা প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন স্থানীয় এনজিওসমূহের তালিকা প্রস্তুত করে। উক্ত তালিকা থেকে নির্বাচিত এনজিওসমূহ আনন্দ স্কুলসমূহকে মূলত প্রশিক্ষণ এবং মনিটরিং-এ সহায়তা প্রদান করে থাকে।

সাফল্য:

২০০৯ সালে দেশে যুগান্তরসৃষ্টিকারী সমাপনী পরীক্ষা প্রবর্তন করা হয়। আনন্দ স্কুলের শিক্ষার্থীরা এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এ পরীক্ষায় আনন্দ স্কুলের শিক্ষার্থীদের পাসের হার ছিল ৪৩.৬৫%। এর মধ্যে ২৩ জন শিক্ষার্থী বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে প্রাথমিক বৃত্তি লাভ করে।

এ সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালের সমাপনী পরীক্ষায় আনন্দ স্কুল থেকে ৩৭,৩০৮ শিক্ষার্থী সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এদের মধ্যে ০৭ জন ট্যালেন্টপুলে ও ১১২ জন সাধারণ গ্রেডে বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। কৃতকার্যের হার অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর প্রায় ৪৯%। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ২য় সুযোগ হিসেবে আনন্দ স্কুল থেকে কৃতকার্য ৩৭ হাজার ৩ শত ৮ জন শিক্ষার্থী মূলধারায় পরবর্তী শিক্ষাস্তরে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। উল্লেখ্য, রস্ক প্রকল্পের জন্য সমাপনী পরীক্ষায় কৃতকার্যের টার্গেট ৫০% পাশ নির্ধারণ করা হয়। উক্ত টার্গেটের বিপরীতে প্রকল্প প্রায় ৯৮ ভাগ সাফল্য অর্জনে সমর্থ হয়েছে।

অভিজ্ঞতা থেকে সংযোজন

বর্তমানে উপজেলা শিক্ষা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আনন্দ স্কুল পরিচালিত হচ্ছে। এ কাজে উপজেলা শিক্ষা অফিসকে ইআরপি মাস্টার ট্রেনারগণ সার্বিক সহায়তা প্রদান করছেন। উপজেলা পর্যায়ে আনন্দ স্কুলসমূহের শিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ প্রদান এবং স্কুল কার্যক্রম মনিটরিং– এর জন্য মাস্টার ট্রেনারগণের দায়িত্ব পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। পুনর্বিন্যাসকৃত দায়িত্বের আওতায় প্রতি মাস্টার ট্রেনার ৮০টি আনন্দ স্কুল পরিবীক্ষণ করে মাসিকভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রদান করেছেন। পাশাপাশি বছরের শুরুতে শিক্ষার্থী validation সহ প্রতিস্থাপনের দায়িত্বও পালন করছেন। এ লক্ষ্যে মাস্টার ট্রেনারগণের উপজেলায় সার্বক্ষণিক অবস্থান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শিক্ষার্থীগণের দ্বৈতভর্তি রোধকল্পে শিক্ষার্থীর ছবি ও তথ্যযুক্ত উপজেলাভিত্তিক আইডি প্রোফাইল প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে এ প্রকল্প ৯০টি উপজেলায় বিস্তৃত। মনিটরিং-এর সুবিধার্থে সমগ্র কর্মএলাকা প্রকল্পের সহকারী পরিচালক ও পরামর্শকগণের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। তাঁরা সাপ্তাহিক ও পাক্ষিকভিত্তিতে মাঠপর্যায়ের সমস্যাসমূহ অবহিত হচ্ছেন এবং সমাধানকল্পে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন। মন্ত্রণালয়ের সচিব, অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় মনিটরিং-এর অংশ হিসেবে সরেজমিনে আনন্দস্কুল পরিদর্শনসহ উপজেলাপর্যায়ে শিক্ষক সমাবেশে যোগদান করছেন। মনিটরিং নিবিড় করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়েও রস্কের জন্য কর্মকর্তা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়মিত প্রকল্প মনিটরিং করছেন।

আনন্দ স্কুলের শিক্ষকগণকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা বিশেষ করে ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জনে সহায়তার লক্ষ্যে চালু করা হয়েছে, 'নিবিড় শিক্ষক প্রশিক্ষণ' কার্যক্রম। উপজেলাপর্যায়ে অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণ পরিচালনায় তত্ত্বাবধান করছেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ শিক্ষক, ইউআরসিসমূহের প্রশিক্ষকগণ এ প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন। প্রকল্প থেকে প্রস্তুতকৃত 'ইংরেজি' ও 'গণিত' বিষয়ে দুটি সহায়িকা প্রশিক্ষণ উপকরণ হিসেবে সরবরাহ করা হয়েছে। প্রকল্পের সহকারী পরিচালক ও পরামর্শকগণ নিয়মিত সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রশিক্ষণ সুপারভিশন করছেন। আনন্দ স্কুলের শিখন-শিখানোর গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত মৌলিক প্রশিক্ষণ ও সঞ্জীবন কোর্স চালু রয়েছে।

রস্ক Performance-based প্রকল্প। শিক্ষার্থীর সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও অর্জিত সাফল্য Performance হিসেবে গণ্য। দেশের প্রচলিত অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে রস্ক এ্যাপ্রোচের এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য। এ এপ্রোচের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, যে কারণে হত-দরিদ্র শিক্ষার্থীগণ সাধারণ বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পড়াশুনা চালাতে পারে না, রস্ক এ্যাপ্রোচে সে সমস্যা সমাধান করে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ২য় সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, শিক্ষার্থীর পড়াশুনা থেকে ছিটকে পড়ার ঝুঁকি কমেছে।

পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তাবলয় হিসেবে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিয়মিত আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পটি শিক্ষার্থীদের Opportunity cost minimize করছে। নারীর ক্ষমতায়ন হিসেবে প্রকল্পটি প্রায় ২২,০০০ নারীর চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ফলে পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হচ্ছে।

জাতীয়পর্যায়ে কর্মরত এনজিওদের শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জিত অভিজ্ঞতা রস্ক এ্যাপ্রোচের মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের নজির সৃষ্টি করা হয়েছে।

গুণগত সাফল্য

রস্ক অ্যাপ্রোচে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত পাঠ্যপুস্তক পড়ানো হয়। পাঠ পরিচালনার সময়টি Flexible বা নমনীয়। এ কারণে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীগণ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সুবিধা অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করতে পারে। কাজেই রস্ক হচ্ছে Fomal education in the non-formal fashion। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীর মূলধারায় প্রবেশ এবং Equivalency-বা সমতাবিধান-সংক্রান্ত কোনো সমস্যা নেই।

প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্জিত বহুমুখী অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় যে, পিছিয়ে পড়া, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ২য় সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার মূলধারায় আনতে এবং সফলতার সাথে প্রাথমিক শিক্ষা চক্র শেষ করতে রস্ক অ্যাপ্রোচ প্রয়োগে এগিয়ে যেতে পারলে, আগামী দিনগুলোতে রস্ক প্রাথমিক শিক্ষায় টেকসই Intervention হিসেবে পরিগণিত হবে।

সংযোজনী–১০: প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প

৫ই জুন ২০০৪-এ জারিকৃত পরিপত্রে, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচিকে একীভূত করে দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচির আওতায় দেশের সকল ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীর এলাকাভেদে ৫০%–১০০% দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উপবৃত্তি প্রদান করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী দরিদ্র পরিবারের শিশুদের ভর্তিহার বৃদ্ধিকরণ;

২. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধিকরণ;

৩. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধকরণ;

৪. প্রাথমিক শিক্ষাচক্রের সমাপ্তি হার বৃদ্ধিকরণ;

৫. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের শিশুশ্রম রোধ ও দারিদ্র্য বিমোচন;

৬. প্রাথমিক শিক্ষার গুনগতমান উন্নয়ন।

প্রকল্পভুক্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ

১. প্রকল্পভুক্ত এলাকা বলতে দেশের সমগ্র এলাকা বুঝাবে।

২. প্রকল্পভুক্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে নিচের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বুঝাবে:

   ক. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

   খ. রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

   গ. কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়

   ঘ. অস্থায়ী রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

   ঙ. সরকারি অনুদানে এনজিও কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়

   চ. সরকার কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসা

দরিদ্র পরিবার বলতে নিম্নোক্ত শ্রেণীভুক্ত পরিবারকে বুঝাবে (১১.৮.২০১০-তে সংশোধিত নীতিমালা অনুযায়ী):

ক. দুস্থ ও বিধবা মহিলার পরিবার:

খ. দিনমজুর

গ. চাকুরিজীবী অস্বচ্ছল পেশাজীবী যেমন- জেলে, কুমার, কামার, তাঁতী, মুচি ইত্যাদি

ঘ. অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীর পরিবার

ঙ. অস্বচ্ছল উপজাতী ছাত্র-ছাত্রীর পরিবার।

দরিদ্র ছাত্র/ছাত্রী বাছাই

- প্রধান শিক্ষক স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সহয়তায় সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসায় ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য হতে সর্বোচ্চ ৪০% দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীকে নির্বাচন করে একটি তালিকা প্রণয়ন করবেন (এলাকাভেদে ৫০%-১০০%)।
- প্রস্তুতকৃত তালিকা সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার বাছাই করবেন এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসার তা অনুমোদন করবেন।

উপবৃত্তির শর্তাবলী

- উপবৃত্তির জন্য নির্বাচিত ছাত্র/ছাত্রীকে অবশ্যই উপরে বর্ণিত দরিদ্র পরিবারের সন্তান হতে হবে।
- তালিকাভুক্ত দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীকে মাসে কমপক্ষে ৮৫% পাঠ্যদিবসে বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে হবে; অন্যথায় ওই মাসে ওই সব ছাত্র-ছাত্রী উপবৃত্তি পাবে না।
- তালিকাভুক্ত কোনো বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত কমপক্ষে ১০% ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে উপবৃত্তি প্রদান বন্ধ রাখা হবে।
- কোনো অনুকূল আবহাওয়ার দিনে পরিদর্শনকালে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার তুলনায় ৬০% অথবা তার কম উপস্থিতি দেখা গেলে উক্ত বিদ্যালয়ে উপবৃত্তি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হবে।
- সরকার কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসাসমূহে কমপক্ষে ১০০ (একশত)জন ছাত্র-ছাত্রী থাকতে হবে এবং উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য সকল শর্তাবলী পূরণ করতে হবে।
- এই কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র পরিবারের এক সন্তান প্রাথমিক বিদ্যালয় অধ্যয়ন করলে মাসিক ১০০ (একশত) টাকা এবং একাধিক সন্তান লেখাপড়া করলে মাসিক ১২৫ (একশত পঁচিশ) টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হবে।

১১/০৮/২০১০ তারিখের স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সকল শ্রেণীর (১ম শ্রেণী ব্যতিত) ছাত্র-ছাত্রীকে বার্ষিক পরীক্ষায় ৩৩% নম্বর পেতে হবে। বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে, কোনো ছাত্র-ছাত্রী উপবৃত্তি পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবে না। স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি বার্ষিক পরীক্ষায় যাতে ছাত্র-ছাত্রীগণ ৩৩% নম্বর অর্জন করে, সে জন্য ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের উৎসাহিত ও সতর্ক করবে।

উপবৃত্তি বিতরণ পদ্ধতি

- ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সুবিধাভোগী দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মাতা/পিতা/বৈধ অভিভাবকদের ব্যাংক হিসাবে অর্থ স্থানান্তর করা হবে।
- উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা হতে বিদ্যালয়ের জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক একটি ক্যাম্প স্থাপন করে উপবৃত্তি বিতরণ করতে হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান শিক্ষক, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি এবং ক্ষেত্র পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

- প্রধান শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষকদের সহযোগিতায় ছাত্র/ছাত্রীদের ভর্তি রেজিস্টার, হাজিরা রেজিস্টার, পরীক্ষার ফলাফল রেজিস্টার ও অন্যান্য রেজিস্টার সবসময় হালনাগাদ করে রাখবেন এবং পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরসহ উত্তরপত্র নূন্যতম ০১ (এক) বৎসর বিদ্যালয়ে সংরক্ষণ করবেন।
- উপবৃত্তি প্রাপ্তিযোগ্য ছাত্র/ছাত্রীদের তালিকা নির্ধারিত ছক পূরণপূর্বক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন।
- উপবৃত্তি প্রাপ্তিযোগ্য ছাত্র/ছাত্রীদের তালিকা চূড়ান্তকরণে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে সাহায্য করবেন এবং চূড়ান্ত তালিকার ১ (এক) কপি উপজেলা শিক্ষা অফিসে প্রেরণ করবেন।
- উপজেলা শিক্ষা অফিসার উপজেলা শিক্ষা কমিটিতে উপবৃত্তি বিতরণের বিষয়টি নিয়মিত আলোচনা-পর্যালোচনা করবেন এবং এ-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।
- উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা উপবৃত্তির বিল ফরমের নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষরপূর্বক উপজেলা নির্বাহী অফিসারের স্বাক্ষর নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটে প্রেরণ করবেন। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা অনুমোদিত বিলের কপি তালিকাসহ ব্যাংকে জমা দিবেন।

উপবৃত্তি মনিটরিং অফিসার

- উপবৃত্তি মনিটরিং অফিসার সংশ্লিষ্ট উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণের সঙ্গে যোগাযোগ করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ব্যবস্থাপকের সাথে আলোচনাপূর্বক উপবৃত্তি বিতরণের দিন তারিখ ইত্যাদি ধার্য করবেন। এবং এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবেন।
- প্রতি শিক্ষাবছরের শুরুতে এসএমসি কর্তৃক প্রণীত সেবাগ্রহীতাদের তালিকা পর্যালোচনা, যাচাইকরণ এবং প্রয়োজনবোধে সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- প্রতিমাসে প্রতিটি উপজেলায় কমপক্ষে একবার করে এবং নূন্যতম পক্ষে ৩০টি বিদ্যালয়/মাদ্রাসা পরিদর্শনপূর্বক নির্দিষ্ট ছকে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।
- জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারবৃন্দ প্রকল্প বাস্তবায়নে উপবৃত্তি মনিটরিং অফিসার, সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের যাবতীয় কার্যক্রম তদারকি ও মনিটিরং করবেন।

বিভাগীয় উপপরিচালক ২০. বিভাগীয় উপপরিচালকগণ প্রকল্প বাস্তবায়ন উপবৃত্তি মনিটরিং অফিসার, সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণের যাবতীয় কার্যক্রম তদারকি ও মনিটরিং করবেন। প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতির জেলাভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন।

সংযোজনী–১১: উপজেলা রিসোর্স সেন্টার

প্রাথমিক শিক্ষক ও শিক্ষার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি) একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। পিটিআইতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের ধারাবাহিকভাবে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে নিয়মিত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। তাই, শ্রেণীকক্ষের দৈনন্দিন শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৯৯ সালের আগে প্রাথমিক স্কুলগুলোর নিকটবর্তী কোনো প্রতিষ্ঠান ছিলনা, যা সরাসরি নিয়মিত ও তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে। উপজেলাপর্যায়ে শিক্ষক ও প্রাথমিক শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও এসএমসিসহ অন্যান্য কমিটির কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ, ওরিয়েন্টেশন প্রদান, সেমিনার আয়োজন, কারিগরি সহায়তা প্রদান, তথ্য সরবরাহ, গ্রন্থাগার/ইকুইপমেন্ট সংক্রান্ত সুবিধাপ্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্যই এই রিসোর্স সেন্টারগুলো প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের কার্যক্রম

উপজেলা রিসোর্স সেন্টার বা ইউআরসি'র মূল দায়িত্ব হচ্ছে, স্থানীয়ভাবে অথবা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/নেপ

(NAPE) পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশন/সেমিনারের আয়োজনের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা। উপজেলা রিসোর্স সেন্টার-এর কাজগুলোর মধ্যে নিচে প্রদত্ত কাজগুলো উল্লেখযোগ্য:

১. তাৎক্ষণিক চাহিদার ভিত্তিতে বা চাহিদা যাচাইয়ের ভিত্তিতে প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, প্রাথমিক শিক্ষার সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরি করে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

২. বিদ্যালয় পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষকদের চাহিদা যাচাই ও প্রশিক্ষণের ফলাফল/প্রভাব প্রত্যক্ষণ করে পরবর্তী কার্যক্রম স্থির করা।

৩. এসএমসি-কে শক্তিশালী ও দক্ষ করার জন্য ওরিয়েন্টশন আয়োজন।

৪. বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাহিদা যাচাইয়ের জন্য শিক্ষক প্রোফাইলসহ বিদ্যালয়ের মান সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা।

৫. ইউআরসি প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত বইপত্র, পিরিওডিক্যালস, ম্যাগাজিন ইত্যাদি সংরক্ষণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা নেবে। স্থানীয়ভাবে অবহিতকরণের জন্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিউজ লেটার/তথ্যপুস্তিকা প্রকাশ করবে।

৬. পাঠসংক্রান্ত শিক্ষা-উপকরণ তৈরি, সংরক্ষণ ও ক্লাসে এর ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের জনবল ও রিসোর্স পুল- প্রতিটি রিসোর্স সেন্টারে একজন ইন্স্ট্রাকটর, একজন এইউইও, একজন ডাটা অপারেটর ও একজন নৈশ প্রহরী থাকবেন। এ ছাড়াও প্রতিটি ইউআরসি'র জন্য রিসোর্সপুল থাকবে। এলাকার অভিজ্ঞ ও মেধাবী শিক্ষক, পিটিআই ইনস্ট্রাকটর, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, গায়ক, শিল্পী, নাট্যকর্মী, ক্রীড়াবিদ, পাপেট পেইন্টার প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ নিয়ে ২০ সদস্যের এ পুল গঠন করা যাবে। প্রাথমিক শিক্ষাক্রমভুক্ত প্রধান ৫টি বিষয়ের প্রতিটিতে নূন্যতম ২জন পারদর্শী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে অবশ্যই এ পুলে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। প্রতি ২বছর পর পর এই পুলকে পুনর্গঠন করতে হবে। ইউআরসি কর্মকর্তাগণ এ রিসোর্স পুল-এর তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সহায়তা নিয়ে তাদের একাডেমিক কার্যক্রম উন্নয়ন ও পরিচালনা করবেন। রিসোর্স পুল সদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের ব্যবস্থাপনা কমিটি - প্রত্যেকটি উপজেলা রিসোর্স কেন্দ্রের কার্যক্রম দেখাশুনা করার জন্য নিম্নলিখিত ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে:

জেলার /নিকটস্থ জেলার পিটিআই সুপার	সভাপতি
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
সংশ্লিষ্ট উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
উপজেলা মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক	সদস্য
ইনস্ট্রাক্টর	সদস্য সচিব

রিসোর্স সেন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের দায় দায়িত্ব

১. সভাপতি হিসেবে সংশ্লিষ্ট পিটিআই সুপার ইউআরসি'র সমস্ত অ্যাকাডেমিক বিষয় ও প্রশিক্ষণ কার্যাবলী তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করবেন।

২. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন। পরিদর্শনকালে যখনই ইউআরসি'র কোনো অনিয়ম চোখে পড়বে, তা পিটিআই সুপারের নজরে আনবেন। প্রতিবছর এপ্রিল মাসে সমন্বয়সভায় কেন্দ্রীয়ভাবে প্রণীত গাইডলাইন অনুসারে জেলার সকল ইউআরসি'র বার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই-জুন) তৈরি করবেন। এই সভায় পিটিআই সুপার বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

৩. উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ইউআরসি'র মধ্যে পারস্পারিক বোঝাপড়া ও সমন্বয়ের জন্য ইউইও'র ভূমিকা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে তিনি প্রশিক্ষণের জন্যে শিক্ষকদের ডেপুটেশন প্রদান করবেন। ইউআরসি'র ইনস্ট্রাক্টরকে স্কুল ভিজিটে যোগদানের আহবান জানাবেন।

৪. ইউআরসি ইনস্ট্রাকদের জন্য এক মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ দিবেন।

উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের ইনস্ট্রাক্টর-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইনস্ট্রাক্টর বার্ষিকভিত্তিতে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। রিসোর্স সেন্টার কমিটির নিকট থেকে এই কর্ম-পরিকল্পনার অনুমোদন গ্রহণ করবেন।

- প্রয়োজন অনুসারে বিদ্যালয় ও সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করবেন এবং তার মন্তব্য ও পরামর্শ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অবহিত করবেন। এই পরিদর্শনকৃত তথ্যাদি প্রশিক্ষণচাহিদা নিরূপণের কাজে ব্যবহার করবেন।
- সংশ্লিষ্ট উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকের প্রশিক্ষণসংক্রান্ত তথ্য ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে উর্ধ্বতন পর্যায়ে মনিটর করবেন।
- সময়ান্তরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে জারিকৃত নির্দেশাবলী পালন ও বাস্তবায়ন করবেন।
- তথ্যপুস্তিকা/নিউজ লেটার প্রকাশ ও বিতরণ করবেন।

উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

- রিসোর্স সেন্টারের কার্যক্রম আয়োজন ও পরিচালনার বিষয়ে ইনস্ট্রাক্টর (ইউআরসি)-কে সহায়তা করবেন।
- রিসোর্স সেন্টারের আয়-ব্যায় কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।
- রিসোর্স সেন্টারের সমস্ত নঁথি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন।
- রিসোর্স সেন্টারের সমস্ত মালামাল সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন।
- ইন্সস্ট্রাক্টরের নির্দেশ মোতাবেক প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন ও সমীক্ষা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবেন।

সংযোজনী–১২: ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ

প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের জন্য প্রায় দু'দশক ধরে প্রথমে ক্লাস্টার এবং পরে সাব-ক্লাস্টার পর্যায়ে চালু রয়েছে বহুল আলোচিত এই প্রশিক্ষণ। তত্ত্বাবধানের সুবিধার্থে একটি উপজেলাকে এইউইও সংখ্যানুযায়ী কয়েকটি ক্লাস্টারে ভাগ করা হয়। পরে প্রতিটি ক্লাস্টারকে আবার কয়েকটি সাব-ক্লাস্টারে ভাগ করা হয়। একটি সাবক্লাস্টারের অন্তর্ভুক্ত ৫/৬টি বিদ্যালয়য়ের এসএমসি সভাপতি/সদস্যসহ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ হয়। এই প্রশিক্ষণের মূল সংগঠক এবং প্রধান প্রশিক্ষক সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টারের সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার। প্রদর্শনী পাঠ, শ্রেণীকক্ষের পাঠদানের সমস্যা, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় উদ্ভূত স্থানীয় সমস্যা ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত। এটি মূলতঃ সক্রিয় তৎপরতাভিত্তিক একটি অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণের পর্যবেক্ষক হিসেবে যারা থাকেন, তারা হচ্ছেন- উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান।

শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে তার প্রতিকারের পথ খুঁজে বের করা সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের অন্যতম লক্ষ্য।

সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের কয়েকটি নীতি:

১. কারিকুলামভিত্তিক প্রশিক্ষণ;
২. দুইমাসে একবার প্রশিক্ষণ;
৩. ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস ফোর মোট সাতাশটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ;
৪. সাবজেক্ট-বেইজড মডিউল ধরে প্রশিক্ষণ;
৫. একটি উপজেলায় একই সঙ্গে প্রশিক্ষণ;
৬. জোড়মাসের শেষের দশদিনের মধ্যে হয় এই প্রশিক্ষণ;
৭. সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত প্রশিক্ষণ;
৮. সাবক্লাস্টার সহায়িকা ধরে একেকদিন একেকটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ;

৯. এইউইও প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন;

১০. পর্যায়ক্রমে সাব-ক্লাস্টারভুক্ত সব স্কুলেই প্রশিক্ষণ হয়;

১১. একই ধারণা নিয়ে সব জায়গায় আলোচনা করা হয়;

১২. অংশগ্রহণকারী ত্রিশ (৩০) জনের বেশি হবে না;

১৩. এসএমসি'র সভাপতি অতিথি হিসেবে থাকবেন;

১৪. একজন শিক্ষকের প্রদর্শনী পাঠ হবে এবং ফিডব্যাক হবে ৩০ মিনিট।

যথাযথভাবে সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ প্রদান ও গ্রহণ করা হলে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দৈনন্দিন উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা অর্জন অনেকখানি এগিয়ে নেয়া সম্ভব হতো। কিন্তু বাস্তবে কেউ কেউ মনে করেন, সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ তেমন গুরুত্ব দিয়ে করা হয়না। দুই মাস পরপর এই প্রশিক্ষণ অনেকটা আনুষ্ঠানিকতার মতো অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। তাই এখন যেভাবে সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ হচ্ছে, তা বন্ধ করে ইউআরসি'র উপর এই দায়িত্ব দেয়া যুক্তিযুক্ত। এতে এই প্রশিক্ষণ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করবে।

সংযোজনী-১৩: ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি (স্ট্যান্ডিং কমিটি)

ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ড সুষ্ঠভাবে সম্পাদন ও জনঅংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি ও অন্যান্য কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষাবিষয়ক স্থায়ী কমিটি অন্যতম (পূর্বে এগুলোকে স্ট্যান্ডিং কমিটি বলা হতো)। নিচে কমিটিগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন-২০০৯ অনুসারে ১৩টি স্থায়ী কমিটি ইউনিয়ন পরিষদ স্থায়ী কমিটি গঠন ও উহার কার্যাবলী:

১. পরিষদ উহার কার্যাবলী সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার জন্য নিম্নবর্ণিত প্রত্যেকটি সম্পর্কে একটি করিয়া স্থায়ী কমিটি গঠন করিবে, যথা:

ক) অর্থ ও সংস্থাপন;

খ) হিসাব নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ;

গ) কর নিরূপণ ও আদায়;

ঘ) শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা;

ঙ) কৃষি, মৎস্য ও পশুসম্পদ এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কাজ;

চ) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি;

ছ) আইন-শৃংখলা রক্ষা;

জ) জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন;

ঝ) স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশন;

ঞ) সমাজকল্যাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা;

ট) পরিবেশ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণ;

ঠ) পারিবারিক বিরোধ নিরসন এবং নারী ও শিশু কল্যাণ (পাবর্ত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য হইবে না);

ড) সংস্কৃতি ও খেলাধুলা।

২. উপ-ধারা ১-এ উল্লিখিত স্থায়ী কমিটি ব্যতীত পরিষদ, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, প্রয়োজনে, ডেপুটি কমিশনারের অনুমোদনক্রমে, অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

৩. কো-অপট সদস্যব্যতীত পরিষদের সদস্যগণের মধ্য হইতে স্থায়ী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হইবেন এবং মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন হইতে নির্বাচিত সদস্যগণ অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ স্থায়ী কমিটির সভাপতি

থাকিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শুধুমাত্র আইন-শৃংখলাবিষয়ক কমিটির সভাপতি থাকিবেন।

৪. স্থায়ী কমিটি পাঁচ হইতে সাত সদস্যবিশিষ্ট হইবে এবং কমিটি প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোনো একজন ব্যক্তিকে কমিটির সদস্য হিসাবে কো-অপট করিতে পারিবে; তবে কো-অপট সদস্যের কোনো ভোটাধিকার থাকিবে না।

৫. অন্যান্য সদস্যগণ স্থানীয় জনসাধারণের মধ্য হইতে সংশ্লিষ্ট কমিটিতে অবদান রাখিবার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য হইতে মনোনীত হইবেন।

৬. স্থায়ী কমিটির সুপারিশ পরিষদের পরবর্তী সভায় বিবেচনার পর গৃহীত হইবে; তবে কোনো সুপারিশ ইউনিয়ন পরিষদে গৃহীত না হইলে, তাহার যথার্থতা ও কারণ লিখিতভাবে স্থায়ী কমিটিকে জানাইতে হইবে।

৭. স্থায়ী কমিটির সকল কার্যধারা পরিষদের সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে চূড়ান্ত হইবে।

৮. নিম্নলিখিত কারণে পরিষদ কোনো স্থায়ী কমিটি ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবে, যথা:

   ক) বিধি মোতাবেক নিয়মিত সভা আহ্বান করিতে না পারিলে;

   খ) নির্ধারিত ক্ষেত্রে ক্রমাগতভাবে পরিষদকে পরামর্শ প্রদানে ব্যথ হইলে; অথবা

   গ) এই আইন বা অন্য কোনো আইনের বিধান বহির্ভূত কোনো কাজ করিলে।

৯. প্রত্যেক স্থায়ী কমিটি প্রতি দুইমাস অন্তর সভায় মিলিত হইবে। তবে প্রয়োজনে অতিরিক্ত সভা অনুষ্ঠান করিতে পারিবে।

১০. স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে। তবে উক্তরূপ প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত পরিষদের সাধারণ সভায় স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী নিরূপণ করা যাইবে।

প্রয়োজনে ইউনয়ন পরিষদ বিধিসম্মতভাবে অতিরিক্ত স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

স্থায়ী কমিটি গঠনের বিধান

ইউনিয়ন পরিষদ বছরের প্রথম সভায় অথবা যথাশীঘ্র যেকোনো সভায় ১৩টি কমিটি গঠন করবে। জেলা প্রশাসকের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে ইউনিয়ন পরিষদ কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠন করতে পারবে। কমিটি তার সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবে।

কমিটিতে বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন একজন ব্যাক্তিকে সংযোজিত সদস্য হিসাবে যুক্ত করা যাবে। কিন্তু এ ধরনের সংযোজিত সদস্যের কমিটির সভায় ভোটাধিকার থাকবে না। ইউনিয়ন পরিষদ-এর এক তৃতীয়াংশের বেশি সদস্য কোনো কমিটিতে থাকতে পারবেন না। কোনো সদস্য একই সাথে একাধিক কমিটির চেয়ারম্যান হতে পারবেন না। নারী ও শিশু কল্যাণ, মৎস্য ও পশু সম্পদ, বৃক্ষ-রোপণসংক্রান্ত কমিটিগুলোতে সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত হতে উৎসাহিত করতে হবে।

সংযোজনী–১৪: উপজেলা পরিষদ স্থায়ী কমিটি (২০১১তে প্রণীত সংশোধিত আইন অনুসারে)

১. উপজেলা পরিষদ উহার কার্যাবলী সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার জন্য পরিষদ গঠিত হইবার পর চেয়ারম্যান বা সদস্য বা মহিলা সদস্যগণ সমন্বয়ে নিম্নবর্ণিত (১৭টি) বিষয়ে প্রত্যেকটি সম্পর্কে একটি করিয়া কমিটি গঠন করিবে, যাহার মেয়াদ সর্বোচ্চ দুই বৎসর ছয় মাস হইবে, যথা:-

- আইন-শৃঙ্খলা;
- যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন;
- কৃষি ও সেচ;
- মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা;
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা;

- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ;
- যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন;
- মহিলা ও শিশু উন্নয়ন;
- সমাজকল্যাণ;
- মুক্তিযোদ্ধা;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ;
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়;
- সংস্কৃতি;
- পরিবেশ ও বন;
- বাজারমূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ;
- অর্থ,বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ;
- জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ।

২. পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যানের মধ্য হইতে কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হইবেন।

৩. সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপজেলা অফিসার এই ধারার অধীন গঠিত কমিটির সদস্য-সচিব হইবেন এবং পরিষদে হস্তান্তরিত নয়, এমন বিষয়সম্পর্কিত কমিটির সদস্য-সচিব হিসাবে একজন কর্মকর্তাকে উপজেলা পরিষদ নির্ধারণ করিবে।

৪. কমিটি অন্যূন ৫ (পাঁচ)জন এবং অনূর্ধ্ব ৭ (সাত)জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে এবং কমিটি, প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ কোনোব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত (Co-opt) করিতে পারিবে।

৫. কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত সদস্য (Co-opt member) এবং সদস্য-সচিবের কোনো ভোটাধিকার থাকিবে না।

৬. প্রত্যেক কমিটির সভা প্রতি দুই মাসে অন্যূন একবার অনুষ্ঠিত হইবে।

৭. নিম্নলিখিত কারণে পরিষদ কোনো কমিটি ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবে, যথা:

ক) উপধারা- ৬ অনুযায়ী নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হইলে; এবং

খ) এই আইন বা তদ্‌ধীন প্রণীত বিধির বিধানবহির্ভুত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে বা কাজ করিলে।

সংযোজনী–১৫: প্রাথমিক স্তরের প্রান্তিক যোগ্যতা

প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম–একটি শিশু পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করার পর কোন কোন বিষয়ে কী কী ধরনের যোগ্যতা অর্জন করবে, সে বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিয়ে জাতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক ভাবে ৫৩টি এবং পরবর্তী সময়ে ৫০টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। আশা করা হয় যে, এ যোগ্যতাগুলো অর্জিত হলে একটি শিশুর জীবন ধারণের জন্য নূন্যতম প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গি অর্জিত হবে; এবং তার মধ্যে আচরণিক পরিবর্তন আসবে এবং তার ইতিবাচক মূল্যবোধের স্ফূরণ ঘটবে। নির্ধারিত প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো প্রথম শ্রেণী থেকে শুরু করে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিষয়ের মধ্যে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে। কোনো কোনো যোগ্যতা নির্দিষ্ট একটি বা দুটি শ্রেণীতে, আবার কোন কোন যোগ্যতা ১-৫ শ্রেণী পর্যন্ত সব শ্রেণীতে বিস্তৃত করা হয়েছে। শেষোক্ত যোগ্যতাগুলো ৫ বছরের শিক্ষাচক্র শেষ করলে অর্জন করতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে। যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শুরু ও শেষ হওয়ার স্তর ভিন্নতর হতে পারে। তাই, ৫ বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম সম্পন্ন না হলে অনেকগুলো প্রান্তিক যোগ্যতাই অর্জন সম্ভব হবে না অথবা এ অর্জন হবে অসম্পূর্ণ।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে অর্জন উপযোগী ৫০ টি প্রান্তিক যোগ্যতা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. সর্বশক্তিমান আল্লাহতা'য়ালার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা।

২. সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে জানা এবং স্রষ্টাকে সকল কাজে স্মরণ করা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

৩. আল্লাহর রাসুল হযরত মুহাম্মদ(স:) বা স্ব-স্ব ধর্মপ্রবর্তকের জীবনচরিত জানা এবং তাঁদের শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণ করা।

৪. স্ব-স্ব ধর্মগ্রন্থ সর্ম্পকে জানা এবং স্ব- স্ব ধর্মের অনুশাসন অনুসরণের মাধ্যমে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করা।

৫. স্রষ্টার সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা।

৬. জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সম্মান ও সহনশীলতা প্রদর্শন করা।

৭. অন্যান্য দেশ সম্পর্কে জানা এবং তাঁদের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধ সঞ্চার করা।

৮. মানুষের মৌলিক চাহিদা সর্ম্পকে ধারণা লাভ করা এবং সুন্দর জীবন গঠনে সচেতন হওয়া।

৯. নিজের অধিকার এবং অন্যের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হওয়া।

১০. অপরের মতামত প্রকাশের সুযোগ দান করা এবং ব্যক্ত মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

১১. সকলের প্রতি সহযোগিতাপূর্ণ ও বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করা।

১২. কায়িক শ্রমযুক্ত কাজে আগ্রহী হওয়া এবং শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

১৩. পরিবারের সদস্য হিসেবে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে জানা এবং গৃহকর্মে অংশগ্রহণ করা।

১৪. সামাজিক ও বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজের ও অপরের অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

১৫. গণতান্ত্রিক রীতি সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং সুনাগরিক হিসেবে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হওয়া।

১৬. স্বার্থত্যাগের মনোভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশগঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা।

১৭. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থা এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা।

১৮. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

১৯. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কে জানা এবং এসব বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

২০. পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে সক্রিয় হওয়া।

২১. বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব এবং বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির প্রতি উদারতাবোধ এবং বিশ্ব শান্তি চেতনার প্রতি আগ্রহী হওয়া।

২২. ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণে যত্নশীল হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করা।

২৩. দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং পরিবেশের ওপর এর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করা।

২৪. বাংলা ভাষার গঠনপ্রণালী, বাক্যবিন্যাস ও নিয়ম শৃঙ্খলার বিষয়ে জ্ঞানলাভ ও প্রয়োগ করতে পারা।

২৫. বাংলা ছড়া, কবিতা, গল্প, বক্তৃতা, বর্ণনা ও কথোপকথন মনোযোগ সহকারে শুনে মূলভাব বুঝতে পারা।

২৬. সহপাঠী ও অন্যদের সঙ্গে বোধগম্যভাবে শুদ্ধ এবং প্রমিত উচ্চারণে চলিত বাংলায় বলতে পারা।

২৭. বাংলা ভাষায় ছাপা এবং হাতেলেখা বিষয়বস্তু শুদ্ধভাবে পড়তে পারা এবং পঠিত বিষয়বস্তুর মর্ম অনুধাবন করা।

২৮. পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও মনোভাব বাংলা ভাষায় শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে লিখে প্রকাশ করতে পারা, সাধারণ চিঠি ও দরখাস্ত লিখতে পারা এবং বিভিন্ন ফরম পূরণ করতে পারা।

২৯. সংখ্যার ধারণা লাভ করা এবং সংখ্যা ব্যবহার করতে পারা।

৩০. সংখ্যাবাচক ও ক্রমবাচক (তারিখ সহ) শব্দসমূহ শুনতে, বলতে, পড়তে ও লিখতে পারা।

৩১. গণিতের প্রাথমিক চার নিয়ম জানা ও ব্যবহার করতে পারা।

৩২. পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর জ্যামিতিক আকার আকৃতি চেনা ও ব্যবহার করতে পারা।

৩৩.দৈর্ঘ্য, ওজন, ক্ষেত্রফল, আয়তন, সময় ও মুদ্রার একক জানা এবং তা ব্যবহার করতে পারা।

৩৪.বাস্তবমুখী ও তথ্যভিত্তিক সহজ সমস্যা সমাধানে গাণিতিক কৌশল প্রয়োগ করতে পারা।

৩৫.পরিবেশের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ, বিন্যাস ও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে তা ব্যবহার করতে পারা।

৩৬.ক্যালকুলেটর ও কম্পিউটার সম্পর্কে জানা এবং হিসাবনিকাশে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারা।

৩৭.জনসংখ্যাবিষয়ক সমস্যা সমাধানে গাণিতিক জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারা।

৩৮.ইংরেজি ভাষায় সহজ কথোপকথন, গল্প ও ছড়া শোনা, বুঝা ও উপভোগ করতে পারা।

৩৯.পর্যবেক্ষণ, ধারণা ও মনোভাব ইংরেজিতে সহজ শুদ্ধ বাক্যে বলতে পারা।

৪০.ইংরেজি ভাষায় ছাপা এবং হাতেলেখা বিষয়বস্তু পড়তে ও বুঝতে পারা।

৪১.ইংরেজিতে শুদ্ধ ও সহজভাবে অভিজ্ঞতা ও পরিচিত বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখতে পারা।

৪২.দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মনোন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার সর্ম্পকে জ্ঞান অর্জন করা।

৪৩.বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে সমস্যা সমাধানের অভ্যাস গঠন করা।

৪৪.বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা।

৪৫.পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে পরিবেশকে জানা এবং অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনাকে শ্রেণীকরণ করতে পারা।

৪৬.চারু ও কারুকলা চর্চার (যেমন- নকশা অঙ্কন, চিত্রাঙ্কন, মাটি, কাঠ, কাপড় ও কাগজের কাজ) মাধ্যমে সৃষ্টির বৈচিত্র্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং নিজের সৃজনশীলতা বিকাশ ও সৌন্দর্য উপভোগের ক্ষেত্র প্রসার করা।

৪৭.সঙ্গীত, নৃত ও নাট্যের মাধ্যমে নিজের সৃজনশীলতা, সৌন্দর্যচেতনা, নান্দনিকবোধ ও বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করা।

৪৮.খেলাধুলা ও শরীরচর্চায় আগ্রহী হওয়া।

৪৯.সুস্থ জীবনযাপনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্যবিধি জানা ও পালন করা।

৫০.সততা, ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ ও শিষ্টাচারসহ সকলের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করার মানসিকতা অর্জন এবং আচরণে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

সংযোজনী–১৬: সিটিজেন'স চার্টারস

(Citizen's Charter)

সিটিজেন'স চার্টার-১

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য

ক্রম	প্রদেয় সেবা	সেবা গ্রহীতা	সেবা প্রাপ্তির জন্য করণীয়	সেবা প্রদানকারীর করণীয়	কার্য সম্পাদনের সময়সীমা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	শিশু ভর্তি	অভিভাবক/ শিক্ষার্থী	শিশুর বয়স ৬-বছর পূর্তি হলেই তাকে নিকটবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে হবে।	জন্ম নিবন্ধন সনদ গ্রহণক্রমে (না থাকলে সংগ্রহ করতে হবে) শিক্ষার্থীকে ভর্তিকরত অভিভাবক/শিক্ষার্থীকে জানিয়ে দিতে হবে।	তাৎক্ষণিক বা সর্বোচ্চ ১ (এক) কার্যদিবস	
২.	বিনামূল্যে বই বিতরণ	অভিভাবক/ শিক্ষার্থী	নিকটবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সন্তানকে ভর্তি করাতে হবে।	তাৎক্ষণিকভাবে বই বিতরণ করতে হবে।	নতুন বছরের শুরুতে	
৩.	উপবৃত্তির তালিকা প্রণয়ন (প্রযোজ্য এলাকায়)	অভিভাবক/ শিক্ষক	ভর্তি শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার কমপক্ষে ৮৫%এবং তার পরীক্ষার প্রাপ্ত মার্কস ৪০% হতে হবে।	বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি-র সহায়তায় খসড়া তালিকা প্রণয়ন উপজেলা শিক্ষা অফিসে প্রেরণ করতে হবে।	প্রতিবছর মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ	
৪.	এসএমসি/ পিটিএ গঠন/পুনর্গঠন	অভিভাবক/ আগ্রহী ব্যক্তি/ শিক্ষক	কেউ প্রার্থী হতে চাইলে তাকে প্রধান শিক্ষক বরাবর লিখিত আবেদন করতে হবে।	এ সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশনা ও নীতিমালা অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	চলমান কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার কমপক্ষে ৩-মাস পূর্বে	
৫.	বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন লিখন	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে নির্ধারিত ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে প্রধান শিক্ষকের নিকট উপস্থাপন করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন অনুস্বাক্ষর করে সংশ্লিষ্ট প্রতি স্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা/উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত ও সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা লিখিত ভাবে অবহিত করতে হবে।	২৮শে ফেব্রুয়ারি	

ক্রম	প্রদেয় সেবা	সেবা গ্রহীতা	সেবা প্রাপ্তির জন্য করণীয়	সেবা প্রদানকারীর করণীয়	কার্য সম্পাদনের সময়সীমা	মন্তব্য
৬.	ছাড়পত্রের জন্য আবেদনের নিষ্পত্তি	অভিভাবক/ শিক্ষার্থী	বৈধ অভিভাবক কর্তৃক সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক প্রধান শিক্ষকের নিকট বিদ্যালয় চলাকালে লিখিত/মৌখিকভাবে আবেদন করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে বিনামূল্যে ছাড়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।	সর্বোচ্চ ১ (এক) কার্যদিবস	
৭.	সনদপত্রের জন্য আবেদনের নিষ্পত্তি	অভিভাবক/ শিক্ষার্থী	বৈধ অভিভাবক কর্তৃক সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক প্রধান শিক্ষকের নিকট বিদ্যালয় চলা কালে লিখিত আবেদন/ দরখাস্ত করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে বিনামূল্যে ছাড়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সর্বোচ্চ ১ (এক) কার্যদিবস	
৮.	বিভিন্ন প্রকারের দরখাস্ত/ আবেদন	যে কোন ব্যক্তি/ অভিভাবক/ ছাত্র ছাত্রী	প্রধান শিক্ষকের নিকট পূর্ণ নাম-ঠিকানাসহ সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ করে লিখিত আবেদন/ দরখাস্ত করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা/ প্রতিকার গ্রহণ করতে হবে; তবে নিজ এক্তিয়ারভুক্ত বিষয় না হলে যথাস্থানে আবেদন অগ্রায়ন/প্রেরণ ও সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	৭ (সাত) কার্যদিবস (নিজ এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়) অন্যক্ষেত্রে ২ (দুই) কার্যদিবস	
৯.	শ্রেণীতে পাঠদান নিশ্চিত ও ফলপ্রসূকরণ	ছাত্র-ছাত্রী	বিদ্যালয়ে নিয়মিত আগমন ও নিজ শ্রেণীতে অবস্থান করতে হবে।	পাঠপরিকল্পনা ও উযুক্ত উপকরণসহ নির্দিষ্ট সময়ে শ্রেণীতে হাজির হতে ও পাঠদান নিশ্চিত তরতে হবে।	ক্লাস রুটিন অনুযায়ী	
১০.	তথ্য প্রদান/ সরবরাহ	দায়িত্ববান যে কোন ব্যক্তি/ অভিভাবক/ ছাত্র ছাত্রী	প্রধান শিক্ষকের নিকট পূর্ণ নাম-ঠিকানাসহ সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ করে লিখিত আবেদন/দরখাস্ত করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে প্রদানযোগ্য তথ্য প্রদান/সরবরাহ করতে; তবে নিজ এক্তিয়ারভুক্ত বিষয় না হলে যথাস্থানে আবেদনের পরামর্শ প্রদান করতে হবে।	সম্ভব হলে তাৎক্ষণিক; না হলে সর্বোচ্চ ১ (এক) কার্যদিবস	

সিটিজেন'স চার্টার-২

(Citizen's Charter)

উপজেলা শিক্ষা অফিস

ক্রম	প্রদেয় সেবা	সেবা গ্রহীতা	সেবা প্রাপ্তির জন্য করণীয়	সেবা প্রদানকারীর করণীয়	কার্য সম্পাদনের সময়সীমা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	বিনামূল্যে বই বিতরণ	অভিভাবক/ শিক্ষার্থী	নিকটবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যথাসময়ে সন্তানকে ভর্তি করতে হবে।	উপজেলা শিক্ষা অফিসার বিদ্যালয়ের চাহিদা ও প্রাপ্যতা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে বই বিতরণ নিষ্চত করবেন; বিতরণের হিসাব নির্দিষ্ট রেজিষ্টারে অন্তর্ভুক্ত/সংরক্ষণ করবেন এবং এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ করবেন।	ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ	
২.	এসএমসি ও পিটিএ গঠন/পুনর্গঠন		কেউ প্রার্থী হতে চাইলে তাঁকে সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নিকট লিখিত আবেদন করতে হবে।	নির্দেশনা ও নীতিমালা মোতাবেক কমিটি গঠন করতে হবে।	কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার তিন মাস পুর্বে উদ্যোগ গ্রহণ	
৩.	উপবৃত্তি তালিকা প্রণয়ন		নিকটবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যথাসময়ে সন্তানকে ভর্তি করাতে হবে।	যথাযথ তালিকা তৈরি করে এসংক্রান্ত 'নীতিমালা' অনুযায়ী উপবৃত্তি প্রদান করতে হবে।	প্রতিবছর মার্চ মাসে	
৪.	বি.এড ও এমএড-সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অনুমতি প্রদান	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	৩১শে মার্চ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলা শিক্ষা অফিস বরাবর আবেদন করতে হবে।	আবেদনের প্রেক্ষিতে বিধি মোতাবেক জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	১৫ই এপ্রিলের মধ্যে	

ক্রম	প্রদেয় সেবা	সেবা গ্রহীতা	সেবা প্রাপ্তির জন্য করণীয়	সেবা প্রদানকারীর করণীয়	কার্য সম্পাদনের সময়সীমা	মন্তব্য
৫.	টাইমস্কেল-এর আবেদন নিষ্পত্তি	শিক্ষক/ কর্মচারী	যথাসময়ে আবেদন করতে হবে। আবেদনের সঙ্গে বিগত ৩- বছরের এসিআর ও সার্ভিস বুক (হালনাগাদ) জমা দিতে হবে।	ডিপিসি (DPC/ Departmental Promotion Committee) এর সুপারিশসহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট প্রেরণ এবং আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে	
৬.	পদোন্নতি প্রদান	প্রধান শিক্ষক	করণীয় নেই	ডিপিসি এর সুপারিশসহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট প্রেরণ এবং আবেদনকারীকে অবহিত করতে হবে।	পদশূণ্য হওয়ার ৯০ (নব্বই) কার্যদিবসের মধ্যে	
৭.	দক্ষতাসীমার আবেদন নিষ্পত্তি	শিক্ষক/ কর্মচারী	যথাসময়ে আবেদন করতে হবে । আবেদনের সঙ্গে বিগত ৩-বছরের এসিআর ও সার্ভিস বুক (হালনাগাদ) জমা দিতে হবে।	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর আবেদন অগ্রায়ন এবং আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে	
৮.	এলপিআর/ লাম্পগ্রান্ট সংক্রান্ত আবেদন নিষ্পত্তি	শিক্ষক/ কর্মচারী	নিম্নোক্ত কাগজপত্রসহ আবেদন দাখিল করতে হবে; ১.এসএসসি/স্কুল ত্যাগের সনদ ২. এলপিসি ৩. প্রথম নিয়োগ পত্র ৪. চাকুরির খতিয়ান বহি ৫. ছুটি প্রাপ্তির সনদ।	উপজেলা শিক্ষা অফিসার সংশ্লিষ্ট আবেদন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট প্রেরণ এবং আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	দাখিল পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে	
৯.	পেনশন কেস/ আবেদনের নিষ্পত্তি	শিক্ষক/ কর্মচারী	পেনশন নিম্নোক্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে: ১. নির্ধারিত ফরমে পেনশন প্রাপ্তির আবেদনপত্র (৩ কপি)	আবেদন প্রাপ্তির ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে সকল কাগজপত্র যাচাইপূর্বক জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ	দাখিলের ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে	

ক্রম	প্রদেয় সেবা	সেবা গ্রহীতা	সেবা প্রাপ্তির জন্য করণীয়	সেবা প্রদানকারীর করণীয়	কার্য সম্পাদনের সময়সীমা	মন্তব্য
			২. সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ ৩. চাকুরির পূর্ণ বিবরণী ৪. নিয়োগপত্র ৫. পদোন্নতির পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ৬. উন্নয়ন খাতে চাকুরি হয়ে থাকলে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের সকল আবেদন কপি ৭. চাকুরির খতিয়ান বহি ৮. পাসপোর্ট আকারের ৬ (ছয়) কপি সত্যায়িত ছবি ৯. নাগরিকত্ব সনদ ১০. না- দামি পত্র ১১. শেষ বেতনের প্রত্যয়ন পত্র (এলপিসি) ১২. হাতের পাঁচ আঙ্গুলের ছাপসম্বলিত প্রমানপত্র ১৩. নমুনা স্বাক্ষর ১৪. ব্যাংক হিসাব নম্বর ১৫. চাকুরির স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত আদেশ ১৬. উত্তরাধিকারী/ওয়ারিশ নির্বাচনের সনদ ১৭.'অডিট আপত্তি' ও 'বিভাগীয় মামলা নাই' মর্মে সুস্পষ্ট লিখিত সনদ ১৮. অবসর প্রস্তুতিজনিত ছুটি (এলপিআর)- এর আদেশ কপি। পারিবারিক পেনশন নিম্নোক্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে: ১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন পত্র দাখিল করতে হবে (৩ কপি) ২. মৃত্যুসংক্রান্ত সনদ ৩. নিয়োগ পত্র ৪. পদোন্নতি পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ৫. শিক্ষাগত সনদ ৬. উন্নয়নখাতে চাকুরি হয়ে থাকলে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের সকল আদেশের কপি ৭. চাকুরির খতিয়ান বহি ৮. চাকুরির পূর্ণ বিবরণী ৯. নাগরিকত্ব সনদ ১০. উত্তারাধিকারী/ওয়ারিশ সনদ ১১. মৃত্যুর দিন পর্যন্ত বেতন প্রাপ্তির সনদ ১২. নমুনা স্বাক্ষর ১৩.পাসপোর্ট আকারের ৬ (ছয়) কপি সত্যায়িত ছবি ১৪. উত্তরাধিকারী/ওয়ারিশগনের ক্ষমতাপত্র ১৫. বিধবা হলে পুনর্বিবাহ না করার সনদ ১৭ শেষ বেতনের প্রত্যয়ণপত্র (এলপিসি) ১৮. ব্যাংক হিসাব নম্বর।	এবং সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।		

ক্রম	প্রদেয় সেবা	সেবা গ্রহীতা	সেবা প্রাপ্তির জন্য করণীয়	সেবা প্রদানকারীর করণীয়	কার্য সম্পাদনের সময়সীমা	মন্তব্য
	জিপিএফ থেকে ঋণ গ্রহণসংক্রান্ত আবেদনের নিষ্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও শিক্ষক/ শিক্ষিকা	নির্ধারিত ফরমে হালনাগাদ Account Slip-সহ আবেদন করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ এবং সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	৭ (সাত)	
১১.	জিপিএফ থেকে চূড়ান্ত উত্তোলন সংক্রান্ত আবেদনের নিষ্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও শিক্ষক/ শিক্ষিকা	নিম্নোক্ত কাগজপত্রসহ আবেদন করতে হবে: ১. ৬৬৩নং 'অডিট ম্যানুয়াল' ফরম (অফিস প্রধানকর্তৃক প্রতি স্বাক্ষরিত) ২. সংশ্লিষ্ট হিসাব রক্ষণ অফিসার কর্তৃক/Authority প্রদান সংক্রান্ত সনদ ৩. এলপিআর মঞ্জুরির আদেশ ৪. মৃতব্যক্তির ক্ষেত্রে মৃত্যুসংক্রান্ত সনদ ৫. প্রতিনিধি/Nominee সনদ ৬. বিধবা হলে পুর্নবিবাহ না করার অঙ্গিকারনামা।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ এবং সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে	
১২.	গৃহনির্মাণ ঋণ ও অনুরূপ আবেদনের নিষ্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও শিক্ষক/ শিক্ষিকা	নিম্নোক্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে ১. নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র ২. বায়নাপত্র ৩. ইতঃপূর্বে ঋণ গ্রহণ করেন নাই মর্মে অঙ্গিকারনামা ৪. 'রাজউক' বা অনুরূপ/ সংশ্লিষ্ট/উপযুক্ত (যেক্ষেত্রে যে টি প্রযোজ্য) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে প্রত্যয়ণপত্র ৫. সরকারি কৌসুলি/উকিল-এর মতামত ৬. নামজারি/ জমাখারিজ এর খতিয়ানের কপি ৭. ভূমি উন্নয়ন কর/খাজনা পরিশোধের দাখিলা/ রশিদ।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ এবং সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে	

ক্রম	প্রদেয় সেবা	সেবা গ্রহীতা	সেবা প্রাপ্তির জন্য করণীয়	সেবা প্রদানকারীর করণীয়	কার্য সম্পাদনের সময়সীমা	মন্তব্য
১৩.	পাসপোর্ট করণের অনুমতিদানের আবেদনের নিস্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও শিক্ষক/ শিক্ষিকা	নির্ধারিত ফরম পূরণ করে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের দপ্তরে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বরাবরে প্রেরণ এবং সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে	
১৪.	বিদেশ ভ্রমণ/গমন সংক্রান্ত আবেদন নিস্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও শিক্ষক/ শিক্ষিকা	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ফরমে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সাদা কাগজে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের - এর দপ্তরে লিখিত আবেদন করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ এবং সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে	
১৫.	উচ্চতর পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান	কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও শিক্ষক/ শিক্ষিকা	লিখিত আবেদন করতে হবে।		৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে	
১৬.	নৈমত্তিক ছুটি ব্যতীত বিভিন্ন প্রকার ছুটি সংক্রান্ত আবেদন নিস্পত্তি	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ফরমে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সাদা কাগজে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের দপ্তরে লিখিত আবেদন করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ এবং সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে	
১৭.	শিক্ষকদের বদলির আবেদন নিস্পত্তি (উপজেলার মধ্যে)	শিক্ষক/ শিক্ষকা	উপজেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর এ সংক্রান্ত ‘নীতিমালা’ অনুসারে আবেদন করতে হবে।	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বদলির ব্যবস্থা গ্রহণ; কিন্তু বিদ্যমান ‘নীতিমালা’ অনুসারে তা সম্ভব না হলে সেটি আবেদনকারীকে অবহিত করতে হবে।	৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে	
১৮.	শিক্ষকদের বদলির আবেদন নিস্পত্তি (উপজেলার বাইরে)		নিম্নোক্ত কাগজপত্রসহ আবেদন দাখিল করতে হবে। চাকুরির খতিয়ান বহির প্রথম পাঁচ পৃষ্ঠার সত্যায়িত অনুলিপি/ ফটোকপি ২. নিয়োগ পত্রের সত্যায়িত	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রস্তাব (পক্ষে/বিপক্ষে) প্রেরণ এবং সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে	

ক্রম	প্রদেয় সেবা	সেবা গ্রহীতা	সেবা প্রাপ্তির জন্য করণীয়	সেবা প্রদানকারীর করণীয়	কার্য সম্পাদনের সময়সীমা	মন্তব্য
			অনুলিপি/ফটোকপি ৩. প্রথম যোগদানের প্রমাণ/ কপি ৪. নিকাহনামা (মহিলাদের ক্ষেত্রে)-র প্রমাণ।			
১৯.	বকেয়া বিল-এর আবেদন নিষ্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও শিক্ষক/ শিক্ষিকা	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ উপজেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর দাখিল/উপস্থাপন করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ এবং সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে	
২০.	বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন/ প্রতিবেদন পূরণ/লিখন	কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও শিক্ষক/ শিক্ষিকা	৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে যথাযথভাবে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট উপস্থাপন করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে পূরণকৃত ফরম অনুস্বাক্ষর করে প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা/জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট উপস্থাপন/প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।	২৮শে ফেব্রুয়ারি	সংস্থা-পন মন্ত্রনা-লয়ের পরি-পত্রের নির্দেশ অনুযায়ী
২১.	তথ্য প্রদান/ সরবরাহ	দায়িত্ববান যে কোন ব্যক্তি/ অভিভাবক/ ছাত্র ছাত্রী	অফিস প্রধানের নিকট পূর্ণ নাম-ঠিকানাসহ সুষ্পষ্ট কারণ উল্লেখ করে লিখিত আবেদন/ দরখাস্ত করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে প্রদান যোগ্য তথ্য প্রদান/ সরবরাহ করতে হবে; তবে নিজএক্তিয়ার ভুক্ত বিষয় না থাকলে আবেদনের পরামর্শ প্রদান করতে হবে।	সম্ভব হলে তাৎক্ষনিক; না হলে সর্বোচ্চ ২ (দুই) কার্যদিবস	

সিটিজেন’স চার্টার-৩

(Citizen’s Charter)

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস

ক্রম	প্রদেয় সেবা	সেবা গ্রহীতা	সেবা প্রাপ্তির জন্য করণীয়	সেবা প্রদানকারীর করণীয়	কার্য সম্পাদনের সময়সীমা	মন্তব্য
১.	বিনামূল্যে বই বিতরণ	অভিভাবক/ শিক্ষার্থী	উপজেলা শিক্ষা অফিসার প্রয়োজনীয় চাহিদা জুলাই মাসের মধ্যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রদান নিশ্চিত করবেন।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কর্তৃক উপজেলা শিক্ষা অফিসের চাহিদা ও প্রাপ্যতানুযায়ী বই পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ডিসেম্বরর ১ম সপ্তাহ	
২.	বিএড/এমএড সংক্রান্ত প্রশিক্ষণার্থী-দের নামের প্রস্তাবনা		করণীয় নেই	এপ্রিল মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ-পরিচালক বরাবর প্রেরণ এবং আবেদনকারীকে অবহিত করতে হবে।	এপ্রিল মাসের মধ্যে	
৩.	উচ্চতর পরীক্ষায় অংশগ্রণের অনুমতি প্রদান		করণীয় নেই	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে শিক্ষকদের আবেদন স্বয়ং উপযুক্ত আদেশ প্রদান এবং অন্যান্য গুলো সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ-পরিচালক বরাবর প্রেরণ এবং আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে	
৪.	টাইমস্কেল-এর আবেদন নিষ্পত্তি	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	করণীয় নেই	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে উপযুক্ত আদেশ জারি করতে হবে।	৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে	
৫.	পদোন্নতি প্রদান	প্রধান শিক্ষক	করণীয় নেই	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে উপযুক্ত আদেশ জারি করতে হবে।	১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে	

ক্রম	প্রদেয় সেবা	সেবা গ্রহীতা	সেবা প্রাপ্তির জন্য করণীয়	সেবা প্রদানকারীর করণীয়	কার্য সম্পাদনের সময়সীমা	মন্তব্য
৬.	দক্ষতাসীমার আবেদন নিষ্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও শিক্ষক/ শিক্ষিকা	করণীয় নেই	৬নং কলামে বর্ণিত উপযুক্ত আদেশ জারি করতে হবে।	৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে	
৭.	এলপিআর/ লাম্পগ্রান্ট- আবেদন নিষ্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও শিক্ষক/ শিক্ষিকা	করণীয় নেই	৬নং কলামে বর্ণিত উপযুক্ত আদেশ জারি করতে হবে।	৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে	
৮.	পেনশন কেস/ আবেদনের নিষ্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও শিক্ষক/ শিক্ষিকা	করণীয় নেই	৬নং কলামে বর্ণিত উপযুক্ত আদেশ জারি করতে হবে।	১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে	
৯.	জিপিএফ থেকে ঋণগ্রহণ সংক্রান্ত আবেদনের নিষ্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও শিক্ষক/ শিক্ষিকা	করণীয় নেই	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে উপযুক্ত (মঞ্জুরি) আদেশ জারি অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উধর্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ নিশ্চিত এবং আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে	
১০.	জিপিএফ থেকে চূড়ান্ত উত্তোলন সংক্রান্ত আবেদনের নিষ্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারীও শিক্ষক/ শিক্ষিকা	করণীয় নেই	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের উপযুক্ত (মঞ্জুরি) আদেশ জারি করতে হবে।	৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে	
১১.	গৃহ নির্মাণ ও অনুরূপ আবেদনের নিষ্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও শিক্ষক/ শিক্ষিকা	করণীয় নেই	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ- পরিচালক বরাবরে প্রেরণ নিশ্চিত এবং আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে	
১২.	পাসপোর্ট করার আবেদনের নিষ্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও শিক্ষক/ শিক্ষিকা	করণীয় নেই	৬নং কলামে বর্ণিত সময়েল মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ- পরিচালক বরাবরে	৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে	

ক্রম	প্রদেয় সেবা	সেবা গ্রহীতা	সেবা প্রাপ্তির জন্য করণীয়	সেবা প্রদানকারীর করণীয়	কার্য সম্পাদনের সময়সীমা	মন্তব্য
				প্রেরণ নিশ্চিত এবং আবেদনকারীকে অবহিত করতে হবে।		
১৩.	বিদেশ ভ্রমণ/গমণ সংক্রান্ত আবেদনের নিষ্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও শিক্ষক/ শিক্ষিকা	করণীয় নেই	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে আবেদন সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ-পরিচালক বরাবরে প্রেরণ এবং আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে	
১৪.	নৈমত্তিক ছুটি ব্যতীত বিভিন্ন প্রকার ছুটি সংক্রান্ত আবেদনের নিষ্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও শিক্ষক/ শিক্ষিকা	করণীয় নেই	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে শিক্ষকদের আবেদন স্বয়ং উপযুক্ত আদেশ প্রদান এবং অন্য গুলো সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ-পরিচালক বরাবর প্রেরণ এবং আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে	
১৫.	শিক্ষকদের বদলির আবেদনের নিষ্পত্তি (জেলার মধ্যে/আন্তঃ উপজেলা)	শিক্ষক/ শিক্ষকা	করণীয় নেই	এ সংক্রান্ত প্রচলিত ‘নীতিমালা’ অনুসারে বদলির আদেশ জারিকরণ; কোন কারণে তা সম্ভব না হলে সেটি আবেদন-কারীকে অবহিত করতে হবে।	৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে	
১৬.	বকেয়া বিলের আবেদনের নিষ্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও শিক্ষক/ শিক্ষিকা	করণীয় নেই	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে বিল স্বাক্ষর/প্রতিস্বাক্ষর করত স্থানীয় হিসাব রক্ষণ অফিসে প্রেরণ করতে হবে অথবা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ও প্রাক- অনুমোদনের প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ-	৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে	

ক্রম	প্রদেয় সেবা	সেবা গ্রহীতা	সেবা প্রাপ্তির জন্য করণীয়	সেবা প্রদানকারীর করণীয়	কার্য সম্পাদনের সময়সীমা	মন্তব্য
				পরিচালকের মাধ্যমে মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ এবং আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।		
১৭.	বার্ষিক গোপণীয় অনুবেদন/ প্রতিবেদন পূরণ/লিখন (অধস্তন অফিস থেকে প্রাপ্ত)	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	করণীয় নেই	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত/ পূরণকৃত ফরম প্রতিস্বাক্ষরান্তে এসিআর শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তা অবহিত করবেন।	৩১শে মার্চ	সংস্থাপন মন্ত্রণা লয়ের পরি পত্রের নির্দেশ অনুযায়ী
১৮.	বার্ষিক গোপণীয় অনুবেদন/ প্রতিবেদন পূরণ/লিখন	নিজস্ব দপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারী	৩১শে জানুয়ারির মধ্যে যথাযথভাবে নির্ধারিত ফরম পূরণ করতে হনে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে পূরণকৃত ফরম অনুস্বাক্ষর করে প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ নিশ্চিত ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তা অবহিত করতে হবে।	২৮শে ফেব্রুয়ারি	সংস্থাপন মন্ত্রণা লয়ের পরি পত্রের নির্দেশ অনুযায়ী
১৯.	তথ্য প্রদান/ সরবরাহ	দায়িত্ববান যে কোন ব্যক্তি/ অভিভাবক/ ছাত্র ছাত্রী	অফিস প্রধানের নিকট পূর্ণ নাম-ঠিকানাসহ সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ করে লিখিত আবেদন/দরখাস্ত করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে প্রদানযোগ্য তথ্য প্রদান/সরবরাহ করতে হবে; তবে নিজ এক্তিয়ারভুক্ত বিষয় না হলে যথাস্থানে আবেদনের পরামর্শ প্রদান করতে হবে।	সম্ভব হলে তাৎক্ষণিক; না হলে সর্বোচ্চ ৩ (তন) কার্যদিবস	

সিটিজেন'স চার্টার-৫

(Citizen's Charter)

উপজেলা রিসোর্স সেন্টার

ক্রম	প্রদেয় সেবা	সেবা গ্রহীতা	সেবা প্রাপ্তির জন্য করণীয়	সেবা প্রদানকারীর করণীয়	কার্য সম্পাদনের সময়সীমা	মন্তব্য
১.	উচ্চতর পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের আবেদন নিষ্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	লিখিত আবেদন করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সুপার-এর নিকট আবেদন প্রেরণ এবং আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে	
২.	দক্ষতাসীমার আবেদন নিষ্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	যথাসময়ে আবেদন করতে হবে। আবেদনের সঙ্গে বিগত ৩- বছরের এসিআর ও সার্ভিস বুক (হালনাগাদ) জমা দিতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সুপার-এর নিকট প্রেরণ ও আবেদনকারীকে অবহিত করতে হবে।	৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে	
৩.	বিনোদন ছুটি সংক্রান্ত আবেদন নিষ্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	যোগ্যতা অর্জিত হলে নিয়ম অনুযায়ী ইউআরসি-প্রধানের নিকট লিখিত আবেদন করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সুপার-এর নিকট প্রেরণ ও আবেদনকারীকে অবহিত করতে হবে।	৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে	
৪.	নৈমত্তিক ছুটি ব্যতীত বিভিন্ন প্রকার ছুটিসংক্রান্ত আবেদন নিষ্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ফরমে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সাদা কাগজে লিখিত আবেদন করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সুপার-এর নিকট আবেদন প্রেরণ এবং আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে	
৫.	গৃহনির্মাণ ও অন্যান্য ঋণের আবেদন	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	নিম্নোক্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে: ১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন, ২. বায়নাপত্র, ৩. ইতঃপূর্বে ঋণ গ্রহণ করেন নাই মর্মে অঙ্গীকারনামা, ৪. 'রাজউক' বা অনুরূপ/	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সুপার-এর নিকট আবেদন প্রেরণ এবং আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে	

ক্রম	প্রদেয় সেবা	সেবা গ্রহীতা	সেবা প্রাপ্তির জন্য করণীয়	সেবা প্রদানকারীর করণীয়	কার্য সম্পাদনের সময়সীমা	মন্তব্য
			সংশ্লিষ্ট/উপযুক্ত (যেক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে প্রত্যয়নপত্র, ৫. সরকারি কৌসুলি/ উকিল-এর মতামত, ৬. নামজারি/ জমাখারিজ-এর খতিয়ানের কপি, ৭. ভূমি উন্নয়ন কর/ খাজনা পরিশোধের দাখিলা/রশিদ।			
৬.	পেনশন কেস/ আবেদনের নিষ্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	**পেনশন** নিম্নোক্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে: ১. নির্ধারিত ফরমে পেনশন প্রাপ্তির জন্য আবেদনপত্র (৩ কপি) ২. সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ ৩. চাকুরির পূর্ণ বিবরণী ৪. নিয়োগপত্র ৫. পদোন্নতির পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ৬. উন্নয়ন খাতের চাকুরি হয়ে থাকলে রাজস্বখাতে স্থানান্তরের সকল আদেশের কপি ৭. চাকুরির খতিয়ানবহি ৮. পাসপোর্ট আকারের ৬ (ছয়) কপি সত্যায়িত ছবি ৯. নাগরিকত্ব সনদ	৬নং বর্ণিত সময়ের মধ্যে উপযুক্ত (মঞ্জুরি)আদেশ জারি অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ নিশ্চত এবং সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে	
৭.	বিদেশ ভ্রমণ/গমন সংক্রান্ত	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	করণীয় নেই	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে কর্মকর্তাদের আবেদন	৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে	

ক্রম	প্রদেয় সেবা	সেবা গ্রহীতা	সেবা প্রাপ্তির জন্য করণীয়	সেবা প্রদানকারীর করণীয়	কার্য সম্পাদনের সময়সীমা	মন্তব্য
	আবেদন নিষ্পত্তি			মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ ও অন্যান্য গুলোর জন্য স্বয়ং মঞ্জুরি আদেশ জারি করবেন এবং তা আবেদনকারীকে অবহিত করতে হবে।		
৮.	বদলির আবেদন নিষ্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	করণীয় নেই		৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে	
৯.	বকেয়া বিলের আবেদন নিষ্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	প্রয়োজনীয়/আনুষঙ্গিক কাগজপত্রসহ বিল উপস্থাপন করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সুপার এর নিকট আবেদন প্রেরণ এবং আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে	
১০.	আর্থিক/ প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান		৩নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আবেদন সুপার, পিটিআই-এর বরাবরে দাখিল করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সুপার এর নিকট আবেদন প্রেরণ করতে এবং আবেদনকারীকে অবহিত করতে হবে।	৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে	
১১.	বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন/ প্রতিবেদন পূরণ/লিখন	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	৩১শে জানুয়ারির মধ্যে যথাযথভাবে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে সংশ্লিষ্ট ইউআরসি প্রধানের নিকট উস্থাপন করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে পূরণকৃত ফরম অনুস্বাক্ষর করে সংশ্লিষ্ট সুপার এর নিকট প্রেরণ নিশ্চিত ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তা অবহিত করতে হবে।	২৮শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রের নির্দেশ অনুযায়ী
১২.	তথ্য প্রদান/ সরবরাহ	দায়িত্ববান যে কোন ব্যক্তি/ অভিভাবক/ ছাত্র ছাত্রী	অফিস প্রধানের নিকট পূর্ণ নাম-ঠিকানাসহ সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ করে লিখিত আবেদন/দরখাস্ত করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে প্রদানযোগ্য তথ্য প্রদান/সরবরাহ করতে হবে; তবে নিজ এক্তিয়ারধীন বিষয় না হলে যথাস্থানে আবেদনের পরামর্শ প্রদান করতে হবে।	সম্ভব হলে তাৎক্ষণিক; না হলে সর্বোচ্চ ২ (দুই) কার্যদিবস	

সিটিজেন'স চার্টার-৬
(Citizen's Charter)
পিটিআই

ক্রম	প্রদেয় সেবা	সেবা গ্রহীতা	সেবা প্রাপ্তির জন্য করণীয়	সেবা প্রদানকারীর করণীয়	কার্য সম্পাদনের সময়সীমা	মন্তব্য
১.	টাইমস্কেল-এর আবেদন নিষ্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক/ শিক্ষিকা	যথাসময়ে আবেদন করতে হবে। আবেদনের সঙ্গে বিগত ৩-বছরে এসিআর ও সার্ভিসবুক (হাল নাগাদ) জমা দিতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ-পরিচালক বরাবর প্রেরণ নিশ্চিত এবং আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে	
২.	দক্ষতাসীমার আবেদন নিষ্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক/ শিক্ষিকা	যথাসময়ে আবেদন করতে হবে। আবেদনের সঙ্গে বিগত ৩- বছরের এসিআর ও সার্ভিস বুক (হাল নাগাদ) জমা দিতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ-পরিচালক বরাবর প্রেরণ নিশ্চিত এবং আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে	
৩.	এলপিআর/ লাম্পগ্রান্ট এর আবেদন নিষ্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক/ শিক্ষিকা	নিম্নোক্ত কাগজপত্রসহ আবেদন দাখিল করতে হবে: ১. এসএসসি/স্কুল ত্যাগের সনদ ২. এলপিসি ৩. প্রথম নিয়োগপত্র ৪. চাকুরির খতিয়ান বহি ৫. ছুটি প্রাপ্তির সনদ।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ-পরিচালক বরাবরে প্রেরণ নিশ্চিত এবং আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে	
৪.	পেনশন কেস/ আবেদনের নিষ্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক/ শিক্ষিকা	**পেনশন** নিম্নোক্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে: ১. নির্ধারিত ফরমে পেনশন প্রাপ্তির জন্য আবেদন (৩ কপি) ২. সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ ৩. চাকুরীর পূর্ণ বিবরণী ৪. নিয়োগপত্র ৫. পদোন্নতির পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ৬. উন্নয়ন খাতের চাকুরি হয়ে থাকলে রাজস্বখাতে স্থানান্তরের সকল আদেশের কপি ৭. চাকুরির খতিয়ান বহি ৮. পাসপোর্ট আকারের	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ-পরিচালক বরাবর প্রেরণ নিশ্চিত এবং আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে	

ক্রম	প্রদেয় সেবা	সেবা গ্রহীতা	সেবা প্রাপ্তির জন্য করণীয়	সেবা প্রদানকারীর করণীয়	কার্য সম্পাদনের সময়সীমা	মন্তব্য
			৬ (ছয়) কপি সত্যায়িত ছবি ৯. নাগরিকত্ব সনদ ১০. ‘না দাবি’ পত্র ১১. শেষ বেতনের প্রত্যয়নপত্র (এলপিসি) ১২. নমুনা স্বাক্ষর ১৩. ব্যাংক হিসাব নম্বর ১৪. চাকুরির স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত আদেশ ১৫. উত্তরাধিকারী/ওয়ারিশ নির্বাচনের সনদ ১৬. ‘অডিট আপত্তি’ ও ‘বিভাগীয় মামলা নাই’ মর্মে সুস্পষ্ট লিখিত সনদ ১৭. অবসর প্রস্তুতিজনিত ছুটি (এলপিআর)-এর আদেশের কপি পারিবারিক পেনশন নিম্নোক্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে: ১. নির্ধারিত ফরমে পেনশন প্রাপ্তির জন্য আবেদন (৩ কপি) ২. মৃত্যু সংক্রান্ত সনদ ৩. নিয়োগপত্র ৪. পদোন্নতির পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ৫. শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ ৬. উন্নয়ন খাতের চাকুরি হয়ে থাকলে রাজস্বখাতে স্থানান্তরের সকল আদেশের কপি ৭. চাকুরির খতিয়ান বহি ৮. পাসপোর্ট আকারের ৬ (ছয়) কপি সত্যায়িত ছবি ৯. নাগরিকত্ব সনদ ১০. উত্তরাধিকারী/ওয়ারিশ সনদ ১১. মৃত্যুর দিন পর্যন্ত বেতন প্রাপ্তির সনদ ১২. পাসপোর্ট আকারের ৬ (ছয়) কপি সত্যায়িত ছবি ১৩. নমুনা স্বাক্ষর ১৪. উত্তরাধিকারী/ ওয়ারিশগণের ক্ষমতাপত্র ১৫. বিধবা হলে পুনর্বিবাহ না করার সনদ ১৬. ’না-দাবি’ পত্র ১৭. শেষ বেতনের প্রত্যয়নপত্র (এলপিসি) ১৮. ব্যাংক হিসাব নম্বর।			

ক্রম	প্রদেয় সেবা	সেবা গ্রহীতা	সেবা প্রাপ্তির জন্য করণীয়	সেবা প্রদানকারীর করণীয়	কার্য সম্পাদনের সময়সীমা	মন্তব্য
৫.	জিপিএফ থেকে ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত আবেদন নিষ্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক/ শিক্ষিকা	নির্ধারিত ফরমে হালনাগাদ Account Slip-সহ আবেদন করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপপরিচালক বরাবর প্রেরণ নিশ্চিত এবং আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে	
৬.	জিপিএফ থেকে চূড়ান্ত উত্তোলনের আবেদন নিষ্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক/ শিক্ষিকা	নিম্নোক্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে: ১. ৬৬৩ 'অডিট ম্যানুয়াল' ফরম (অফিস প্রধান কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত) ২. সংশ্লিষ্ট হিসাব রক্ষণ অফিসার কর্তৃক কর্তৃত্ব প্রদানসংক্রান্ত সনদ ৩. এলপিআর মঞ্জুরির আদেশ ৪. মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে মৃত্যু সংক্রান্ত সনদ ৫. প্রতিনিধি/ Authority সনদ ৬. বিধবা হলে পুনর্বিবাহ না করার অঙ্গীকারনামা	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ-পরিচালক বরাবর প্রেরণ নিশ্চিত এবং আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে	
৭.	গৃহনির্মাণ ও অন্যান্য ঋণের আবেদন নিষ্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক/ শিক্ষিকা	নিম্নোক্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে: ১. নির্ধারিত ফরমে আবেদনপ্রত ২. বায়নাপত্র ৩. ইতঃপূর্বে ঋণ/Loan গ্রহণ করেন নাই মর্মে অঙ্গীকারনামা ৪. 'রাজউক' বা অনুরূপ/ সংশ্লিষ্ট/উপযুক্ত যে ক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য) কর্তৃপক্ষ উকিল-এর মতামত ৬. নামজারি/জমাখারিজ (Mutation)-এর খতিয়ানের কপি ৭. ভূমি উন্নয়ন কর/খাজনা পরিশোধের দাখিলা/রশিদ	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপপরিচালক বরাবর প্রেরণ নিশ্চিত এবং আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে	
৮.	বিভাগীয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আবেদন নিষ্পত্তি	ইন্সট্রাক্টর/ সহকারী ইন্সট্রাক্টর	নিয়ম অনুযায়ী লিখিত আবেদন করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ-পরিচালক বরাবর প্রেরণ নিশ্চিত এবং আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে	

ক্রম	প্রদেয় সেবা	সেবা গ্রহীতা	সেবা প্রাপ্তির জন্য করণীয়	সেবা প্রদানকারীর করণীয়	কার্য সম্পাদনের সময়সীমা	মন্তব্য
৯.	নৈমত্তিক ছুটি ব্যতীত বিভিন্ন প্রকার ছুটি সংক্রান্ত আবেদন নিষ্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক/ শিক্ষিকা	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ফরমে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সুপার, পিটিআই-এর নিকট লিখিত আবেদন করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ-পরিচালক বরাবর প্রেরণ নিশ্চিত এবং সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	৩ (তিন) কার্য দিবসের মধ্যে	
১০.	বিদেশ ভ্রমণ/গমন সংক্রান্ত আবেদন নিষ্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক/ শিক্ষিকা	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ফরমে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সুপার, পিটিআই-এর নিকট লিখিত আবেদন করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ-পরিচালক বরাবর প্রেরণ নিশ্চিত এবং সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে	
১১	বকেয়া বিল-এর আবেদন নিষ্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	প্রয়োজনীয়/আনুষঙ্গিক কাগজপত্রসহ বিল সুপার, পিটিআই বরাবর উপস্থাপন করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ-পরিচালক বরাবর প্রেরণ নিশ্চিত এবং সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে	
১২	বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন/ প্রতিবেদন পূরণ/লিখন	নিজস্ব দপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারী/ শিক্ষক/ শিক্ষিকা	করণীয় নেই	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত/পুরণকৃত ফরম প্রতি স্বাক্ষরান্তে এসি- আর শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তা অবহিত করতে হবে।	৩১ শে মার্চের মধ্যে	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রের নির্দেশ অনুযায়ী
১৩.	বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন/ প্রতিবেদন পূরণ/লিখন	দায়িত্ববান যে কোন ব্যক্তি/ অভিভাবক/ ছাত্র ছাত্রী	যথাসময়ে নির্ধারিত ফরম পুরণ করে সুপার, পিটিআই-এর নিকট উপস্থাপন করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে অনুস্বাক্ষর করে প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ নিশ্চিত এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তা অবহিত করতে হবে।	২৮ শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রের নির্দেশ অনুযায়ী
১৪.	তথ্য প্রদান/ সরবরাহ		অফিস প্রধানের নিকট পূর্ণ নাম-ঠিকানাসহ সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ করে লিখিত আবেদন/দরখাস্ত করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে প্রদানযোগ্য তথ্য প্রদান/সরবরাহ করতে হবে; তবে নিজ এক্তিয়ারভুক্ত বিষয় না হলে যথাস্থানে আবেদনের পরামর্শ প্রদান করতে হবে।	সম্ভব হলে তাৎক্ষণিক; না হলে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) কার্যদিবস	

সিটিজেন'স চার্টার-৭

(Citizen's Charter)

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সদর কার্যালয়

ক্রম	প্রদেয় সেবা	সেবা গ্রহীতা	সেবা প্রাপ্তির জন্য করণীয়	সেবা প্রদানকারীর করণীয়	কার্য সম্পাদনের সময়সীমা	মন্তব্য
১.	বি.এড/এম.এড প্রশিক্ষণের অনুমতি প্রদান	মাঠপর্যায় থেকে প্রাপ্ত আবেদন	নিম্নোক্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে: ১. নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার সুপারিশ, যে প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করবেন তার প্রসপেকটাস এবং প্রতিষ্ঠানটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কিনা তার প্রত্যয়নপত্র। ২. বি.এড/এমএড ডেপুটেশনের ক্ষেত্রে): বিদ্যালয়ের তথ্যসহ অধস্তন অফিসের সুপারিশ।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে অনুমোদন এবং আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে	
২.	পাসপোর্ট করার অনুমতিদানের আবেদন নিস্পত্তি	কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও শিক্ষক/ শিক্ষিকা	নির্ধারিত ফরম পুরণ করে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে অনুমোদন বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত এবং সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে। অথবা অনুমতি প্রদান করা সম্ভব না হলে সেটিও সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে জানাতে হবে।	৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে	
৩.	উচ্চতর পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান	কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও শিক্ষক/ শিক্ষিকা	লিখিত আবেদন করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে অনুমোদন বা অননুমোদন এবং আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে	

ক্রম	প্রদেয় সেবা	সেবা গ্রহীতা	সেবা প্রাপ্তির জন্য করণীয়	সেবা প্রদানকারীর করণীয়	কার্য সম্পাদনের সময়সীমা	মন্তব্য
৪.	টাইমস্কেল-এর আবেদন নিষ্পত্তি	মাঠপর্যায় থেকে প্রাপ্ত আবেদন	করণীয় নেই	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে অনুমোদন এবং আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে	
৫.	টাইমস্কেল-এর আবেদন নিষ্পত্তি	অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারী	যথাসময়ে আবেদন করতে হবে। আবেদনের সঙ্গে বিগত ৩ বৎসরের এসিআর ও সার্ভিস বুক (হালনাগাদ) জমা দিতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে অনুমোদন বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত এবং সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে	
৬.	দক্ষতাসীমার আবেদন নিষ্পত্তি	মাঠপর্যায় থেকে প্রাপ্ত আবেদন	করণীয় নেই	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে অনুমোদন এবং আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে	
৭.	দক্ষতাসীমার আবেদন নিষ্পত্তি	অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারী	যথা সময়ে আবেদন করতে হবে। আবেদনের সঙ্গে বিগত ৩ বৎসরের এসিআর ও সার্ভিস বুক (হালনাগাদ) জমা দিতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে অনুমোদন বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত এবং সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে	
৮.	এলপিআর/ লাম্পগ্রান্ট সংক্রান্ত আবেদন নিষ্পত্তি	মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারী	নিম্নোক্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে: ১. এসএসসি/স্কুল ত্যাগের সনদ ২. এলপিসি ৩. প্রথম নিয়োগপত্র ৪. চাকুরির খতিয়ানবহি ৫. ছুটি প্রাপ্তির সনদ।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে অনুমোদন বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত এবং সংশ্লিষ্ট আবেদন কারীকে তা অবহিত করতে হবে।	১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে	
৯.	পেনশন কেস/ আবেদনের নিষ্পত্তি	অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও	**পেনশন** নিম্নোক্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে:	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে অনুমোদন বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে	

ক্রম	প্রদেয় সেবা	সেবা গ্রহীতা	সেবা প্রাপ্তির জন্য করণীয়	সেবা প্রদানকারীর করণীয়	কার্য সম্পাদনের সময়সীমা	মন্তব্য
		মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা (ডিডি/এডি/ ডিপিও/সুপার প্রমুখ)	১. নির্ধারিত ফরমে পেনশন প্রাপ্তির জন্য আবেদন (৩ কপি) ২. সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ ৩. চাকুরীর পূর্ণ বিবরণী ৪. নিয়োগপত্র ৫. পদোন্নতির পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ৬. উন্নয়ন খাতের চাকুরি হয়ে থাকলে রাজস্বখাতে স্থানন্তরের সকল আদেশের কপি ৭. চাকুরির খতিয়ান বহি ৮. পাসপোর্ট আকারের ৬ (ছয়) কপি সত্যায়িত ছবি ৯. নাগরিকত্ব সনদ ১০. 'না দাবি' পত্র ১১. শেষ বেতনের প্রত্যয়নপত্র (এলপিসি) ১২. নমুনা স্বাক্ষর ১৩. ব্যাংক হিসাব নম্বর ১৪. চাকুরির স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত আদেশ ১৫. উত্তারাধিকারী/ওয়ারিশ নির্বাচনের সনদ ১৬. 'অডিট আপত্তি' ও 'বিভাগীয় মামলা নাই' মর্মে সুস্পষ্ট লিখিত সনদ ১৭.অবসর প্রস্তুতিজনিত ছুটি (এলপিআর)-এর আদেশের কপি পারিবারিক পেনশন নিম্নোক্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হবেঃ ১. নির্ধারিত ফরমে পেনশন প্রাপ্তির জন্য আবেদন (৩	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত এবং সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।		

ক্রম	প্রদেয় সেবা	সেবা গ্রহীতা	সেবা প্রাপ্তির জন্য করণীয়	সেবা প্রদানকারীর করণীয়	কার্য সম্পাদনের সময়সীমা	মন্তব্য
			কপি) ২. মৃত্যু সংক্রান্ত সনদ ৩. নিয়োগপত্র ৪. পদোন্নতির পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ৫. শিক্ষাগত সনদ ৬. উন্নয়ন খাতের চাকুরি হয়ে থাকলে রাজস্বখাতে স্থানান্তরের সকল আদেশের কপি ৭. চাকুরির খতিয়ান বহি ৮. পাসপোর্ট আকারের ৬ (ছয়) কপি সত্যায়িত ছবি ৯. নাগরিকত্ব সনদ ১০. উত্তরাধিকারী/ ওয়ারিশ সনদ ১১. মৃত্যুর দিন পর্যন্ত বেতন প্রাপ্তির সনদ ১২. পাসপোর্ট আকারের ৬ (ছয়) কপি সত্যায়িত ছবি ১৩. নমুনা স্বাক্ষর ১৪. উত্তরাধিকারী/ ওয়ারিশগণের ক্ষমতাপত্র ১৫. বিধবা হলে পুনর্বিবাহ না করার সনদ ১৬. না-দাবি পত্র ১৭. শেষ বেতনের প্রত্যয়নপত্র (এলপিসি) ১৮. ব্যাংক হিসাব নম্বর।			
১০.	জিপিএফ-এর আবেদন নিষ্পত্তি	অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী	নির্ধারিত ফরমে হালনাগাদ Account Slip-সহ আবেদন করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে অনুমোদন এবং আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।	৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে	
১১.	বকেয়া বিল-এর আবেদন নিষ্পত্তি		প্রয়োজনীয়/আনুষঙ্গিক কাগজপত্রসহ বিল সুপার, পিটিআই বরাবর উপস্থাপন করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ-পরিচালক বরাবর প্রেরণ নিশ্চিত এবং সংশ্লিষ্ট	১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে	

ক্রম	প্রদেয় সেবা	সেবা গ্রহীতা	সেবা প্রাপ্তির জন্য করণীয়	সেবা প্রদানকারীর করণীয়	কার্য সম্পাদনের সময়সীমা	মন্তব্য
				আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে।		
১২.	বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন/ প্রতিবেদন পূরণ/লিখন	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	করণীয় নেই	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত/পুরণকৃত ফরম প্রতিস্বাক্ষরান্তে এসিআর শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তা অবহিত করতে হবে।	৩১ শে মার্চের মধ্যে	সংস্থাপন মন্ত্রণা লয়ের পরি পত্রের নির্দেশ অনুযায়ী
১৩.	বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন/ প্রতিবেদন পূরণ/লিখন	নিজস্ব দপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারী/ শিক্ষক/ শিক্ষিকা	যথাসময়ে নির্ধারিত ফরম পুরণ করে সুপার, পিটিআই-এর নিকট উপস্থাপন করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে অনুস্বাক্ষর করে প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ নিশ্চিত এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তা অবহিত করতে হবে।	২৮ শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে	সংস্থাপন মন্ত্রণা লয়ের পরি পত্রের নির্দেশ অনুযায়ী
১৪.	তথ্য প্রদান/ সরবরাহ	দায়িত্ববান যে কোন ব্যক্তি/ অভিভাবক/ ছাত্র ছাত্রী	অফিস প্রধানের নিকট পূর্ণ নাম-ঠিকানাসহ সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ করে লিখিত আবেদন/দরখাস্ত করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে প্রদানযোগ্য তথ্য প্রদান/সরবরাহ করতে হবে; তবে নিজ এক্তিয়ারভুক্ত বিষয় না হলে যথাস্থানে আবেদনের পরামর্শ প্রদান করতে হবে।	সম্ভব হলে তাৎক্ষণিক; না হলে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) কার্যদিবস	
১৫.	বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন/ প্রতিবেদন পূরণ/ লিখন	অধিদপ্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারী	৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে যথাযথভাবে ফরম পূরণ করে অনুবেদনকারী/প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করতে হবে।	অনুবেদনকারী/ প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তা ২ শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে অনুস্বাক্ষর করে প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করবেন। প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা তা ৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের	২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে	সংস্থাপন মন্ত্রণা লয়ের পরি পত্রের নির্দেশ অনুযায়ী

ক্রম	প্রদেয় সেবা	সেবা গ্রহীতা	সেবা প্রাপ্তির জন্য করণীয়	সেবা প্রদানকারীর করণীয়	কার্য সম্পাদনের সময়সীমা	মন্তব্য
				মধ্যে প্রতিস্বাক্ষর করে এসিআর শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে তা অবিহিত করতে হবে।		
১৬.	বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন/ প্রতিবেদন পূরণ/ লিখন	মাঠপর্যায় থেকে প্রাপ্ত	করণীয় নেই	প্রাপ্ত এসিআর ৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে প্রতিস্বাক্ষরান্তে এসিআর শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে তা অবহিত করতে হবে।	৩১শে মার্চের মধ্যে	সংস্থাপন মন্ত্রণা লয়ের পরি পত্রের নির্দেশ অনুযায়ী
১৭.	আন্তঃবিভাগ বদলির আবেদন নিষ্পত্তি	কর্মকতা/ কর্মচারী ও শিক্ষক/ শিক্ষিকা	করণীয় নেই	এ সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালা'' অনুযায়ী বদলির আদেশ জারি এবং আবেদনকারীকে তা অবহিত করতে হবে। কোন কারনে তা সম্ভব না হলে সেটিও তাকে জানাতে হবে।	৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে	
১৮.	বিদ্যালয় স্থাপন ও চালু এবং অস্থায়ী/ সাময়িক রেজিস্ট্রেশন প্রদান (বেসামরিক) (বেসামরিক)	উৎসাহী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান	করণীয় নেই	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে অনুমোদন/অনুমিতি প্রদানকরত বা বিভিন্নরূপ আদেশ থাকলে তা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ-পরিচালককে জানিয়ে দিতে হবে।	৩ (তিন) মাসের মধ্যে	
১৯.	তথ্য প্রদান/ সরবরাহ	দায়িত্ববান যে কোন ব্যক্তি/ অভিভাবক/ ছাত্র ছাত্রী	উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বরাবর/ নিকট পূর্ণ নাম-ঠিকানাসহ সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ করে লিখিত আবেদন/ দরখাস্ত করতে হবে।	৬নং কলামে বর্ণিত সময়ের মধ্যে প্রদানযোগ্য তথ্য প্রদান/সরবরাহ করতে হবে; তবে নিজ এক্তিয়ারভুক্ত বিষয় না হলে যথাস্থানে আবেদনের পরামর্শ প্রদান করতে হবে।	সম্ভব হলে তাৎক্ষণিক; না হলে সর্বোচ্চ ৭ (সাত) কার্যদিবস	

তথ্যসূত্র

১. প্রাথমিক শিক্ষা ম্যানুয়াল (ভলিউম-১). (২০০৪). প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

২. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্টুডেন্ট কাউন্সিল ম্যানুয়াল, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

৩. মোহাম্মদ মজিবুর রহমান ও আসজাদুল কিবরিয়া. (২০০৫). শিক্ষা অধিকার সহায়িকা. ঢাকা: একশনএইড বাংলাদেশ

৪. সিরাজুদ দাহার খান (অনুবাদ ও সম্পাদনা). (২০০৮). শিক্ষা অধিকার নির্দেশিকা. ঢাকা: একশনএইড বাংলাদেশ

৫. সিরাজুদ দাহার খান (সম্পাদনা). (২০০৭). অ্যাডভোকেসি হ্যান্ডবুক.ঢাকা: ইন্টার‌্যাকশন

৬. সিরাজুদ দাহার খান (গ্রন্থনা ও সম্পাদনা). (২০০৭). তৃণমূলে অধিকার. ঢাকা: ঢাকা আহসানিয়া মিশন

৭. সিরাজুদ দাহার খান (গ্রন্থনা ও সম্পাদনা). (২০১২). পড়ালেখার মান ভালো করার জন্য স্টুডেন্ট কাউন্সিল ঢাকা: আমার অধিকার ক্যাম্পেইন

৮. খন্দকার সাখাওয়াত আলী. (সম্পাদনা). (২০০৮). হালখাতা. ঢাকা: শিক্ষা অধিকার আন্দোলন

৯. অংগীকার. (২০১১), প্রকাশনা: বিএনএফই

১০. ইউনিয়ন পরিষদ আইন. (২০০৯). প্রচারণা: বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ ফোরাম

১১. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি. (২০১১). প্রকাশনা: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১২. জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি. (২০১০). প্রকাশনা: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত). (২০১১). প্রকাশনা: আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪. বাংলাদেশের সংবিধান ও সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা. সংকলন: এম এ সালাম প্রকাশনা: সেন্টার ফর ইনফরমেশন এন্ড জাস্টিস

১৫. Tanvir. M & Farooque. S. A.H., (Ed.), Education Rights Reference handbook. ActionAid Bangladesh.

১৬. Third Primary Education Development Programme (PEDP3). Retrieved from http://www.dpe.gov.bd/

actionaid

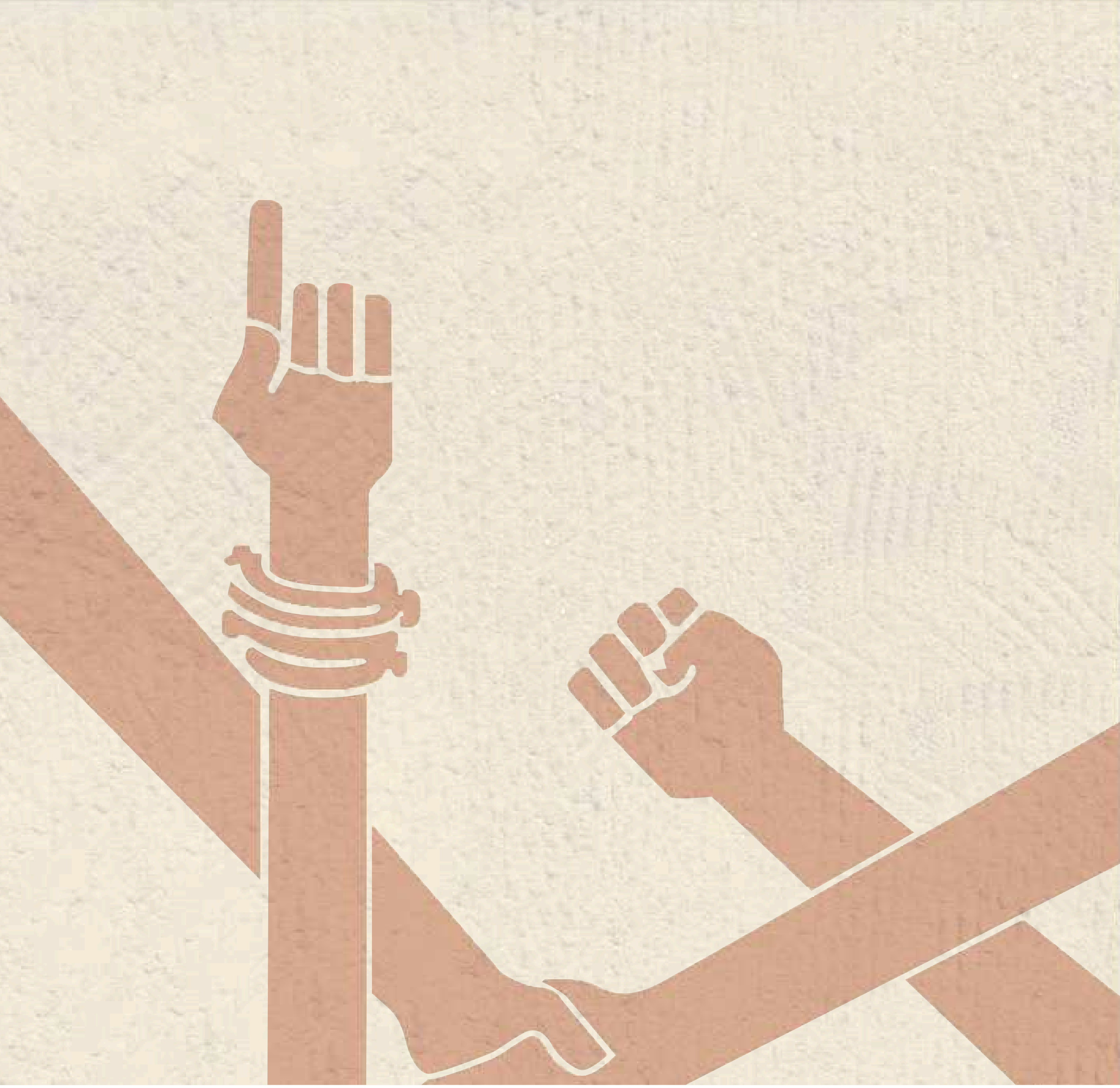

একশনএইড বাংলাদেশ
বাড়ি - ৮, সড়ক - ১৩৬, গুলশান-১, ঢাকা- ১২১২
ফোন: +৮৮ (০২) ৮৮৩৭৭৯৬, ৯৮৯৪৩৩১
ই-মেইল: aab.mail@actionaid.org